এই পুরাতন আখরগুলি

হাসান আজিজুল হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার জাদু দিয়ে হাসান আজিজুল হক বহুকাল আমাদের আপ্লুত রেখেছেন। সামান্য বিষয়ও তাঁর লেখনগুণে মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে। তাঁর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ তাই আমাদের চিরকালীন সম্পদে পরিণত হয়েছে। সেই তিনিই যখন নিজের জীবনী লেখেন তখন তা যে অন্যমাত্রার হবে তাতে সন্দেহ কী? তাই দেখি ইতিপূর্বে লেখা তাঁর দুই পর্বের আত্মজীবনী *ফিরে যাই ফিরে আসি* আর *উঁকি দিয়ে দিগন্ত*-তে তিনি প্রায় নিস্তরঙ্গ শৈশব আর রুখোমাটির রাঢ়ের ভূগোলকেও কী সজীব আর বাঙ্ময় করে তোলেন।

কিন্তু আত্মজীবনীর এই তৃতীয় পর্বে এসে এবারে তিনি যেন নিজেকে প্রায় নিরাভরণভাবে মেলে ধরেছেন। বয়োসন্ধিক্ষণের বিপুল রহস্যময়তা আর আত্ম-আবিষ্কারের অন্বেষণ হয়ে উঠেছে এ বইয়ের প্রাণভোমরা। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, বইপ্রীতি, লেখকসত্তার উন্মেষ, যৌনবোধের জাগরণ, দেশ ও পরিবারের ভাঙন, রবীন্দ্রনাথ ও দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, প্রকৃতি ও ঋতুর সৌন্দর্য উপলব্ধি, মানুষ পাঠ ইত্যাদি মিলিয়ে বইটি হয়ে উঠেছে বিপুল ঘটনাবিস্তারী।

এই পুরাতন আখরগুলি ব্যক্তি ও লেখক হাসান আজিজুল হকের বেড়ে ওঠা আর গড়ে ওঠার সবচে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয়।

প্রচ্ছদ সমর মজুমদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

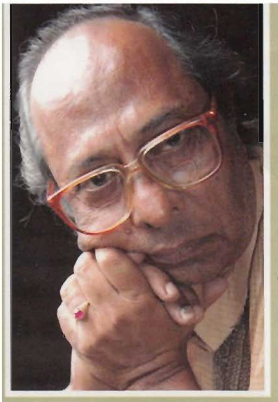

আলোকচিত্র : নাসির আলী মামুন

জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ । যবগ্রাম, বর্ধমান, পশ্চিমবাংলা । শিক্ষা : স্নাতকোত্তর, দর্শন । রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্র বিভাগে অধ্যাপনা শেষে তিনি অবসর নিয়েছেন । ছাত্রজীবনে লেখালেখির শুরু । ১৯৬০ সাল থেকে লেখক হিসেবে নিজেকে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সক্রিয় সাহিত্যচর্চার আরম্ভ । আজ তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক । বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সব সাহিত্য পুরস্কার ও একুশে পদকের অধিকারী তিনি । তাঁর গল্প ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, রুশ ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে ।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

গল্প	: সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, জীবন ঘষে আগুন, নামহীন গোত্রহীন, পাতালে হাসপাতালে, আমরা অপেক্ষা করছি, রোদে যাবো, মা-মেয়ের সংসার, নির্বাচিত গল্প, রাঢ়বঙ্গের গল্প ।
উপন্যাস	: আগুনপাখি, সাবিত্রী উপাখ্যান ।
উপন্যাসিকা	: বৃত্তায়ন, শিউলি, বিধবাদের কথা ।
প্রবন্ধ	: কথাসাহিত্যের কথকতা, অপ্রকাশের ভার, অতলের আঁধি, চালচিত্রের খুঁটিনাটি, ছড়ানো ছিটানো, চিন্তন-কণা ।
আত্মজীবনী	: ফিরে যাই ফিরে আসি (১ম অংশ), উঁকি দিয়ে দিগন্ত (২য় অংশ) ।
কিশোর	: লাল ঘোড়া আমি, ফুটবল থেকে সাবধান ।
অন্যান্য	: একাত্তর : করতলে ছিন্নমাথা, সক্রেটিস ।
নাটক	: চন্দর কোথায় (ভাষান্তরিত) ।
সম্পাদনা	: জি.সি. দেব রচনাবলী ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পুরাতন আখরগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পুরাতন আখরগুলি

হাসান আজিজুল হক

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশনার এক দশক

এই পুরাতন আখরগুলি

স্মৃতিকথন

হাসান আজিজুল হক

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

পরিবেশক
যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিক লেন, পূর্ব লন্ডন
রূপসী বাংলা লিমিটেড, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
৩০০ টাকা

Ei Poratan Akhargoli by Hasan Azizul Huq, Published by Ittadi Grantho Prokash : February 2014. Price Tk. 300, ISBN: 978 984 904 381 2

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

একতমা রে প্রিয়তমা রে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলে ভর্তি হতে চাইলেই হলো না। টাকা লাগবে। মোটেই বেশি টাকা নয়। তা সেটাই বা আসছে কোথা থেকে? আমাদের বাড়িতে সব আছে। অনেক ধান, অনেক চাল, যব গম সরষে ডাল, কত রকমের সব খাবার! অভাব কিছু নেই। তবে টাকা নেই। কাগজের নোটের টাকা তো চোখেই দেখিনি ছোটবেলায়। রুপোর এক টাকা, আধুলি, সিকি, দু-আনি, এক আনি, দু-পয়সা দেখেছি। তামার এক পয়সা, আধ-পয়সা, সিকি পয়সাও দেখেছি। বাঁকা করে কাটা ষষ্ঠ জর্জের মুণ্ডওয়ালা একটা রুপোর টাকা কী যে লোভের জিনিশ!

নিগণে আমাদের একটা নিত্যি লোকসানের মুদির দোকান ছিল। মাটির চৌকো উঁচু বেদীর ওপর শীতল পাটি পাতা, বড়ো বড়ো দু-তিনটে বালিশ, একটা সেগুনকাঠের খোপওয়ালা ক্যাশ বাকশো আর বড়ো-ছোটো লাল কাপড়ে বাঁধাই খেরো-খাতা। রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে গদিতে বসে ল'-চাচা, নয় তো বড়ো-চাচা সারা দিনের বেচাকেনার হিশাব করে টাকা গুনে গুনে রাখছেন। একটা টাকার থাক, একটা আধুলির থাক, একটা সিকির থাক। চকচকে রুপোর টাকাগুলো টং করে একবার বাজিয়ে নিচ্ছেন। সন্দেহ হলে পাশেই রাখা একটা গোল-চুম্বকে ঠেকিয়ে দেখছেন। কটাই বা টাকা! কুড়ি টাকার একটা থাক হয়ে গেলেই পাশে আবার একটা এক টাকার থাক। এক আধটা সিকি-আধুলি গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেই বলত, কুড়িয়ে নিয়ে আয়। একটা হারিকেনের আর কতটুকু আলো, গদির ওপরেই খানিকটা লাল আলো! বড়ো লম্বা ঘরটা একরকম অন্ধকার। সেখানে দেয়ালের গায়ে ঠেকানো বড়ো বড়ো চটের বস্তায় আছে আটা, ময়দা, চাল চিনি নুন, তেজপাতা, শুকনো মরিচ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলমরিচ, জোয়ান মৌরি ধনে—এইসব রাজ্যের জিনিশ। ঝাঁঝালো গন্ধে ঘর ভরা, বড়ো বড়ো ইঁদুরের চিক চিক আওয়াজ। আমার হাতে বেশ বড়ো একটুকরো তালমিছরি। এক ফাঁকে হাতসাফাই করেছি।

বাবা দোকানে বসতেন খুব কমই। রাতে তো থাকতেনই না। যদি থাকতেন সেদিন একনলা বন্দুকটা এনে গদির এক কোণে রাখা হতো। বাবাকে একদিনও টাকা গুনতে দেখিনি। সত্যি বলতে কী টাকা-পয়সা নাড়াচাড়া করতে তেমন দেখিনি তাঁকে। আমি দুটো পয়সার জন্যে মায়ের কাছে ফুফুর কাছে ধরনা দিতাম, বড়ো-চাচার কাছেও কিন্তু বাবার কাছে কোনোদিন না। তবে ভর্তি যে হতেই হবে স্কুলে আর ভর্তি হতে গেলে টাকা লাগবে। বাবার কাছে আবদার কাকে বলে আমি কোনোদিনই জানি না। বাবাও জানেন না। একদিন বেমক্কাভাবে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ঘাড় গোঁজ করে বললাম, স্কুলে ভর্তি হবো, টাকা লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, আচ্ছা, দেখা যাবে। ক-টাকা লাগবে জিজ্ঞেস করে আসিস।

বোঝা গেল খুব সহজ হবে না স্কুলে ভর্তি হওয়া। আমাদের সব চাইতে বড়োভাই বহু দিন আগে ষোল বছর বয়সে ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে টাইফয়েড জ্বরে মারা গেছেন। তাঁকে যত্ন করে বর্ধমান শহরের স্কুলে পড়ানো হচ্ছিল। এখন আমার যিনি বড়োভাই তিনিও গাঁয়ের স্কুলে কোনোদিন পড়েননি, বর্ধমান শহরে ছোটচাচার কাছে থেকে পড়তেন। বড়োবোনও তাই—ঐ ছোটচাচার কাছে থেকে শহরের বেশ ভালো একটা গার্লস স্কুলে পড়ে। ওদের পড়াশোনার এখন কী ব্যবস্থা জানি না। আমার বেলায় বাবা তো গা লাগালেন না, সংসারের তলানি চেঁছে দুটো তামার পয়সা জুটবে কিনা সন্দেহ।

রাতে প্রস্রাবে ভেজা, দিনে সেটাই শুকনো ময়লা কিটকিটে চামড়ার মতো। ফিতে-বাঁধা সেই হাফপ্যান্ট পরেই খালি-গায়ে খালি-পায়ে প্রত্যেক দিন স্কুলে যাই। পাঁচিল-টাচিল কিছু নেই তবু ভেতরে যেতে সাহস হয় না। আশপাশ দিয়েই ঘোরাফেরা করি। নিগণ যাবার বড়ো সড়ক স্কুলের সামনেই, খুব বড়ো যে অশথ গাছটা ছিল সেখানে রাস্তার পাশে, তার নিচের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানো চলত। সেটা ঝড়ে উপড়ে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে, সে জায়গাটা হা হা করছে। বোর্ডিংঘর তিনটের পিছন দিয়ে আমাদের দিঘি ঘোলার ঘাট আর ইটের টুকরো ছিটানো দিঘির পুব-দক্ষিণ কোণের পাড় ঘুরে বাসক গাছগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। ওখানে স্কুলের একটা বড়ো ক্লাসঘর হবার কথা ছিল, সে আর হয়নি। কোমর পর্যন্ত উঁচু শক্ত ইটের ভিত পড়ে আছে। জায়গাটা খুব পুরনো-পুরনো লাগে। ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলের ছেলেরা পেচ্ছাপ করে। পুরনো চন্দ্রবোরা সাপ দেখা যায় প্রায়ই, বাসকের ডাল ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয় ছেলেদের পেটানোর জন্য। বাসকের শাদা শাদা ফুলে এক ফোঁটা করে মধু আছে, সেটা চুষে খাওয়া যায়। পাশেই গাবা-কাটাদের বিরাট বাঁশঝাড়ের কালো ছায়া।

কেবলই ঘুরি আর পাক দিই। স্কুলের দক্ষিণ দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, উত্তর দিকেও তাই। দক্ষিণ দিকের জায়গাটার কোনো মানে হয় না। বালি মাটি আর ইটের খোয়ায় ভরা, সব সময়েই যেন রোদে পুড়ছে। খেলাধুলো করা মুশকিল বরং উত্তর দিকের জায়গাটা ঘাসে ভরা, ছায়াও বেশি। গেরস্থদের বাড়ির মাটির পাঁচিল আছে সেদিকে, তার ওপর পুঁইমাচা আছে, আমড়াগাছ আছে কয়েকটা। ভালোই লাগে ওদিকটা। বেশ ঘর-সংসারের আওয়াজ পাওয়া যায়। বোঝা যায় দিন অনেকটা এগিয়েছে, বেলা বেড়েছে, গোয়াল থেকে গরু-বাছুর ছেড়ে দিয়ে মাঠে নিয়ে যাবার সময় হলো। কচি বাছুরের একটা কেমন অবোধ-অবোধ হাম্বা ডাক এলো। আমড়া গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া আসছে কাঁচা-কয়লার আঁচ দেওয়া উনুন থেকে। বাড়ির বুড়ি শাশুড়ির খ্যানখেনে গলা শোনা যাচ্ছে, নতুন বৌরা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে খুব নরম গলায় কথা বলছে।

তখন স্কুল বসত বেলা দশটায়। এই যে ঠাকুর ঘণ্টা বাজিয়ে দিল ঢং ঢং করে। আবার দিঘির পাড় ঘুরে বড়ো সড়ক ধরে ক্লাস ফাইভের দক্ষিণের জানালা-জোড়ার একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। স্কুলের দরজা যত বড়ো, জানালাও তত বড়ো। মেঝে থেকে দু-হাত আড়াই-হাত উঁচুতে জানালা, সেটার মোটা মোটা লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ক্লাসঘরের ভেতরটা দেখছি। মাস্টারমশাই এখনো ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোকেননি। মেয়ে তো পড়তে যায় না এ স্কুলে। সব ছেলে। উঃ, ভীষণ দুষ্টুমি আর গোলমাল করছে ওরা। বেঞ্চি থেকে ঠেলে একজনকে সরিয়ে দিচ্ছে আর একজন। কারো এখন আর দপ্তরবাঁধা বই নেই। সবারই বই-খাতা হাই বেঞ্চিতে রাখা আছে। মেঝেতে ফেলে দিচ্ছে কারোর বই। মারামারি হচ্ছে তাই নিয়ে। কান-ফাটানো চেঁচামেচি। এই সময় একটা বড়ো বড়ো চোখওয়ালা ছেলে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাকে দেখতে শুরু করল। খানিকক্ষণ দেখে-টেখে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এই, তোমার নাম কী? আমার নাম বলতেই সে আরো অবাক হয়ে বলল, অ, মোচলমানদের ছেলে! গায়ে জামা নেই আমার, ধুলোভরা সমস্ত শরীর, গরুর রাখাল-টাখাল ভাবল কিনা কে জানে। তফাৎ কিছু নেই আমার তাদের সঙ্গে। তখুনি আর একটা ছেলের কাছে গিয়ে সে চোখ কপালে তুলে বলল, দ্যাখ দ্যাখ মাইরি, ঐ যে ছেলেটা মোচলমানদের ছেলে, একটুও বোঝবার বাগ নাই। একদম হিঁদুদের ছেলের মতো দেখতে! কথাটা শুনে আমার একটুও ভালো লাগল না। মোসলমানদের ছেলে কি আলাদা নাকি! তবে একটা কথা ঠিক, মোসলমানদের একটা ছেলে স্কুলের জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

এই স্কুলে আমাদের গাঁয়ের মোসলমানদের একটি ছেলেও পড়ে না। একজনও না। কবে আমার বড়ো বোন দু-চার মাস এখানে পড়েছিল, এখন সে বর্ধমানে মেয়েদের স্কুলে পড়ে আমার চাচার বাড়িতে থেকে। আমার নিজের বড়ো ভাই, ফুফাত ভাই আলম ভাই আর এক জ্ঞাতি ভাই অনেক আগে এখানে পড়েছিল। আশ্চর্য, এরা সবাই একই বাড়ির ছেলে। এখন আমি আর শহীদুল যদি এখানে ভর্তি হই, তাহলে আবার সেই একই বাড়িরই হবে। আর কেউ নেই। হাবিব কদিন পড়েছিল আমার সঙ্গে পাঠশালে। খ্রিতে উঠে সে আর পাঠশালায় আসেনি। রউফ পড়েছিল ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত। এই দুই-একজন ছাড়া মোসলমান পাড়ার এহসানুল, মতি, সুফি, হানু, খোসাই, কালো কেউ কোনোদিন পাঠশালেই যায়নি। স্কুলে পড়া তো দূরের কথা। গরিব ছেলেরা নিজেদের বা পরের গরু চরায় মাঠে, কেউ বাপের সাথে মাঠে যায়, খাল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিল ছেঁচে মাছ ধরে, কেউ শুধু ঘুরে বেড়ায়, বাপের সামনে পড়লে গদাম গদাম কিল খায়।

আমি পড়ি বটে, পড়ায় মনটা আছে, যা পাই তাই পড়তে ভালো লাগে শুধু অঙ্কটা ছাড়া। যোগ বিয়োগ গুন ভাগ এখন এরকম করে হয়। সরল পারি না, পাটিগণিত পারি না, গড়কষা পারি, গ.সা.গু. ল.সা.গু.-ও মোটামুটি আয়ত্তে আছে, ঐকিক অঙ্ক মুখে মুখে পারি কিন্তু ধাপ ধরে ধরে খাতায় করতে পারি না। আর খুব খটোমটো লাগছে ইংরেজি। একই অক্ষর—ছোট হাতের, বড়ো হাতের, আবার ছাপাও আলাদা আলাদা। তিন রকম তো বটেই, চার রকমও বলা যায়। যাই হোক লেখাপড়া ছাড়ব না, স্কুলে ভর্তি হবই। এদিকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের হতচ্ছাড়া মোসলমান পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আমার দারুণ ভালো লাগে। গাঁয়ের আশপাশের মাঠেই গরু চরাবার মেলা জায়গা, পগার আছে, ডাঙা জমি আছে, ভাগাড় আছে, পুকুরগুলোর উঁচু উঁচু ঢালু পাড় আছে। রাখালরা রোগা শুকনো চিমড়ে কিন্তু তাদের গায়ে কী জোর! হাত-পায়ের হাড় লোহার না বাঁশের কে জানে। তা না হলে অখাদ্য বুনো কাঁচা বেল দিয়ে কেউ ফুটবল খেলতে পারে? বোঁটার উপর কিকটা নেহাৎ করা যায় না সেজন্যে বেলটায় একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে নেওয়া হয়। একদিন কোনোরকমে খেলতে পারলে পরদিন অত শক্ত বেলটা খানিকটা নরম তলতলে হয়ে যায়—তখন ভারি মজা।

মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে আমরা হয়তো ঠাকুরদিঘির উত্তর পাড়ে আট-দশটা শেওড়াগাছের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে আমাদের বাড়ির পীর বা পাঁচু ঠাকুরের পুজো হয়; জায়গাটায় ঘন অন্ধকার ছায়া, গরমকালের দিনেও হিম ঠাণ্ডা সেই ছায়া, গাছগুলোর তলায় ঘাস-টাস নেই, মেঝে তকতকে পরিষ্কার। গাছগুলোয় ভূত-টুত থাকে থাকুকগে, তাতে আমাদের কী। এমন গনগনে রোদের দুপুরবেলায় আমাদের চেঁচানিতেও ওরা যদি থাকতে পারে, থাকুক। যে বেচারা খাটুয়ে সে সবচেয়ে দূরের গাছটা ছুঁয়েই দৌড়ে ফিরে আসবে—এর মধ্যে আমরা উঠে যাব এক একটা গাছের মগডালে। এখন তার সাধ্যি নেই যে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে কাউকে ছুঁয়ে দেবে। যখন একটা কোনো গাছের নিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে একজনকে লাফিয়ে লাফিয়ে ছোঁবার চেষ্টা করছে তখন অন্য গাছ থেকে কেউ একজন হনুমানের মতো নেমেই বলবে, তোর জলে নেমেছি। খাটুয়ে খেলুড়েটা দৌড়ে তাকে ছোঁবার জন্যে কাছাকাছি আসতে আসতে সে আবার কাঠবেড়ালির মতো তরতর করে মগডালে উঠে যাবে। ভয়ংকর খেলা। শেষ হলে গাছের তলায় বসে পকেট থেকে নুন-মরিচের গুঁড়ো বের করে কাঁচা আম যে খায়নি, সে আবার দুনিয়ায় খেল কি? আমগুলোও আপনা-আপনি জোগাড় হয়নি, লোকের গাছ থেকে না-জানিয়ে ঢিল মেরে, লাফিয়ে বা গাছে উঠে ছিঁড়ে আনতে হয়েছে। এই বোশেখ-জষ্টির রোদে সারা দুনিয়াই ঝিমুচ্ছে। ঘরের বাইরে কে আবার আসবে দরকারি কাজ না থাকলে!

মাঠের দিকে চেয়ে থাকি। কোথাও কোনো ফসল নেই। আল ঘেঁষে একটা শেয়াল আমাদের দিকে চাইতে চাইতে নিশ্চিন্তমনে চলে যাচ্ছে। অনেক দূরে মানুষমারি মাঠের মাঝখানে বিরাট অশথ গাছটা কীরকম করে যেন দাঁড়িয়ে আছে? আরো অনেকটা দূরে, প্রায় রেললাইনের ধারে জিজুপুকুরের পাড়ে জোড়া পাকুড়গাছ দুটো দুই ভাইয়ের মতো গলাগলি জড়িয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও একটু বাতাস নেই। ধুলোমাখা বনকুলের বড়ো বড়ো ঝোপঝাড়ের ভেতরে রোদ-পোড়া ঘাসের মধ্যে আলের ওপর না হয় কোনো একটা খোঁদলের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে চন্দ্রবোড়া সাপটা চোখ চেয়েই ধুলোর বিছানায় লুকিয়ে আছে। কী অবাক, এখন দুপুর ঠিক নিশুতি রাতের মতোই মনে হয়। কোথাও কোনো শব্দ নেই, তবু একটা ঝিম ঝিম আওয়াজ কানে আসে কেন? বাতাসের শব্দ, ধুলোর ঘূর্ণির শব্দ তো অন্যরকম। তবে কি এটা কোনো শব্দ-নেই-এর শব্দ!

গরুগুলোকে এইবার গোয়ালে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যাবার আগে ঠাকুরদিঘিতে নামিয়ে পেটপুরে পানি খাইয়ে নিতে হবে। দু-চারটে মোষ থাকলে তারা কারো কথা না শুনে হুড়মুড় করে পানিতে নেমে যাবে। পাশে 'দিঘি' নামের দিঘিটার পানি কুচকুচে কালো। তবে যত রোদ যত গরমই হোক, অনেক পানি তো, নিচের পানি খুব ঠাণ্ডা। খুরওয়ালা চারটা পা থাকলেও গরু-মোষ খুব ভালো সাঁতার কাটতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। মোষের তো কথাই নেই—আমরা তার পিঠে চড়ে পুরো দিঘিটা মহানন্দে পার হই। ঠাকুরদিঘির পানির রঙ নীল, তেমন গভীর নয় এটা, ডুব দিলেই মাটি পাওয়া যায়। নতুন কাটা দিঘি, মাটিটা এঁটেল লালচে। কী যে দোষ কে জানে, মাছ বড়ো হয় না। পোনা তেতো হয়, খাওয়াই যায় না। রাইখয়রাগুলো কোনোমতে মুখে দেওয়া চলে।

গরু নিয়ে যে যার বাড়ি গেল। এই শেষ দুপুরে আমার যে কী খিদে, চোখে যেন দেখতেই পাই না। ঠাকুরদিঘিতে নেমেছিলাম তো, আর গা-ধোয়ার দরকার নেই, গিয়েই ফুফুকে বলব, এক্ষুনি ভাত দে। হাড়বজ্জাত ছেলে, দু-চুলোর ছাই দোব, এসো—বলবে বটে তবে সাথে সাথেই ভাত দেবে। কী-ই বা থাকে খাবার! ভাতই শুধু। পেটে যতটা ধরে। একে বলে ভাত-খাওয়া—তরকারি খাওয়া, মাছ-মাংস খাওয়া তো বলে না। আলুনি ভাতটা শুধু শুধু না খেতে হয়, সেজন্যে দু-একটা তরকারি। সারা বছরই মাছ-মাংস নেই। চুনো মাছ-টাছ কখনো কখনো থাকে বটে! আমি বড়ো রুই-কাতলার কথা বলছি, গরু-খাসি-মুরগির মাংসের কথা বলছি। প্রায়ই থাকে কোনো একটা পাঁচমিশেলি ঘ্যাঁট, কুমড়োর ছেঁচকি, পাতলা ডাল, আলুর ঝোল রান্না। হঠাৎ কোনোদিন আলু-পোস্ত আর নিত্যি থাকে পানির মতো পাতলা মাসকলাইয়ের ডাল। অবশ্য কী থাকল তাতে কিছুই এসে যায় না। খেয়ে নেব একপেট ভাত কাঁসার থালায়, তারপর কাঁসার গ্লাসে দু-তিন গ্লাস পানি। বাড়িতে এটা বাঁধা আছে। তবে আমরা যারা সবাই একসঙ্গে ফিরলাম তাদের সবার ভাগ্যে এমন আছে কিনা জানি না। আজকাল কেমন হাঁ হাঁ করে গাঁয়ের সব লোক, চোখের কোণ দিয়ে যেন রক্ত ফুটে বেরুবে, তখন একটা কথা বললে খুন করেই ফেলবে। রাখাল কালো, মোস্তফা, হানুকে দেখি তো—কীরকম হাড়হাবাতে চেহারা, গা দিয়ে খড়ি উঠছে, শুকনো ঠোঁট কুঁচকে, ফেটে চৌচির। যেন পানিও খেতে পায় না তারা! এরা কি কোনোদিন স্কুলে যেতে পারে?

কিন্তু আমাকে ভর্তি হতেই হবে। শহীদুল তার বাবাকে ভর্তি হবার কথা বলে কিনা জানি না, তবে মরে গেলেও আমার বাবার সামনে সে আসবে না। সে সাহস তার কিছুতেই হবে না। আমারও একই অবস্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে গিয়ে কথা বলতে পারি না। কেন পারি না জানি না, বাবা কখনোই তো চেঁচামেচি তর্জন গর্জন করেন না।

কী আর করব, আমি প্রত্যেক দিন বেলা দশটায় স্কুল খুললেই আশপাশে ঘুরঘুর করি। গাঁয়ে পাকা দালান বলতে আমাদের এই স্কুল, আর শিবতলার জোড়া লাগানো তিন মন্দির। সে-ও নিশ্চয়ই মহারাজেরই তৈরি করে দেওয়া। তার দক্ষিণ দিকটায় শীতকালে বোষ্টমিদের খেঁকি কুকুরটার বিচ্ছিরি কটা ছানা জন্মায়। বড়ো হলে তারা মায়ের চেয়েও খেঁকি হয়, কেউ তাদের পালতে নেয় না। ইটের তৈরি বলতে গাঁয়ে আছে তাঁতিপাড়ায় একটা ভাঙা মন্দির। তার আর কিছু নেই, একজোড়া অশথ আর বট মন্দিরটাকে ভেঙেচুরে অজগর সাপের মতো একজন আর একজনকে এমন পেঁচিয়ে ধরে উঠেছে যে দুটোই চ্যাপ্টা ফিতের মতো হয়ে গিয়েছে। আর রয়েছে রায়দের বিশাল দালানবাড়ির মাত্র একটি মরা-খেকো ইটের দেয়াল আর ভাঙা মন্দিরটা।

স্কুলের চারদিকে ঘুরি, কালো কালো ছেলেগুলোকে দেখি টিফিন পিরিয়ডে বেরিয়ে ওরা কলতলার দিকে যাচ্ছে। মাস্টারমশাইরা ক্ষারে-কাচা ধুতি শার্ট পরা। ধুতি বেশ উঁচু করে পরা কিন্তু কোঁচাটা মাটি পর্যন্ত লম্বা। পায়ে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া স্যান্ডেল না হলে মোটা চামড়ার নিউকাট জুতো, পাগুলোকে যেন কচ্ছপের মতো কামড়ে ধরে আছে। শার্ট না পরে দু-চারজন আবার পরেছেন খদ্দর, না হয় মার্কিন কাপড়ের পাঞ্জাবি। কারো জামা-কাপড় ময়লা নয়। বলে বটে বেত মারা হবে, তবে বেত এই স্কুলে একটাও নেই। প্রায় সব মাস্টারের একটা করে মোটা কঞ্চি। গিঁটগুলো পর্যন্ত চাঁছা নেই, মাথায় পিঠে এক ঘা দিলে গিঁটে লেগে ফুটো হয়ে যাবে। তবে তত মারে না বোধহয়।

বোর্ডিংয়ের পিছনে নিমগাছে বসে আছি—নিমফল পেকে আলো হয়ে আছে। খেতে কিন্তু নিমপাতার মতো তেতো নয়, বরং মিষ্টি মিষ্টিই লাগে, বোঁটার উল্টোদিকে টিপলে ছোলা লিচুর মতো মুখে চলে যায়। তবে অন্তত দশ-বারোটা মুখের মধ্যে না জমলে শাঁসটা খেয়ে মজা হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, আমাকে ছাড়াই সব ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, পড়া অনেক এগিয়ে যাবে, তখন একদিন আর থাকতে পারলাম না। বাবার সামনে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছি। একবার কেবল মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কী? মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, স্কুলের ভর্তির তারিখ পেরিয়ে যাবে।

কবে?

খুব শিগগির।

কবে জানিস?

না, তা ঠিক জানি না।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।

ব্যস, কথা শেষ। আর একটি কথা চলবে না। মিথ্যে করে একটা তারিখও বলা যাবে না। জানতে পারলে পিঠের ছাল তুলে ফেলবেন। সামান্য ছোটোখাটো একটা মিথ্যা বললে সত্যিই রক্ষা নেই। তাতে ক্ষতি তো তেমন কিছু হয় না, তাহলে অত রেগে যান কেন?

কবে ভর্তি হব?

সাথে সাথে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, বললাম তো সে হবে, যা।

চলে এলাম সামনে থেকে। একদিন গেল, দু দিন গেল, তিন দিন গেল। কিছুই হলো না। শেষ পর্যন্ত মাকে গিয়ে ধরলাম। তাকে একটুও ভয় করি না। খুব সোজা মানুষ, লোকে হয়তো মাকে বলবে বোকা মানুষ। যে যা-ই বলে, বিশ্বাস করে।

আমি স্কুলে ভর্তি হতে পারব না নাকি?

পারবি না কেন? বড়ো খোকা ভর্তি হয়েছে, জাহানারা ভর্তি হয়েছে। এ বাড়ির ছেলে-মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হবে না?

তা হচ্ছে কই? ভর্তির সময় পেরিয়ে গেলে ভর্তি করাবে?

তোর বাপ নিশ্চয়ই জানে কবে ভর্তির দিন শেষ।

ছাই জানে? মায়ের কাছে আমার খুব তেজ। বাপজান খালি বলছে, সে হবে হবে, যা।

তাইলে তাই হবে।

ব্যস, মা নিশ্চিন্ত। হবে যখন বলেছে তখন হবে বৈকি! কিন্তু আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদিন কেটে গেল, বাবার একটুও নড়াচড়া দেখতে পেলাম না। প্রত্যেক দিন একবার করে মায়ের কাছে যাই, আর ঘ্যান ঘ্যান করি, আমাকে ভর্তি করাবি না, নাকি? সবাই ভর্তি হয়ে গেল।

তা, হ্যাঁরা, আমি কী করব? ভর্তি করে দেবে বলেছে তো কর্তা।

মুখে একবার বলতে হয় তাই বলেছে। ভর্তি করার ইচ্ছা নয়। তু নিজে যেয়ে বাপজানকে বল।

ওরে বাপরে, তাইলে আমার রক্ষে রাখবে না।

মা, তোকে একবার বলতে হবে।

সরল মানুষ আমার মা বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকায় আমার দিকে। ভরাট, বড়ো গোল ফর্সা মুখ। রাজ্যের ভালোমানুষি আর দয়া মুখে। কী ভেবে বলল, আচ্ছা, যা বলব।

আমি জানি আজ বলবে মা। মায়ের আবার আর এক অভ্যাস, যা বলে পষ্টাপষ্টি বলে। ঐ যে মানুষের সবার সব কথা বিশ্বাস করে যে! একটা কথা ধরলে আর ছাড়বে না। কথাগুলো তখন আর একটুও সাজানো-গোছানো থাকে না, খুব কাঠ-কাঠ হয়ে যায়। সেদিনই দুপুরে বাবাকে খেতে দিয়ে বলে চললেন তুমি মেজখোকা আর শহীদুলকে ভর্তি করাবে না নাকি?

বাড়ি থেকে একটু দূরে আলাদা একটা ঘরে আমরা থাকি। বাবা একেবারে একা খান। সকলের সঙ্গে বসে একসঙ্গে খেতে দেখিনি তাঁকে কোনোদিন। গাঁয়ে বিয়ে বা ঐরকম কোনো নেমন্তন্ন করলে তিনি যেতেন না, তাঁকে খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বাড়িতেও তাই। মা তিনবেলা খাবার বয়ে নিয়ে যান তাঁর ঘরে। সেদিন তিনি কেবল খেতে শুরু করেছেন, মায়ের কথাটা শুনে খাবার হাতেই মায়ের দিকে কড়া চোখে তাকালেন, কে বললে?

আবার কবে ভর্তি করবে, দিন চলে গেলে?

সে হবে, হবে।

হবে হবে তো বলছো, করাইছো না তো?

আমার সরল মা আর ছাড়বে না, ছেলেকে ভর্তি করাবে, করাবে, হবে হবে করছো কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরে, হবে বলছি তো। যাও এখন।

হ্যাঁ, যেচি, ভর্তি করালে এইবার করাও। ছেলের মন খারাপ হবে না? কবে পাস করে বসে আছে।

আঃ, এক কথা একশ বার! যাও তো এখন। বাবা ঝেঁঝে উঠলেন। কপালের মাঝখানে তিন-চারটে ভাঁজ পড়ল।

কী জানি বাবা, কথা বলার উপায় নাই, কিচু বললেই অসৈরণ। ছেলেকে ভর্তি করাবে তো করাও গা—মা বক বক করতে করতে ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাড়ির দিকে গেল। বাবা রাগ-রাগ মুখে খাওয়া শেষ করলেন। খান তিনি সামান্যই—কিন্তু কতরকম রান্না যে তিনি খেতে পছন্দ করেন তার আর শেষ নেই। যে খাবার কেউ খেতে চায় না তা-ও তিনি খাবেন। কোথায় কষ্টা ডুমুর-ভাজা, চালতার টক-ছিবড়ে, তেতো হেলেঞ্চার শাক—কলমির শাক কিংবা কাঁটানটে, গাধাপুইনি, পুনকো শাক, একটুখানি আলু-পোস্ত, কচি নিমপাতা ভাজা। এত সব ছুটকো খাবার! কোনোটাই একবার-দুবারের বেশি মুখে দেন না। আমি কখনো কোনোদিন বাবাকে একটু বেশি খেয়ে হাঁশফাঁস করতে দেখিনি। কোনোদিন না। নিজের ওপর এমন জোর।

ঠিক তার পরের দিন দশটার দিকে স্কুলে গিয়ে ক্লাস ফাইভের জানলার পাশে দাঁড়িয়েছি, দেখি বাবা বোর্ডিং ঘরের দিক দিয়ে স্কুলের হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকলেন। ছোটখাটো পাতলা-সাতলা মানুষ। একদম ফিটফাট। পরনে ধুতি আর শাদা শার্ট। কাচা, ফরশা বটে শার্টটা কিন্তু ইস্তিরি করা নয়। আমাদের গাঁয়ে ধোপাবাড়ি নেই। বাড়িতে তারে জামাকাপড় শুকুতে দেবার সময় বাবার যত্ন দেখতে হয়, সব ভাঁজ টেনেটুনে এমন সমান করা যেন ইস্তিরির বাবা।

লাইব্রেরি ঘরটা স্কুলের ঠিক মাঝামাঝি ছিল। একমাত্র ঐ ঘরটারই দরজার মুখে দুটো সিঁড়ি ছিল। আমরা ওটাকেই লাইব্রেরি, অফিসঘর, হেডমাস্টারের ঘর বলতাম। একঘরেই সব, মাস্টারমশাইদের বসার জন্যে তিন চারটে বেঞ্চি পাতা আছে ঐ ঘরেই। হুঁকো কল্কে, তামাক খাবার আয়োজন, জলভর্তি পেতলের ঘড়া, টিনের গ্লাস, পাশেই কাঠের হাতুড়ি আর ফুটোয় শক্ত দড়িবাঁধা ইস্কুলের কাঁসার ঘন্টা। এসবই ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একভাগে—তিনটে বইয়ের আলমারি দিয়ে মাঝখানে দেয়াল করা হয়েছে—ওদিকে হেডমাস্টারের চেয়ার, বড়ো একটি টেবিল চেয়ার নিয়ে স্কুলের কেরানি মণীন্দ্রমাস্টার। লাইন টানার জন্যে কালো রঙ-করা কাঠের একটা বিরাট রোলার আছে। সবাই বেশ সাজিয়ে বসে। এই সময় বাবা ঘরে ঢুকে হেডমাস্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বোঝাই যায় না এই মানুষটা আমার বাড়িতে-থাকা বাবা। কোথায় তাঁর সেই তিরিক্ষি মেজাজ, কিছু বলার আগেই হাত নেড়ে থামিয়ে দেওয়া? এ একেবারে অন্য মানুষ, ঠোঁটে অল্প একটা হাসি হাসি ভাব, হাসিটা ফুটে উঠলে ভারি মিষ্টি, অন্য দাঁতগুলোর চেয়ে বেশি শাদা একটা কুকুরদাঁত বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু খুব জোরে শব্দ করে হাসেন না তিনি। আর নরম নিচু গলায় এমন করে ছোট্ট ছোট্ট রুপোলি ঢেউ তোলার মতো কথা বলেন যে তিনি কথা বলতে শুরু করলে বাকিরা তাঁর কথাই মন দিয়ে শোনে। বাইরে অন্য মানুষদের মধ্যে ঘরের বাবা একদম হারিয়ে যান। এমনকি বাড়িতেও বাইরের মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তাতে তিনি একই রকম আলাদা মানুষ। এই মানুষটাই এমন অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন কেন কে জানে।

আমি এর মধ্যে সুড় সুড় করে লাইব্রেরি ঘরের খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। ঘরের চৌকাঠ আমার বুক পর্যন্ত উঁচু, ঘর থেকে আমার মাথাটাই শুধু দেখা যাবে। বাবা আমাকে দেখতে পেলেন, নরম চোখে সেদিকে একবার চেয়ে হেডমাস্টারের কাছের চেয়ারে বসে বললেন, ছেলেটাকে ভর্তি করে দিতে এসেছি হেডমাস্টার।

বেশ তো, বেশ তো, খুব ভালো কথা পণ্ডিত, ইঙ্গে, ইয়ে, ইঙ্গে, ভর্তি করে দিতেই হবে আপনাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের...ইঙ্গে, ইয়ে...

দ্যাখো তো মনিন্দর, কী কী করতে হবে বলো। কত কী লাগবে একটু হিশাব করো। শুধু তো ও ভর্তি হবে না, ওর খুড়তুতো ভাই শহীদুলও ভর্তি হবে। সে এক বছরের বড়ো, তবে পড়ে একসাথেই।

কেরানি, আবার আমাদের গেম টিচার, তারপরে আমাদের লাইব্রেরিয়ান মণীন্দ্র দাঁ একটা রাফ খাতায় কাঠ পেনসিলে হিশাব করতে করতে বললেন, আমি সব করে দিচ্ছি, ফর্ম-টর্ম সব পূরণ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছি—আপনি ওদের পুরো নাম, জন্ম তারিখ সাল এই সব বলে দিন, পরে একটা সই করে দেবেন।

ওদের জন্ম তারিখ-টারিখ আমার খেয়াল নাই, ওর ভাইয়ের জন্ম তারিখ সাল তার বাপ ঠিক বলতে পারবে বলেও মনে হয় না। বরং তোমাদের স্কুলের প্রমোশন-ট্রমোশনের কাজ শেষ করে, শীতের ছুটি, ধানকাটা এইসব সাঙ্গ করে নতুন ক্লাস তো শুরু হয় এই মাঘ-ফাল্গুনেই। এখনকার কোনো একটা ইংরেজি সাল-তারিখ দিয়ে দিলেই হয়।

মূল থেকে আবার খুব বেশি তফাৎ না হয়ে যায়। ষোলো বছর বয়েস না হলে তো আবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারবে না।

না, না, তা হবে কেন। কাছাকাছিই থাকবে। বরং আমার ছেলেটার দাও দোসরা ফেব্রুয়ারি, উনিশশ উনচল্লিশ, শহীদুলের দাও ঐ দোসরা ফেব্রুয়ারি, উনিশ শ আটত্রিশ। এতে বড়ো জোড় মাসছয়েক ইদিক-ওদিক হবে।

তাই করে দিচ্ছি—মণীন্দ্রমাস্টারের মুখে এখন মিষ্টি মিষ্টি কথা। অথচ এই মানুষটাই ক্লাস সেভেন পর্যন্ত আমাকে কী জ্বালান না জ্বালাবে স্কুলের মাইনের জন্যে, যা, তোর বাবাকে গিয়ে বলগা কাল মাইনে না নিয়ে স্কুলে এলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন আমি আনন্দে ঘামতে শুরু করেছি। কী করে সম্ভব যে আমি গাঁয়ের পাকা স্কুলে, যবগ্রাম মহারানী কাশীশ্বরী ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়ে গেলাম! বাবা কথা বলছেন হেডমাস্টারের সঙ্গে। কিন্তু আমি জানি বাবাকে পছন্দ করেন না হেডমাস্টার। বাবাও পছন্দ করেন না তাঁকে। কী জন্যে আমি ঠিক জানি না। হেডমাস্টার শৈলজাবাবুকে সবাই ইঙ্গে মাস্টার বলত। কথার মাঝে মাঝেই একবার করে 'ইয়ে' বলতে গিয়ে 'ইঙ্গে' বলতেন। একটু ঘন ঘনই বলতেন। ভট্টাচার্য বামুন—খুব সুন্দর দেখতে, গায়ের রঙ টকটকে ফরসা। মাথাজোড়া বিরাট চকচকে টাক—আয়নার মতো—রোদ ঠিকরে পড়ে, সে সময় ওদিকে তাকালে চোখ ধেঁধে যাবে। ঘাড়ের দিকে কিছু চুল অবশ্য আছে। মোসলমান পাড়ার মানুষরা বলত, খুব হিঁদুয়ানি মাস্টারের। মানুষকে মানুষ মনে করে না। ধুতি-পরা খালি গায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতেন বাড়িতে। ঝকঝকে মাজা সোনার মতো গাড়ু হাতে সকালে-বিকালে মাঠে যেতেন। পৈতেটাও তাঁর মোটা আর সাদা। তাঁর মেয়ে শিবুরাণী খুব সুন্দরী, আগে নাকি স্কুলে পড়ত। এখন আর পড়ে না। যাই হোক আমি ভর্তি হবার পরে ইঙ্গে মাস্টার আর বেশিদিন থাকতে পারলেন না গাঁয়ের স্কুলে। সেজন্যে বোধহয় বাবার হাত ছিল। ঠিক জানি না।

কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না এই এখুনি আমি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। এত সহজে! মনেই হচ্ছে না। যতবার বাবার কাছে ভর্তি হবার কথা বলতে গিয়েছি ততবার রেগে আগুন হয়ে 'হবে হবে, যা' বলে আমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। মাকেও কেমন করে একদিন খেঁকড়ে উঠেছিলেন। এখন একেবারে নিপাট গাঁয়ের ভদ্রজন। অথচ আমি জানি ভর্তির কাগজপত্র নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি পৌঁছুবার সাথে সাথে বাবা আবার ঠিক আগের মানুষটাই হয়ে যাবেন। দুটোই কিন্তু আসল মানুষ—তেমন কোনো খাদ নেই।

আসল কথা হচ্ছে—একেবারে লাখ কথার এক কথা—টাকা কোথায় পাওয়া যাবে! সব আছে, শুধু টাকা নেই, টাকা দেখতে পাই না। কাগজের নোট, পুরো টাকা দেখাই যায় না, যা দেখি তার সবই প্রায় রুপোর টাকা আধুলি আর সিকি দু-আনি, আনি, দু-পয়সা, দু-তিন রকম তামার এক পয়সা, আধ-পয়সা, সিকি পয়সা। ঠন ঠন করে টাকা বাজে ধান-চালের আড়তে, বড়ো বড়ো মুদিখানায়। কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে খুচরো পয়সা ছাড়া উপায় নেই—যেমন ট্রেনের টিকিট, সার্কাসের টিকিট। মেলায় গিয়ে জিনিশপত্র কিনতে গেলে, বাইরে গঞ্জের দোকানে একটা জোড়া-মণ্ডা খেতে চাইলে। গাঁয়ের ভেতরে টাকা-পয়সা খুব কম। মুদিখানায় জিনিশ কিনতে আঁচলে করে চাল নিয়ে গেলেই চলে। কোনো কোনো দোকানে ধানও চলে। মাঘ মাস পেরিয়ে চোত এসে গেলে বেগুন ভারি শস্তা হয়ে যায়, তখন এক আনায় পাঁচ সের বেগুন পাওয়া যায়। কিংবা এক ঢেউ ধান দিলে তিন ঢেউ বেগুন দিয়ে দেয়। চাল পেলে তো কথাই নেই। বাইরের গাঁ থেকে কাঁঠালের গাড়ি আসে, শাঁক আলু, মিষ্টি আলু বেচতে নিয়ে আসে। বেচা-কেনা সব চাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা ধান দিয়ে, পয়সাকড়ি লাগে না। বাগদি-বৌ-এর কাছ থেকে ছোটো মাছ কিংবা শাকঅলার কাছ নালতে শাক, কুমোরের কাছ থেকে হাঁড়ি-কলসি কিনতে গেলে পয়সা লাগে না, ধান-চালেই সব হয়।

আমাদের বাড়িতে অনেক পয়সাকড়ি নেই বটে, তবে খালি-লোকসানের যে মুদিখানা ছিল নিগণে সেখানে গদিতে দোকান বন্ধ করার আগে রাত আটটা ন-টার পরে সারা দিনের বেচাকেনার হিশাব করার সময় টাকাপয়সা গোনা-গাঁথা হতো। থাকে থাকে খুচরো গুনে সাজিয়ে রাখা। খদ্দের বাড়ানোর জন্যে কিনা কে জানে, আমাদের সবই প্রায় ধারের কারবার। আশেপাশের, কাছের দূরের সব গাঁয়ের খদ্দেরদের ধারে মাল দেওয়া হতো। সেই ধারের টাকা কেউ সহজে শোধ করত না।

তবে ধারের কারবার কমবেশি সবাই করত, গাঁয়ের গরিব খদ্দেরদের হাতে নগদ টাকা আসবে কোথা থেকে? এই জন্যে দোকানদারদের সপ্তাহের একটা দিন থাকত তাগাদার দিন বলে। ঐদিন কেউ কিছু করতে বললেই বলা হতো, মঙ্গলবার আবার তাগাদার দিন, ওদিনে কিছু করতে পারব না। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরের দিকে বগলে ছাতা, হাতে একটা লাঠি নিয়ে বড়ো বড়ো মাঠ, জলকাদার খালবিল পেরিয়ে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যাওয়া আর গরিব-বড়োলোক খদ্দেরদের বাড়ি গিয়ে পাওনা টাকার জন্যে তাগাদা দেওয়া—এই হলো কাজ। কোনো টাকাই কিন্তু হাতে হাতে শোধ হবে না, বলতে কী সরাসরি টাকা চাওয়াও হবে না। বাড়িতে বসে টাকা শোধও করত না কেউ। সবাই জানে মানুষটা টাকার জন্যে আসেনি, এসেছে তাগাদা দেবার জন্যে। সেটা মুখে স্পষ্ট করে না বললেও চলে। গরমে কাতর কিংবা বিষ্টিতে সপসপে ভেজা দেখলে বাড়িতে অতিথির মতো আপ্যায়নও করা হতো। একটু জলপান, ঠাণ্ডা জল, একটু হুঁকো-টুকোর ব্যবস্থাও হতো। দোকানেরই কেউ তাগাদায় বেরুত, আমার ল'-চাচা কিংবা সিরাজুল ভাই। শীত নেই, বোশেখ জষ্টি আষাঢ় নেই, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দূরের দূরের ধোঁয়াটে গাঁগুলোতে যাওয়া— পথে গোখরো চন্দ্রবোড়ার সামনে গিয়ে পড়া। কী যে মজা এতে কে জানে? কখনো খালি পা, কখনো সেই অবলা মুচির মরা-গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি লোহার-বাপ মার্কা চটি। এই রকমই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটা কাজ ছিল বনেদি হিন্দু পরিবারের বুড়ি মা, কিংবা বুড়ো-কর্তার অতি বুড়ি থুত্থুরে গিন্নিমা গঙ্গা পেলে। সাত গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন করতে হবে গলায় ধুতির কোঁচা বেঁধে। এজন্যে বাড়ির গোমস্তা মশাই কিংবা ভাড়া-করা লোকের ওপরই দায়িত্ব পড়ত। বড়ো বড়ো গদির মালিকরাও অনেক সময় পয়সা দিয়ে তাগাদা দেওয়ার লোক লাগাত।

এত করেও আমাদের এলাকায় টাকা-পয়সা কই? শুধু মাঠ ফেটে পড়ছে ধানে, সরষের ফুলে আলো হয়ে উঠেছে গাঁয়ের আশেপাশের উঁচু রবিফসলের জমি। ফলতো আরো কত রকমের মজার মজার জিনিশ। কী আর করা যাবে, যা নেই, তা তো নেই। বাবা যাই-ই বলুক, আমি জানি আমাকে কত ভুগতে হবে।

কাল থেকেই স্কুলে আসব। কিন্তু আসব কী পরে? মোটে দুটো হাফ-হাতা জামা, দুটো দড়ি লাগানো প্যান্ট। জুতো এখন নেই-ও, তার দরকারও নেই। স্কুলের ছেলেদের কেউই জুতো পায়ে আসে না। সবাই খালি পায়ে। তাদের হাতে রবিনসন বার্লির ঘন নীল রঙের একটা টিফিনের কৌটো। তাতে মুড়ি গুড় কাঁচা পেয়াজ আছে। টিফিন পিরিয়ডে টিউবওয়েলের জল দিয়ে ভিজিয়ে গপ গপ করে খেয়ে নেওয়া। আমাদের এখানকার জলটাও সাংঘাতিক। যেমন মিষ্টি, তেমনি ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার। খাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই পাথর খেলেও হজম। বিকেলের দিকে ছেলেরা খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখে। আমরা গাঁয়ের ছেলে, টিফিনের ঝামেলা নেই, একছুটে বাড়ি গিয়ে গরম ডাল-ভাত খেয়ে আসি। কিন্তু আমার জামাকাপড়ের কী হবে? বাবাকে বলে কোনো লাভ নেই—যা আছে এখন তাই পরে যা, পরে দেখা যাবে। আমার আবার একটা বাড়তি মুশকিল হয়েছে—প্রতি রাতেই তো ঘুমের মধ্যে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলি। স্বপ্নে দেখি যে বাইরে নালার ধারে গিয়ে বসে পেচ্ছাব করছি—মা অনেক সময় গায়ে হাত দিয়ে বলে, দ্যাখ তো বাবা, কী করলি! প্রত্যেক রাতেই এই হয়; সকালে উঠে প্যান্টটা বদলাই। তাই বলে প্রত্যেক দিন কি তা সম্ভব হয়? রোদ না থাকলে বা বিষ্টি হলে পানিতে-কাচা প্যান্ট কি শুকোয়! তখন ভেজা প্যান্টই পরি বা, কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে কিছু না বলে চুপিসারে রাতের প্যান্টটাই পরে থাকি। পরনেই শুকোতে থাকে।

এদিকে তো এই। অন্যদিকে ক্লাস ফাইভের বই কই! দুই ভাইয়ের আলাদা আলাদা বই না হয় না-ই থাকল—একটা বইই না হয় পাল্টাপাল্টি করে পড়লাম। আমি ইংরেজি, তো শহীদুল বাংলা বা ইতিহাস এমনি করে। কিন্তু সব বিষয়ের অন্তত একটি করে বই তো থাকবে। তারপর খাতা পেনসিল। শ্লেট-পেনসিল তো আর চলবে না! কী সুন্দর টিটাগড়ের শাদা ফুল-স্ক্যাপ কাগজ পাওয়া যায়। আর পেছনে রবারের ইরেজার লাগানো উড-পেনসিল। আজকাল গাঁয়ের সব দোকানেই পাওয়া যায়। কিনে দেবে কে? তবে কাগজ খাতা কলম এসব তো পরের কথা, ক্লাস ফাইভের বইগুলো জোগাড় হবে কোথা থেকে? বই ছাড়া আমি ক্লাসে ঢুকব না। বাবা বর্ধমান শহরের দামোদর পুস্তকালয় থেকে নতুন বই কিনে নিয়ে আসবেন, তাদের গন্ধ শুঁকব, মলাটে হাত বুলোব, আলাদা করে বাঁশপাতা রঙের খয়েরি কাগজ কিনে মলাট লাগাব—এসব তো মাঠের অশথতলায় বসে ঝিমধরা দুপুরে দিনের স্বপ্ন হিশেবেও দেখতে পাচ্ছি না। বরং পুরনো বই হলেও হয়, মলাট-ফলাট লাগিয়ে নেওয়া যাবে। আমাদের এখানে বেশিরভাগ ছেলেই তো তাই করে। যে ক্লাস সিক্সে উঠে গেল, সে তার পুরনো বইগুলো বেচে দেবে ক্লাস ফাইভের কারো কাছে, তারপর নিজে কিনবে সেভেনে উঠে-যাওয়া কারুর পুরনো বই। নতুন বই আর গাঁয়ের কটা ছেলে কিনতে পারে?

একটা মুশকিল হয় অবশ্য। প্রতি বছরই প্রত্যেক নতুন ক্লাসে একটা-দুটো বই বদলানো হয় কিংবা নতুন বই দেওয়া হয়। আর একটা অসুবিধে হয়; একই ভূগোল বা ইতিহাসের বই বহুদিন ধরে চললে দু-বছর তিন-বছর পরে পরে সে বই অনেকটা বদলে যায়, কিছু বিয়োগ হয় বা কিছুটা আবার নতুন করে লেখা হয়। একে নাকি বলে নতুন সংস্করণ। তা আমার ওতে তেমন কোনো ডাল গলছে না, বই পেলেই হলো, সংস্করণ-টংস্করণ কে দেখতে যাচ্ছে! আগে আমি ক্লাস সিক্সে-ওঠা কার কাছে বই পাওয়া যাবে সেই খোঁজ তো করি। শুনলাম দৈবজ্ঞ-পাড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমর পালের কাছে বই আছে, সে ক্লাস সিক্সে উঠেছে, ফাইভের বইগুলো বিক্রি করবে। সেই দিনই বিকেল বেলায় তাদের বাড়ি গেলাম।

বিকেল বেলার ছায়ায়-ঢাকা তাদের মাটির বাড়িটা চুপচাপ। কেউ কোথাও নেই। উঠোন গোবর-জল দিয়ে নিকনো, পরিষ্কার তকতকে, একটি ঘাস নেই কোথাও। লাল রঙের ওদের বুড়ো কুকুরটা জামতলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আধখানা চোখ খুলে আমাকে দেখে কার গরজ পড়েছে চেঁচাবার এই রকম ভাব করে আবার চোখ বুজলো। ফিরে যাব কিনা ভাবছি। এমন একটা কাজকর্ম নেই বিকেলে আরামে আপনা-আপনি চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে যে বাড়িটা সেখানে কাউকে ডাকা যায় নাকি! তখন দেখলাম একটা দরজা খুলে ছায়ার মধ্যে থেকে ছায়ার মতো বেরিয়ে আসছে অমর। আস্তে আস্তে মাটির দাওয়া পেরিয়ে, উঠোনে নামার তিনটি সিঁড়ি পেরিয়ে সে আমার কাছে এসে বিকেলের ঘুম ঘুম গলায় খুব আস্তে আস্তে বলল, বই নিবি?

আছে? বিক্রি করবে? আছে সব বই?

আছে, দু-একটা ছাড়া সবই। একটা-দুটো বই কিন্তু খুব পুরনো। ইঁদুরে খেয়েছে, পোকায় কেটেছে, ছেঁড়াও আছে। এত পুরনো বই দেখলে মাস্টার মারবে কিনা জানি না।

তা হোক। দাম হিশাব করেছো?

তা করেছি। এক টাকা দু-তিন আনা লাগবে।

আনবে বইগুলো? একবার দেখতাম।

দাঁড়া তবে।

অমর ভিতরে চলে গেল। একটু পরে আবার সে ঘরের ঘন ঠাণ্ডা ছায়ার ভিতর থেকে দাওয়ার হালকা ছায়া পেরিয়ে দু-হাতে বইগুলোকে খুব যত্ন করে ধরে উঠোনে নেমে এল। আমার আর তর সইছে না, কতক্ষণে বইগুলো হাতে নিয়ে দেখব! সব ছেঁড়াখোঁড়া বই, আগের মালিকের নাম কেটে অমর লিখেছে নিজের নাম : শ্রী অমর পাল, সাং-যবগ্রাম, ক্লাস ফাইভ, মহারানী কাশীশ্বরী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। এখন আমি যদি কিনি তাহলে ওর নাম কেটে আমার নাম লিখব। বইগুলোতে মোটা কাগজের মলাট দিয়েছে বটে, তবে সেসব বেশির ভাগ ছিঁড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে, পাতাগুলো ময়লা, যেখানে-সেখানে এটা-সেটা লেখা আছে, কলমের কালিতে, পেনসিলে, কোথাও কোথাও কার্বন পেনসিলে। সে লেখার বেগুনি রঙ ধেবরে গিয়েছে। অনেক পাতারই কোণগুলি কেউ খেয়ে ফেলেছে, আগাগোড়া ছেঁড়া-পাতা কাগজে বাবলার আঠা লাগিয়ে জোড়া লাগানো। তবু বইগুলো হাতে নিয়ে মনে হলো সাত রাজার ধন মানিক পাওয়া গিয়েছে।

কত দাম বললে অমরদা?

একবার হিশাব করেছিলাম—এক টাকা দু-তিন আনা হবে।

কালকে বই নিয়ে যাব। আর কাউকে বেচো না কিন্তু।

কালকেই কিন্তু বলে দিচ্ছি। কাল না কিনলে আর কোনো খদ্দের এলেই দিয়ে দোব।

বেশ।

বাড়ি এসে সেদিন সন্ধেবেলায় বাবার সামনে দাঁড়াই, ক্লাস ফাইভের পুরনো বই পাওয়া যাবে অমরের কাছে। কালকের মধ্যে কিনতে হবে। বাবা ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে আমার দিকে তাকালেন। একটু পরেই মুখের বিরক্তভাবটা চলে গেল। দুই ভুরুর মাঝখানটা শান্ত হলো যেন।

দাম বলেছে?

এক টাকা দু-তিন আনা হবে।

দেখছি।

কাল না কিনলে আর কাউকে বেচে দেবে বলেছে।

সাথে সাথে মুখের বিরক্তভাবটা ফিরে এল, বলছি তো দেখছি!

পরদিন দুটো খাঁটি রুপোর আধুলি পাওয়া গেল। বাকি দু-তিন আনার কথা আমি আর তুলিই না। মাকে ধরি। মায়ের হাতে কখনোই কিছু থাকে না। যদি কোনোদিন দু-চার আনা থাকে, যে চায় তাকেই দিয়ে দেয়। বাবাই নেয় বেশি। ফুফুর কাছে পয়সাকড়ি কিছু কিছু থাকে। মা-মরা কচি ভাই, আলম ভাই তার ছেলেই তো, তারা তাদের খালাকে দু-চার টাকা দেয় কখনো কখনো। ওদের অবস্থা ভালো। কচি ভাই চাকরিও করে। এখন পাকিস্তানে রাজশাহীতে 'অপশন' না কী দিয়ে ছোটচাচা, কচি ভাই আর কচি ভাইয়ের বন্ধু শানাই ভাই চাকরি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুফুকে ধরে আরো চার আনা পাওয়া গেল। বিকেলে গিয়ে দিগ্বিজয় করার মতো বই নিয়ে এলাম। পকেটে দু-আনা থাকলও। অমর এক আনা মাপ করে দিয়েছে। সমস্ত সন্ধেবেলাটা বইগুলোর খুব সেবা-শুশ্রূষা করলাম।

কাল স্কুলে যাব।

আমাদের এদিকে আশেপাশের বড়ো বড়ো গাঁগুলিতেও হাইস্কুল নেই। গাঁয়ের বাইরে এসে মাঠের ধারে দাঁড়ালে মনে হয় সারা পৃথিবীতে বোধহয় মানুষই নেই। বড়ো বড়ো সমান-বিছানো মাঠ, মানুষজন দেখা যায় না। দূরের দু-চারটে মানুষ দেখায় খুদে খুদে। আরো দূরে বিরাট বিরাট গরুর পাল চরছে, তাদেরও দেখাচ্ছে খুদে খুদে। কী যে তারা খাচ্ছে তারাই জানে। ঘাস-টাস রোদে পুড়ে গিয়েছে, সেই ঘাসের সঙ্গে বোধহয় গরুগুলো মাটিও খায়—বর্ষাকাল শীতকালের কথা আলাদা—এমন মাঠের ওপর আকাশও দেখা যাচ্ছে বড়ো। দুপুরবেলায় ভয়ই লাগে আর ভূত মানে তো যেখানে-সেখানে ভূত দেখা নয়, ভূত মানেই হচ্ছে তা থাকে আবার থাকে না, কোথাও থাকে না। যেখানে-সেখানে থাকতেও পারে। সেজন্যে ভূত হচ্ছে অন্যরকম, কেমন যেন ভূত ভূত, সব কিছুই ভূত-লাগা। এই মাঠ আকাশ, ঝোপঝাড়, বড়ো বড়ো বট অশথ শ্যাওড়া, গরুর পাল, খুদে খুদে রাখালগুলো সবই কেমন ভূত-লাগা।

এই রকম ফাঁকা মাঠে অনেক দূরে দূরে গাঁগুলো। এমন ধোঁয়াটে আবছা যেন নেই-ই অথচ এক একটা গাঁয়ে ঢুকলে সে গাঁ যেন আর শেষ হতেই চায় না। ধুলো-ভরা চওড়া রাস্তার দু-পাশে বড়ো ছোটো মাটির বাড়ির সার এমনি ঘন যে দুই বাড়ির মাঝখানের গলি দিয়ে একটা মানুষ ঢোকাও কঠিন। আর এত মানুষ এক-একটা গাঁয়ে! এত গাছ, এত দিঘি, এত কিলবিলে রাস্তা মাঠ থেকে গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় ঢুকেছে, এত ভাঙা ঘাট, ভাঙা মসজিদ, ভাঙা মন্দির! ভাঙা ঘাট, ভাঙা মসজিদ ব্যবহার হয়, মন্দিরগুলো পড়ে থাকে, গাছপালায় ঢেকে যায়। সাপ বাদুড় আর শেয়ালরা বেশ বাস করে সেখানে বুড়ো পাকুড়তলার ছায়া রোদ বর্ষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে। কিন্তু হাইস্কুল কই? স্কুল বলতে এঁটেল মাটির ভীষণ কাদা আর ধুলোভরা আমাদের গাঁয়ে এই পাকা হাই স্কুল আর পাশের ক্ষীরগাঁয়ে চলনসই একটি মাটির ঘরের স্কুল। বামুনগাঁ, ধারসোনা, গিধ্‌গাঁ, ইটে, পুইনি, পলাশি, গোবর্ধনপুর, বেলগাঁ, সাঁওতা, কসগাঁ, নবগ্রাম কোথাও হাইস্কুল নেই। এমনকি এক ক্রোশ দূরে আমাদের রেল স্টেশন যে নিগণ—আঠারো পাড়া গাঁ, কত বড়ো গঞ্জ, ধান চালের আড়তে ভরা ব্যবসার জায়গা, দিনে পাঁচবার ছ-বার ছোটো লাইনের ট্রেন যায়—সেখানেও কোনো স্কুল নেই। আছে বটে আর একটা বড়ো স্কুল, অনেকটা দূরের বড়ো গাঁ মাথরুণে, সে-ও কাশিমবাজারের মহারাজেরই করা, তাঁরই মামী মহারানী স্বর্ণকুমারীর নামে। স্কুল যত বিখ্যাত, তার চেয়ে বিখ্যাত ছিল তার হেডমাস্টার। বিরাট কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। বাবা নিজে তেমন কিছু ঠিকঠাক পড়াশোনা না করলেও কুমুদরঞ্জন মল্লিক হেডমাস্টার থাকার সময় সেখানে অল্প-স্বল্প মাস্টারি করেছিলেন। সোজা কথা নয়, একজন জ্যান্ত কবিকে তিনি দেখেছেন।

এত বড়ো জমিদার কাশিমবাজারের মহারাজা সাধ করে কি এত গাঁ থাকতে আমাদের এই হতচ্ছাড়া গাঁ যবগ্রামে হাইস্কুল করলেন? সাধ করে মোটেই নয়, এই যবগ্রামে যে তাঁর শ্বশুরবাড়ি! গাঁয়ের মধ্যে উঁচু জায়গা শিবতলার শিবমন্দির তিনটের পিছনে মহারাজার শ্বশুরবাড়ির ভিটেটা রাতদিন আমরা সবাই দেখি। মোটে দুটো মাটির ঘর আর একটা রান্নার চালা। এই বাড়িটাতে এখন হেডমাস্টার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন। মেয়ে শিবুরানী ভীষণ সুন্দরী, পাঠশালার পর হেডমাস্টারের মেয়ে হয়েও আর স্কুলে যায়নি।

সে না হয় হলো। কিন্তু মহারাজা এমন গরিব ঘরের মেয়ে কেন বিয়ে করলেন? বাবা একদিন কথায় কথায় মায়ের কাছে বলেছিলেন যে, মহারাজারা অত বড়ো জমিদার হলে কী হবে তারা হিঁদুদের মধ্যে জাতে বেশ নিচু। ওরা শুদ্দুর, জাতে তিলি। আশেপাশের গাঁ-গুলির মধ্যে যবগাঁয়ের মতো এত বড়ো তিলিদের গাঁ আর নেই। এ গাঁয়ের তিন ভাগ তিলি, এক ভাগ আগুরি আর বামুন—বাকি হচ্ছে হাড়ি বাগদি মুচি বাউরি শুঁড়ি ডোম। আর আমরা মুসলমানরা। তাহলে বিয়ে করার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে পাবে কোথা? যতই মহারাজা হোক, উঁচু-জাতের কেউ তো বিয়ের জন্যে মেয়ে দেবে না। খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত পছন্দ হলো তিলিদের খুব গরিব ঘরের মেয়ে কাশীশ্বরীকে। বাবা সাক্ষী হয়ে বলেছেন, হ্যাঁ, সুন্দরী ছিল বটে কাশীশ্বরী! ছেলেবেলায় দু-একবার দেখেছি মহারাজার অন্দরে। এ গাঁয়ে নয়। রাজা-রাজড়ারা কোনোদিন শ্বশুরবাড়িতে বৌ-ঝিদের পাঠায় না। আমি যে কাশিমবাজারে মহারানীকে দেখেছি কেন জানো? ছোটবেলায় আমার মায়ের সঙ্গে কাশীশ্বরীর সখী পাতানো হয়েছিল। গাঁয়ে এমন হতো। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মাছ দই শাড়ি মিষ্টি এই সব দিয়ে জাঁকজমক করে সখী পাতানো হতো। হিঁদু-মোসলমানেও বাধা ছিল না। শুনেছি আমার মা ছেলেবেলায় ছোটখাটো পাৎলা-সাৎলা খুব সুন্দরী ছিল। মা বলেছিল, কাশীও পুতুল দুর্গাঠাকুরের মতো ভারি সুন্দরী ছিল। সোনার মতো রঙ, টানা-টানা চোখ। বাবা মরেছিল তার খুব অল্প বয়সে। আমি যে ছেলেবেলায় রানীকে দেখেছি তার একটা কারণ রানী মায়ের সখী আর অন্য কারণ হচ্ছে মহারাজার ভাগ্নীর ছেলে ভুতো-ননুর আমি দাদা। সেই জন্যে ওদের বাবার সঙ্গে বেশ ক-বার কাশিমবাজার রাজবাড়িতে গিয়েছি আর এই চাকলার রাজ্যের তিলিদের ছেলেকে স্কুলে লেখাপড়া শেখা আর থাকা-খাওয়ার জন্যে বিরাট বোর্ডিং-বাড়িও দেখেছি। সমাজের চোখে নিচু তিলি জাতের যেখানে যত ছেলে ছোকরা মূর্খ চাষাভুষো আছে তাদের জড়ো করে বিনি-পয়সায় স্কুল-কলেজে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন মহারাজা। আমাদের গাঁয়ের গোপী নন্দী আর তারা পাল তো এমনি করেই গেরাজুয়েট হয়ে এখন করে খাচ্ছে। এই মহারাজাই সারা বাংলাদেশের তিলিদের একসঙ্গে করে দ্বাদশ তিলি বলে একটা বিরাট সম্প্রদায় গড়েছে।

কাশিমবাজারের মহারাজার মহিমা এমনি করে অনেক শুনেছি। তবে আমাদের গাঁয়ের স্কুলটার সঙ্গে কি আর কিছুর তুলনা হয়? বাপরে, কী বিরাট দালান! কতবড়ো জায়গাজুড়ে এই স্কুল? কী আশ্চর্য! স্কুলটা কিন্তু ঠিকমতো শেষ হয়নি। পুব-পশ্চিমে লম্বা বিরাট বিরাট চারটে ঘরের সারি—প্রত্যেকটাতেই দক্ষিণ আর উত্তরে একটা করে সেগুন কাঠের দরজা বিরাট। দক্ষিণ দিকে দরজার সমানই লোহার গরাদ লাগানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগুন কাঠেরই জানলা। ঘরগুলোর ছাদ যেন আকাশে, এত উঁচু! এইবার পশ্চিম দিকে ইংরেজি 'টি'-র বড়ো অক্ষরের মতো উত্তর-দক্ষিণে তিনটে ঘর হবার কথা। হয়েছে মাত্র একটা, বাকি দুটোর শুধু ইটের ভিত হয়েছে, ঘর হয়নি। তেমনি পুব দিকেও যে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা তিনটে ঘর হবার কথা, তার দক্ষিণের আর উত্তরেরটা হয়েছে, মাঝখানেরটা হয়নি। ঠিক যেন ওপরের পাটির দুটো দাঁত নেই, নিচের পাটির একটা নেই। ফোকলা। পুবদিকে ভিতটাও হয়নি। পশ্চিমের দুটো ঘরের আড়াই-হাত চওড়া ইটের ভিত—অনেকটাই উঁচু, সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে বাদাম খেতে ভারি মজা! বসে বসে পেনসিল বাড়া যায়, নস্যি নেওয়া যায়, মেলায় কেনা আট-আনার ছুরি দিয়ে কাঁচা আম ছিলে নুন দিয়ে খাওয়া চলে।

কোনো কোনো দিন বিকেলে মাস্টারমশাইরা দখল করেন, গাঁয়ের ননুকাকা, শঙ্কর সামন্ত এঁরা থাকেন। কতদিনের পুরনো ইটের ওপর নরম সবুজ মখমলের মতো কেমন একরকমের শ্যাওলা জন্মেছে। বসে থাকতে খুব আরাম। এক কোণে আছে বিরাট একটা বাসকের গাছ। তার ডাল পিঠে ভাঙলে স্কুলের ছেলেদের খুব আনন্দ। এক বাড়িতেই পটাপট সব কটা গিঁঠ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ডাল, মাস্টারের হাতে আর লাঠিই নেই। বাসকের শাদা-গোলাপি ফুলে একটু গন্ধ আর একটু মধু আছে। চুষে খাওয়া যায়। সরস্বতী পুজোয় বাসকের ফুল লাগে— দুর্গাশঙ্করবাবু সেই ফুলের নাম লেখেন দ্রোণপুষ্প। বাসকের গাছ থেকে একটু দূরে বসাই ভালো। উত্তরের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেরা পেচ্ছাব করে। ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ, পচিয়ে ফেলেছে জায়গাটা, পেচ্ছাব লাগুক না লাগুক, কতবার যে আসে—ক্লাসে বিরক্ত ধরে গেলেই 'মাস্টারমশাই পেচ্ছাব' বলে ছেলেরা বেরিয়ে আসে। গন্ধটা বাঁচিয়ে একটু দক্ষিণে এসে বসলে পশ্চিম দিকে বিশাল দিঘি ঘোলা। এমন বিচ্ছিরি নাম কে দিয়েছে কে জানে? জলের রঙ কাকের চোখের মতো টলটলে কালো। প্রায় চৌকো, পুব-পশ্চিমে একটু বেশি লম্বা। এমন দিঘি আর কোন গাঁয়ে আছে? দাম, শালুক আর পানিফলের জঙ্গল দিয়ে চারপাশ ঢাকা। সারা দিন পানকৌড়ি ডুবছে আর ভাসছে, জলপিপি লম্বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লম্বা পা নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝখানটায় কিছু নেই, সেখানে অতল কালো জল। বিকেলের সূর্যের আলো পড়ে। মনে হয় পানি নয়, তরল রুপো গলা, ছোট ছোট ঢেউয়ে দুলছে। খানিকটা দেরি করলে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লেই রুপো সোনা হতে থাকবে। দিঘির পশ্চিম পাড় ছাড়িয়ে নতুন পুকুরের নতুন মাটির পাড়ের ওপর শরবন, জলের ওপর শুয়ে পড়া জামগাছ, আকাশে মাথা তোলা অর্জুন শিরিষ গাছ। এসবের ফাঁক দিয়ে খুব উঁচু দিঘি-পুকুরের ঘাসঢাকা পাড় আর তারপর কোনাকুনি খোলা মাঠ দেখা যাবে। ঘরদুটো না হয়ে ভালোই হয়েছে ছাই! স্কুলের স্রেফ দালানটা তো চাঁছাছোলা ন্যাংটোই। দক্ষিণ দিকেও টানা বারান্দা নেই, উত্তর দিকে তো নেই-ই। মোট ঘর হবার কথা দশটা—হয়েছে সাতটা। ক্লাসের জন্যে ছ-টা, লাইব্রেরি অফিস মাস্টারমশাইদের বসা, জল তামাক খাবার জন্যে একটা।

দিঘি আর স্কুল কি একই সময়ে তৈরি হয়েছিল? ইস, কাউকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি। বাবাকেও না। তবে মহারাজা কি কাঁচা কাজ করার মানুষ? শ্বশুরবাড়ির তো ভিটেটুকু ছাড়া কিছুই নেই। কাশীশ্বরী রানীর বাবা তো আগেই মরেছিল। তারপর মা-ও কোনোদিন এ গাঁয়ে থাকেনি। খড়ো-চালের মাটির বাড়িটা ফাঁকা পড়েই ছিল নিশ্চয়ই। তাহলে একটা স্কুল করলেই তো আর চলবে না, কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে। মনে হয়, সেই জন্যেই স্কুলের সঙ্গে ঐ বিরাট দিঘি কাটা। কাশীশ্বরীদের বাড়ির পশ্চিম দিকের ফাঁকা উঁচু জায়গায় একটা তিন ঘরের চওড়া টানা বারান্দাওয়ালা শিবমন্দির করে দিয়েছিলেন। গাঁয়ের সবকিছু শিবতলায়। দুই ভাইয়ের মতো বিরাট দুটো অশত্থ গাছ উত্তর দিকে। দক্ষিণ দিকে বাঁধানো খুব বড়ো একটা ইঁদারা। তখন আর জল-টল নেই, মাটি আর ইটের টুকরো, খড়কুটো দিয়ে তলাটা ভরা। মোটা শালকাঠে মর্চে ধরা লোহার কড়াটা শুধু ছিল। শিবতলায় গাজন, শিবতলায় যাত্রা, কবির লড়াই, নাটক, কীর্তনপালা, খেলাধুলো; হ্যাজাক ডে-লাইট, কারবাইডের আলোয় 'বৃষকেতু' যাত্রা আর 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক।

মোসলমান-পাড়াতেও আমাদের এমনি একটা জায়গা ছিল 'আস্তানা'। সেখানে খুব পুরনো একটা ইটের কী যে একটা ছিল মিনার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না কি মন্দির, না পীরের কিছু জানি না। তার ভিতরের ঘরটা খুব ছোট্ট, পিদিম-টিদিম হয়তো রাখা চলে, তবে তারও উপায় নেই, সে জায়গাটুকু ইটের খোয়া ঘটিং এইসব দিয়ে ভরা। ঐখানে আমাদের মহররম, মাদারের খেলা, রায়বেঁশে নাচ, হাডুডু খেলা আর কথায় কথায় লাঠি বের করে মারামারি। মাটির মসজিদটাও খুব কাছে।

ঘোলা দিঘির উত্তর পাড়ে এক বিরাট পাকুড় গাছ। অত বড়ো গাছ আমি কোনোদিন দেখিনি। তার দক্ষিণ দিকে হাতির শুঁড়ের দশগুণ বড়ো একটা ডাল। আকাশছোঁয়া কোনো দানব যেন তার একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হাতে যেমন আঙুল থাকে তেমনি এ ডালের শেষে সরু মোটা কটা ডাল। পুব দিকেও এমনি হাত বাড়ানো মতো আরো মোটা একটা ডাল। তবে সেটা ছিল বেশ উঁচুতে আর বড়ো বড়ো ডালপালায় ভরা। দক্ষিণ দিকের ন্যাড়া ডালটা আমাদের খুব প্রিয় ছিল। ওখানে ঘোড়া-মেরে চেপে বসে ভাবো হাতিতে বসেছি, উটে চেপেছি, আরবি ঘোড়ার পিঠে উঠেছি। কাউকে বলো উপর-নিচে জোরে জোরে দোলাতে। ভয়ংকর নাগরদোলায় চাপা হয়ে যাবো। এই গাছটা আমাদের সকলের বাড়ির চেয়ে বড়ো বাড়ি। গরমকালের নিঝুম দুপুরবেলায় পাছা উঁচু-করে রাখা গরু-মোষের গাড়িতে শুয়ে সুয্যি ঢলে-পড়া বিকেল পর্যন্ত ঘুমিয়ে দু-চোখ টকটকে লাল করে বাড়ি ফেরা। এইখানে করাত দিয়ে তালকাঁড়ি চেরাই করো, পুকুরের জলে পচানো বাঁশ তুলে এনে বাঁশের বাতা বানাও, শণ পাকাও, বাতা দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করো। ঐ উত্তর পাড়েই আছে অনেক তালগাছ, কোমর-বাঁকা একটা বড়ো নিমগাছ। সবকিছুর মালিক মহারাজা, তার মানে মালিক সবাই, পুকুরের পানিফল থেকে গাছের তাল পর্যন্ত। দুপুরের দিকে প্রাণ চাইলে তালগাছে উঠতে পারে এমন কাউকে অনুনয়-বিনয় করে কচি তালশাঁস খাও। কেউ বারণ করতে আসবে না। একটা বুড়ো বোরা সাপ—সে বোধহয় বাসুকী, মরার কোনো কথা নেই—খর খর শব্দ করে আড়াআড়ি দিঘির পাড় পার হচ্ছে। পশ্চিম পাড়ে একটিও গাছ নেই, দুদিকে ঘাসে-ভরা ঢালু জমি। পশ্চিম দিকের ঢালুটায় বসলে কেউ দেখতে পাবে না। তার পরেই মহানালা, বাতাসভরা ঠাণ্ডা ঘন ছায়ার মধ্যে একমনে ঘোলার কালো জল, রুপো-জল, সোনা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলের দিকে চেয়ে কী যে শান্তি! কিন্তু বাতাস এলে একবার একবার শ শ মানুষের শুকনো বাহ্যির গন্ধ সইতেই হবে। সে-ও সয়ে যায়। শুয়ের সঙ্গে গোবরের সঙ্গে সহবাস না করে কারো উপায় নেই। দক্ষিণ পাড়টা নিচু, একটা কুচ্ছিত বেলগাছ, বুড়ো নিমগাছ দু-চারটি আছে, এত বাহ্যিতে ভরা যে হাঁটা যায় না, শুধু পুবের দিকটা পরিষ্কার করে প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। সেখানে নিমগাছ আছে কয়েকটা। একটা নিমগাছ একেবারেই ন্যাড়া। সেখানে কখনো কখনো একটা কাণ্ড হয়। আমরা মোসলমানরা তো গরু খাই তবে খাই বললেই তো জুটছে না। বছরে কয়েকবার দু-চারজন কসাইমার্কা লোক বুড়ো রোগা গাড়ি-লাঙল টানা বলদ এনে জবাই করে ভাগা দেয়। কিন্তু হিঁদুদের মাংস খাওয়াই হয় না প্রায়। ওরা গরু শুয়োর খাবে না, পাঁটি ছাগলও খাবে না। সেজন্যে বছরে-দুবছরে গাঁয়ের দুঁদে দাদারা একটা পাঁঠা কিংবা খাসি কিনে অদ্ভুতভাবে কাটে। মুণ্ডুটা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে সেটা আবার বাঁধে ঐ নিমগাছটার ডালে। তারপর একজন তার সোমনের পা দুটো মুচড়ে এমন টান টানে যে পাঁঠা বা খাসির ঘাড়টা সরু দড়ির মতো হয়ে যায়। তখন আর একজন টাঙি দিয়ে এমন একটা কোপ দেয় যে সিঁসিং করে একটা শিউরনো শব্দ শোনা যায় কী যায় না, মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে দড়িতে ঝুলতে থাকে।

পুব-পাড়টা কিন্তু স্কুল আর গাঁয়ের অংশ। বড়ো বোর্ডিংটা এখানে। তাতে তিনটে ঘর আছে। উত্তর দিকটায় আছে আরো বড়ো একটা মাটির বোর্ডিং ঘর, রান্নাঘর এইসব। হিঁদুপাড়ার ক-টা ঘাট আছে এখানে। বোর্ডিংয়ের ঘাট আছে একটা আর মোসলমানদের ব্যবহার করার জন্যে চমৎকার একটা বালির ঘাট। এই বোর্ডিংঘরের সামনে ছোট মাঠটায় পোষ-মাঘে থাকে তিন চারটে ধানের পালুই। চৌকো ঘরের মতো সাজানো।

হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে। আসলে মহারাজা স্কুলটা চালানোর জন্যে ক-বিঘে জমিও বরাদ্দ করেছেন। তাছাড়া দু-এক বছর পর পর নিগণের বাইতি-জেলেরা বেড়াজাল টেনে যে বিশাল বিশাল তিরিশ-পঁয়ত্রিশ সের ওজনের রুই-কাতলা-মিরিক মাছ ধরে, সে-ও ঐ স্কুলের জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলের এই সব সম্পত্তি-টম্পত্তি যা আছে তা কিন্তু স্কুলের কর্তারা কেউ দেখেন না। মনে হয় তাঁদের এক্তিয়ার নেই। দেখে একটি পরিবার। মহারাজার ভাগ্নীর পরিবার ননু কাকারা কিন্তু নয়। দেখাশোনা করে আর একটি পরিবার। তার কর্তা হেরম্ববাবু। ছেলে-মেয়ে বৌ বুড়ি-মা নিয়ে বেশ বড়ো বটে তাঁর পরিবার। কিন্তু কর্তা তিনি একাই। বিরাট একটা মাটির বাড়িতে বেশ বড়োলোকি চালে তিনি থাকেন। তাঁর পাঁচিলঘেরা বাড়ির একদিকে ফুলের বাগান আছে। তার অনেক গাছের নাম জানি না। একটা ঝাঁঝালো গ্রামোফোন আছে, হীরুবাবুর ফর্সা মোটা বুড়ি-মা কমলা ঝরিয়ার কাঁসার আওয়াজের মতো গলায় গাওয়া কীর্তন শুনতে খুব ভালোবাসেন। কমলা ঝরিয়ার কত রেকর্ড যে ও-বাড়িতে ছিল কে জানে! ঝাঁঝালো গ্রামোফোনে ধারালো গলায় ঐ রেকর্ডগুলো যখন বাজানো হতো তখন বাড়ির দেয়ালের এপাশে শেখেদের যে খামার ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে মোসলমান পাড়ার লোকেরা গান শুনত। পঙ্কজ মল্লিকের গলায় যে গান শুনেছিলাম তার নাম যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সেটা আমি হীরুবাবুর কাছেই প্রথম শুনেছিলাম। শহুরে আরো কত জিনিশ যে ও-বাড়িতে থাকত! হীরুবাবু ওডিকোলন রাখতেন, নানারকম মলম রাখতেন, ওষুধ রাখতেন কিছু কিছু। ঘা-ফোঁড়া বাঁধার জন্যে পুরনো শাড়ি ধুতি ধুয়ে পরিষ্কার করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ তৈরি করে রাখতেন। একবার বোলতায় কামড়ালে সাথে সাথে সেখানে ওডিকোলন দিয়ে জ্বলুনি থামিয়ে আমাকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

হীরুবাবুর মাকে অনেকবার দেখেছি বাড়ির বাইরের দিকের ছোট ঘরটায় বসে কীর্তন শুনতে, কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে আমি কোনোদিন দেখিনি। একটু ভুল হলো। তাঁকে দেখেছি, তাঁর চেহারা দেখিনি। দু-একবার বাড়ির ভিতরেও গিয়েছি, উঠোন পার হচ্ছেন হীরুবাবুর স্ত্রী—ফর্সা খালি পা, ঘোমটায় ঢাকা মুখ। একটুও দেখা যায় না। পর্দা কাকে বলে? পাশাপাশি মোসলমান পাড়ার বৌ-ঝিদের সবাইকে দেখা যেত, নেহাৎ একেবারে চকচকে হলুদ মাখা বউ না হলে। শুধু বাড়িতে নয়, দিন-দুপুরে পাড়ার পথেঘাটে, খামারে, সারকুড়ে, গোয়ালঘরে তাদের দেখা যেত। সারা গাঁয়ে মাত্রই দু-একটি পরিবার এর বাইরে। হীরুবাবুরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজাদের আত্মীয়, সেই জন্যে একটু বাড়াবাড়ি ছিল বটে, তবে তাঁর সুন্দরী মেয়েদের সবাইকে দেখা যেত। আশ্চর্য, এরাও কোনোদিন স্কুলে যায়নি। পাঠশালে গেলেও ঐ নমো নমো করে চলে আসত। ছোট মেয়েটি সবচেয়ে বেশি সুন্দরী, নাম আবার হেলেন। প্রায়ই থালা-বাসন মাজতে বা কাপড়-চোপড় ধুতে রায়েরপুকুরের ঘাটে নামত। ওকে ঘাটে দেখলেই আমার সামান্য উত্তেজনা! এই, হাতের তালু দুটো ঘেমে-ওঠা, তার বেশি কিছু নয় আর যতটা না তার চেয়ে একটু বেশি সুন্দরী মনে হওয়া। হতে পারে সে হয়তো চলনসই চেহারার ছিল। একবার তাকে তার বাবার সাথে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম, কান পর্যন্ত টানা কালো দুটো চোখ ছাড়া আর কিছুই মনে নেই।

এ গাঁয়ে মহারাজাদের যা কিছু সম্পত্তি তার সব কিছুর দায়িত্ব ননুকাকাদের পরিবারের নয় কেন, হীরুবাবুদের কেন? হীরুবাবু এতই আলাদা যে তাঁকে এ গাঁয়ের মানুষ বলেই মনে হয় না। আগে তিনি গাঁয়েই থাকতেন না, অত বড়ো বাড়ি পড়ে থাকত খালি। দুম করে সবাইকে নিয়ে একদিন গাঁয়ে এসে হাজির। দোর পরিষ্কার করে বাস করতে শুরু করলেন। ননুকাকারা তো তা নয়, একেবারে ছাপমারা যবগ্রামের মানুষ। বাবার কাছে শুনেছিলাম, ননুকাকারা মহারাজার ভাগ্নীর ছেলেমেয়ে, এটা মেয়েদের দিক। আর হেরম্ববাবু মহারাজার কোনো এক সম্পর্কের ভাইয়ের ছেলে—মানে, ছেলেদের দিক। সেই জন্যে বোধহয় হীরুবাবুর ওপরেই সব দায়িত্ব। তবে 'ঘোলা' দিঘি, বছরের ধান-ফসল ছাড়া আর কোনোকিছুর খবরদারি করতে কোনোদিন দেখিনি হীরুবাবুকে। মহারাজার কোথায় কী সম্পত্তি বোধহয় তেমন খোঁজই রাখতেন না। ওসব একদম বারোয়ারি।

ঘোলা পেরিয়ে বাঁদিকে তামিলপুকুরের পর নিগণের যে সড়ক পাওয়া গেল ঠিক সেখান থেকেই হাতের ডাইনে শুরু হলো দশ-পনেরো বিঘে পড়ো জমি। তার ঢালে গরুর ভাগাড়, ঘন বনকুলের বন; তারপর ক্রমেই চওড়া হচ্ছে এই ঘাসভরা জমি। তার মাঝে মাঝে কাঁটাগাছ, বনকুল, ধুতুরা, আকন্দের জঙ্গল। তারপর প্রথম বিরাট অশথ গাছটি। পাশে মোষের আলাদা ভাগাড়, তারপর দু নম্বর অশথ গাছটা চব্বিশ ঘণ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝম ঝম করছে। তার পাশ দিয়ে কোনাকুনি গরু-মোষের গাড়ি চলার ধুলোভরা রাস্তা আর ঠিক তারপরেই যবগ্রামের গর্ব ষাটতলার ফুটবল খেলার মাঠ। বিশাল মাঠ, দক্ষিণ দিকে একটুখানি ঢালু। এমন মাঠ আর কোন গাঁয়ে আছে? ঐ মাঠ স্কুলের, ফুটবল খেলার মাঠ, স্কুলের স্পোর্টস হলে তার মাঠ। এর পরেও আছে আর একটা ছোটদের খেলার মাঠ, আবার একটা অশথ গাছ, সবশেষে শুকনো বড়ো একটা পুকুর। স্কুলে ভর্তি হবার পর ঐ মাঠটা হয়ে গেল আমার মাঠ। বেঁচে থাকুক মহারাজা। আর বেঁচে থাকা! মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কবে মারা গেছেন! রানী কাশীশ্বরী কতদিন বেঁচে ছিলেন জানি না। তাঁদের ছেলে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র বেঁচে থাকলেও থাকতে পারেন। তিনি নাকি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে সুন্দর পুরুষের খেতাব পেয়েছিলেন। তা হবেই তো! দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েরাই তো রাজাদের রানী হয়। সুন্দরী মা পেয়ে পেয়ে একদিন রাজারাও সব সুন্দর হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

কোনোদিন চিন্তা হয়নি কবে থেকে আমাদের স্কুল শুরু হয়েছে। মনে হতো এই স্কুল তো চিরকাল আছে। গাঁয়ের সবকিছু যেমন এই রকম আছে, স্কুলও তেমনি আছে। স্কুল ছাড়া এ- গাঁয়ের কথা ভাবা যাবে নাকি? কতকাল পরে জেনেছি—পৃথিবীটা আমার কাছে বেশ সড়োগড়ো হয়ে আসার পর—স্কুল চালু হয়েছে ১৯১৬ সালে। স্কুলের সামনে এতদিনে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর একটি কাঁচা গেঁয়ো মূর্তি ছোট্ট একটা লোহার খাঁচার মধ্যে আটকানো হয়েছে, তার তলায় এক জায়গায় লেখা আছে : স্থাপিত ১৯১৬ ইং সাল।

যা কোনোদিন করি না সেদিন তাই করেছি, সকাল বেলাতেই ঘোলার নীল জলে ডুব দিয়ে এসেছি। কত কষ্ট করে হাতের নখগুলো কাটলাম, পায়ের তলার কাঁটাগুলো তুললাম, কাঁকুই দিয়ে বজ্জাত চুলগুলো একটু আঁচড়ানোর চেষ্টা করলাম। গায়ে দেওয়া হলো চামড়ার মতো মোটা ময়লা-চিটে হাফশার্টটা। কাল ক্ষারে কাচা হয়েছে। খড়খড় করছে কিন্তু বেশ মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে। রঙ নিয়ে মন খারাপ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ নেই। কী দরকার নতুনের সময় জামাটা কী রঙের ছিল তা ভাবার? হাফ-প্যান্টটাও ক্ষারে কাচা—অত সাবান কোথায়—তার রঙ নিয়েও ভাবার কিছু নেই। তবে একটু মন খারাপ হয় বৈকি—বোতাম-ওয়ালা প্যান্ট নয়, ফিতে-বাঁধা। প্রথম দিন স্কুলে আসার সময় কেউ সঙ্গে টঙ্গে আসেনি। খুব গর্ব—শহীদুল আর আমি সেজেগুজে স্কুলে যাচ্ছি কিন্তু স্কুলটা যত কাছে আসে, আমার হাত-পা ঘামতে শুরু করে। কী রকম চুপসে যাই, নিজের ধুলোভরা পা-দুটির দিকে চেয়ে থাকি, কিছুতেই আকাশের দিকে চোখ তুলতে পারি না।

স্কুলের পুব দিকের দক্ষিণ পাশের ঘরটাই ক্লাস ফাইভ। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ের দিকে চলে যাওয়া একমাত্র সড়কটার পাশে। দক্ষিণের যে জানালার গরাদ ধরে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, তার পাশ দিয়ে চট করে এসে আমি ঘরে ঢোকার দরজার সামনে দাঁড়াই। চৌকাঠ অনেকটা উঁচুতে, ঢুকতে গেলে একটা লাফ দিতে হয়। কী রকম করে ঢুকব—ঘরে ঢুকেই কি সবাইকে চেয়ে দেখব, নাকি মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? এসব ঠিক করতে করতে, কিছুই ঠিক করতে না পেরে, আমি লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকেই পড়েছি। আমাকে আর কিছু ঠিক করতে হলো না। ক্লাসের সবাই চেয়ে রয়েছে আমার দিকে, আমিও চেয়ে রয়েছি সবার দিকে। কালো কালো মাথা সারা ঘরে গিজ গিজ করছে। খুব হৈচৈ হুল্লোড় হচ্ছিল, আমি ঢুকতেই সব থেমে গেল। যে যেমন আছে ঠিক সেইভাবেই আমার দিকে চেয়ে রইল। ঠিক যেন একটা আজব জন্তু দেখছে।

তারা দেখছে আমাকে, আমি দেখছি সবাইকে। ওদের কালো কালো চোখগুলো চক চক করছে, কেউ কেউ হাঁ করে আছে একটু, যার হাসিমুখ তার মুখে হাসিটা মাখানোই রয়েছে। প্রথমেই মনে হলো, এরা তো সব আমারই মতো, ধুলোভরা খালি পা, পরনে সেই হাফ-প্যান্ট আর হাফশার্ট। যারা অন্য অন্য গাঁ থেকে এসেছে, তারা প্রায় সবাই চান করে এসেছে। চুল থেকে কপালে গালে সরষের তেল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। গাঁয়ের ছেলেরা একটু বেশি ময়লা জামা-প্যান্ট পরা। একজন মাত্র বাউরিদের ছেলে আছে। ওকে আমি চিনি, সে শুধু একটা গেঞ্জি পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে ছিল, তারপর থেকে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। আমরা যখন স্কুল ফাইনাল পাস করি, তখনো সে এইট না নাইনে পড়ছিল। কতদিন সে স্কুলে ছিল জানি না তবে স্কুল ফাইনাল পাস সে আর করেনি তা জানি। সব ক্লাসেই মাস্টারমশাইদের মার খাওয়ার জন্যে একজন দুজন বাঁধা ছাত্র থাকতে হয়। চুপ করে গাদা গাদা মার খাওয়া সহজ কাজ নয়। সহ্য করতে শিখতে হয় কিংবা শিখতে হয় না, কেউ কেউ এমনিই পারে।

আমার দিকে অবাক চেয়ে থাকা ওদের আর শেষ হতে চায় না। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে একটা বেঞ্চির খালি জায়গায় একজনের পাশে বসে পড়ি। তখুনি বাংলার মাস্টারমশাই ঘরে ঢুকলেন। শিবরাম চৌধুরী, ক্ষীরগ্রামের মানুষ। পাশের ছেলেটি হঠাৎ বলল আমাকে, শিবরামবাবু, আমাদের বাংলার মাস্টার।

'বাণী বিতান', আমাদের বাংলা-বই, পুরনো কিনেছি একটা—হাই বেঞ্চে অন্য সব বই রেখে দিয়েছি। এই মাস্টারমশাইকে অনেকবার দেখেছি বটে। ঠিক দশটার সময় ছাতা মাথায় বামুনগাঁয়ের মাঠ পেরিয়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছেন কিন্তু সে কি আর তেমন করে দেখা হয়েছে? এখন দেখলাম টেবিলে একটা হাত দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। খুব ট্যারা বড়ো বড়ো চোখ, টকটকে লাল, চোখের কোণে যেন রক্ত জমে রয়েছে, মণিদুটো দু-চোখের এমন জায়গায় চলে যায় যে কোনদিকে চেয়ে আছেন কিছুতেই বোঝা যায় না। পরীক্ষার সময় টোকাটুকির কাগজ ধরতে ওস্তাদ তিনি। সিক্স থেকে সেভেনে ওঠার পরীক্ষা দিতে এসে আমার পাশের পলাশির ছেলেটাকে দেখেছিলাম একটা হাতে লেখা কাগজ থেকে নিজের খাতায় টুকে নিচ্ছে। ছোট্ট একটুকরো কাগজ— শিবরামবাবু একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন বাসক-গাছটার দিকে—সে তো একেবারে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে, আমরা বসেছি পুব-দক্ষিণ কোণে—হঠাৎ শিবরামবাবু এসে ছোঁ মেরে টোকার কাগজটা তুলে নিলেন। রক্তমাখা লাল চোখে চেয়ে রইলেন ছেলেটার দিকে। তার খাতাটা কেড়ে নিলেন, তারপর হাত দিয়ে মুঠো করে ধরলেন ওর কব্জি। আয়, টেনে নিয়ে চললেন তাকে, ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া কেষ্ট খপ করে সোজা পায়ে পড়ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবরামবাবুর, আর করব না মাস্টারমশাই, এই কান মলছি, মা কালীর দিব্যি, আর কোনোদিন এমন করব না। শিবরামবাবু ওকে টানতে টানতে টেবিলের কাছে নিয়ে গেলেন, আর একবার দিব্যি গাললে তোকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেব। আবার রক্তমাখা চোখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন কেষ্টর দিকে। আরে, রক্ত পড়ছে নাকি সে চোখ থেকে? যা সিটে যা—ফের যদি—

আর কখনো হবে না মাস্টারমশাই—

যদি কখনো দেখতাম পরীক্ষার ঘরে শান্তিরামবাবু ঢুকে শিবরামবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে শুরু করেছেন, টেনে নিয়ে গেছেন তাঁকে দরজার কাছে, তাহলে আমাদের কী সুখ যে হতো তা বলার নয়। এদিকে কিন্তু শান্তিরামবাবু এই স্কুলের সবচেয়ে মারকুটে মাস্টার। ছেলেদের গো-পেটানি দেবার জন্যে তাঁর হাত নিশপিশ করত। বেছে বেছে সবচেয়ে নিরীহ আর বোকা ছেলেগুলোকে তিনি পড়া জিজ্ঞেস করতেন, উত্তর দিতে না পারলে কী যে আনন্দ তাঁর, ঠেঙিয়ে হাতের সুখ করে নিতেন। বেত আনতে বললে কেউ যদি বাসকের ডাল নিয়ে আসত, তখন তার পিঠেই বাসকের ডাল ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন। অ্যাঃ, বাসকের ডাল আনা হয়েছে! যা, অফিস থেকে বেত নিয়ে আয়। আর তুই দাঁড়িয়ে থাক—মারের অপেক্ষায় থাকা ছেলেটাকে বলতেন তিনি। বেত বেত খুব বললেও আমাদের স্কুলে বেত ছিল না, মোটা মোটা কঞ্চি থাকত অফিসের দেয়ালে ঠেসানো। কঞ্চির গিঁটগুলোও ভালো করে চাঁছা নয়। মাথায় পিঠে গর্ত হয়ে যেত সেই কঞ্চি পিঠে মাথায় পড়লে। মাস্টারমশাই মেয়েমানুষ হলে তাঁকে নিশ্চয়ই চামুণ্ডা বলে ডাকত লোক—তা যখন নয়, মারকুটে শান্তিরাম মাস্টার বলেই ডাকা হতো তাঁকে। অনেক সময় বেত-টেত কিছুরই দরকার হতো না। যার কপাল খারাপ টেবিলের তলায় তার মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন মাস্টারমশাই। সময় কাটছে, না যুগ কাটছে, কখন কখন, পিঠটা শির শির করত—আচমকা দুম করে একটা কিল। সরু সরু হাতে কী জোর রে বাবা! ভুরুর মাঝখানের কোঁচকানো ত্রিশূলটার দিকে তাকানো যায় না তখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শান্তিরামবাবুকে বাইরের যে দেখবে সে-ই বলবে বড়ো শান্তশিষ্ট মানুষ তিনি। ছিপছিপে বেতের মতো হালকা দেহখানা, খুব সুন্দর দেখতে। গলাটা অবশ্য বেশ কড়া। কথা তাঁর খুবই কম। শুধু চোখের চাউনিতে কী যেন আছে, মনে হয় দয়ামায়া নেই একটুও তাঁর শরীরে। কখনো কখনো ক্লাসে অঙ্ক-টঙ্ক কষতে দিয়ে তিনি বেরিয়ে যান ঘর থেকে। আমি ক্লাস থেকেই দেখছি শান্তিরামবাবু ক্লাস সেভেন থেকে ডেকে নিলেন শিবরাম মাস্টারমশাইকে। তারপর দুজন মিলে বেশ হাসাহাসি। ছাত্রদের সামনে এরকম টানাটানি করায় শিবরামবাবু লাজুক হাসছেন, আহা কী করেন—হেডমাস্টার অফিসে আছেন, ছাত্ররা সব দেখছে। আরে কী হবে তাতে? সরু বাঁদুরে হাতে শান্তিরাম মাস্টার দুম করে একটা কিল বসালেন শিবরামবাবুর পিঠে, শোনো, একটা কাজ করে দাও দিকিনি—গাঁয়ের অধীর কুণ্ডু আমার দু-বিঘে জমি জবরদখল করে আছে ক-বছর থেকে। তোমাদের গাঁয়ের তেঁতুলে বাগদিদের পাড়ায় দু-তিনজন ভালো লেঠেল আছে। টাকা যা লাগে আমি দোব, ধনা আর ধনার ছেলে হরিধন আর দু-একটা লেঠেল আমাকে জোগাড় করে দাও—ফাটুক দু-একটা মাথা।

এসব কথা একদিন শুনতে পেয়েছিলাম। যতই স্কুলের মাস্টারমশাই হোক না, জমিই এখানে সব। ভালোমানুষ স্কুল-মাস্টারদের পর্যন্ত এখানে ছোটখাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে হয়। যাই হোক, শান্তিরামবাবু এখনো আমাদের পড়ান না, তাঁকে পাব সেভেন আর এইটে। ঐ দুটো ক্লাসেই। তারপরে আর নয়। তখন শুরু হবে ছোট লাইন থেকে বড়ো লাইনের ট্রেনে চড়া। সেখানে পাব হেডমাস্টার মশাইকে। ক্লাস সেভেনে দুর্গাশঙ্করবাবু, গোপী পাঁজা মশাই, কালীকিংকর বাবুকে। এখন আমাদের বেশ চলছে শিবরামবাবু, প্রাণকৃষ্ণ বাবু আর সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইকে দিয়ে। মুসলমান ছাত্র প্রায় নেই, ধারসোনার দু-একজন, গোবর্ধনপুরের মিয়েবাড়ির দু-তিনজন আর আমাদের গাঁয়ের আমরা দুই ভাই। এই কজনের জন্যে মৌলভী আর কেন? কেউ গা করেনি। আমরা দু-ভাই ঠিক করলাম আরবি পড়ব, সংস্কৃতটা আর পড়ব না। বাবারও বোধহয় তেমনি ইচ্ছে। ইচ্ছেটাকে কাজে খাটিয়ে কোথা থেকে একজন মৌলভীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোগাড় করে আনলেন তিনি। সারা স্কুলে মাত্র দুজন ছাত্রের জন্য একজন ছোকরা মৌলভীকে লাগানো হলো। কায়দা বই কেনা হয়েছে দু-ভাইয়ের জন্যেই—আলেফ বে তে সে রপ্ত করা চেষ্টা করছি। পণ্ডিত মশাইয়ের ক্লাসে যেতে হয় না, যাই মৌলভী মাস্টারের ক্লাসে। গাঁট্টাগোট্টা কালো রঙের মৌলভী। গোঁপ চাঁছা—কালো চাপ দাড়ি। বয়স একদম কম।

মোটে দুটো না তিনটে ক্লাস হয়েছে। সেদিন মনে হয় তিন নম্বর ক্লাস। মৌলভীমাস্টার ক্লাসে এসে চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসলেন, বসেই থাকলেন। অতো বড়ো ক্লাসঘরে দুজন মাত্র ছাত্র। আলেফ বে তে সে তখনো ভালো করে চিনি না। চুপচাপ বসে আছি, বেলা এগারোটার রোদে গাঁ ঝিমোচ্ছে। এই সময়টায় খুব ঝিমুনি আসে। গাঁয়ের গরু সব মাঠে চলে গিয়েছে। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে, জনপ্রাণী নেই পথে, নন্দীদের বৈঠকখানায় ধনঞ্জয় কাকা আর যতীন কাকা গলায় ধুতির খুঁট জড়িয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছেন। আমরা দু-ভাই বসেই আছি, বসেই আছি। মৌলভী মাস্টার দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ কী যে হলো, তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর এগিয়ে এসে আমাদের দুজনের সামনে এসে একটু সময় চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে, তারপর দুই হাতে শহীদুলের দুই কান শক্ত করে ধরে একেবারে পুরো এক পাক ঘুরিয়ে মলে দিলেন, তারপর চড়াৎ করে একটা চড় বসালেন ওর বাঁ-গালে আর একটা ডান গালে। আমরা দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম মৌলভীর দিকে। চড় দুটোর শব্দ যেন কানে তালা ধরিয়ে দিল। কতক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি জানি না, চোখ ফিরিয়ে যখন শহীদুলের দিকে চেয়েছি, দেখি তার দুই কান দুই গাল আগুনের মতো টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে। গলার কাছটাও ক্রমে ক্রমে লাল হচ্ছে গিরগিটির মতো। শহীদুল খুব ফর্সা, তার নামই তো কটা, রাগলেই কান গাল গলা লাল হয়ে ওঠে।

দমকা হাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম দুই ভাই। স্কুলের কারুর কাছে নয়, একছুটে বাড়ি। হাঁফাতে হাঁফাতেই উঠোনে দাঁড়িয়ে তড়পাতে লাগল শহীদুল, আমরা গাঁয়ের ছেলেরা যেমন করে গাল দিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খরাপ খারাপ, ঠিক তেমনি করেই শহীদুল চ্যাঁচাচ্ছে, শালা খচ্চর মৌলভী, শালা খচ্চর পাঁঠা কোথাকার, রাস্তায় তোমাকে দেখতে পেলে ইট মেরে তোমার ঠ্যাং যদি না আমি ভাঙি, তাইলে আমার নাম লয়। এখুনি পণ্ডিত চাচাকে যেয়ে সব বলব, কান ধরে শালাকে যদি না তাড়ায় তো কী বলেছি।

তারপর কবে আবার স্কুলে গেলাম মনে নেই। গিয়ে দেখি মৌলভী মাস্টার স্কুলে নেই। কী করে কী হলো জানি না, তবে আর কোনোদিন তাঁকে গাঁয়ে দেখিনি। ব্যস, হয়ে গেল আমাদের আরবি পড়া। সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইয়ের কাছেই যেতে হলো। তিনি পাশের গাঁ কুরুম্ব থেকে একটা লাল রঙের মাদি ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে আসতেন। পেট মোটা ছোট ঘোড়া, তার পিঠে জিন-টিন কিছু থাকত না। একটা সাদা কাপড় পিঠে পেতে খাটো ধুতি আর ফতুয়া পরা পণ্ডিতমশাই আসতেন গাঁয়ের মাঠ পেরিয়ে কাঁচা সড়ক ধরে। স্কুলের বোর্ডিংয়ের সামনের নিচু জায়গাটায় ঘুড়ীটাকে বেঁধে রাখা হতো বিকেল পর্যন্ত। নামেই বেঁধে রাখা, ছেড়ে দিলে পেটমোটা বুড়ি ঘুড়ীটা যাবেই বা কোথায়? বেচারার সামনের দু-পায়ে একটা ছাঁদনা-দড়ি বাঁধা থাকত, যে ঘাস ঐ নিচু জায়গাটায় হতো তাতে খুব অরুচি তার, খাবার মতো ঘাস এদিকে-ওদিকে যেটুকু জন্মাত সেটুকুই সে খাবার চেষ্টা করত বাঁধা পা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে পণ্ডিতমশাই হাঁজোর-পাঁজোর করে কোনোরকমে তার পিঠে উঠতেন। যেতে বললেই সে যেত, থামতে বললেই থামত কিন্তু পণ্ডিতমশাইকে কখনোই পাকা চড়নদার মনে হতো না। আমরা ক্লাস সেভেনে ওঠার পরেই দেখলাম ঘোড়াটাকে তিনি বেচে দিয়েছেন বা বিদায় করেছেন, পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসেছেন আমাদের গাঁয়েই বাস করবেন বলে।

ততদিনে শৈলজা হেডমাস্টার বিদায় নিয়েছেন স্কুল থেকে। তাঁকে বিদায় করে দেওয়া হলো, না তিনি নিজে বিদায় নিলেন তা অবশ্য জানি না। ঘন ঘন হেডমাস্টার বদলানো কিংবা তাড়ানো আমাদের গাঁয়ের ভদ্রজনদের একটা অভ্যাসই ছিল মনে হয়। মহারানী কাশীশ্বরীর বাবার ভিটেয় যে মাটির বাড়িটা ছিল সেটাতেই থাকতেন শৈলজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্টারমশাই। সেটা খালি হলো আর সেটাতেই পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করতে শুরু করলেন সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই। তাঁর পরিবারের কাউকেই কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না—ছিল তো অনেকেই নিশ্চয়ই—আমরা চিনতাম, শুধু চিনতাম নয়, হাড়ে হাড়ে চিনতাম তাঁর ছেলে শ্রীকুমারকে। আমাদের সকলের প্রিয় শ্রীকুমারদাকে। আমাদের এক ক্লাস ওপরে পড়তেন, সেজন্যেই শ্রীকুমারদা। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনিই চতুর। চব্বিশ ঘণ্টা মজা করছেন, শ্লোক বলছেন, শ্লোক তৈরি করছেন। সেই বয়সেই বাবার বিদ্যের পুরো মালিক হয়ে গেছেন। চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোক ঠোঁটস্থ, ইচ্ছেমতো রামায়ণ-মহাভারত থেকে বুলি ঝাড়ছেন। দারুণ বলিয়ে-কইয়ে আমাদের শ্রীকুমারদা। এদিকে ছেলে এই রকম, অন্যদিকে তাঁর বাবা আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতমশাই তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এমন নিরীহ ভালোমানুষ আমি আর খুব দেখেছি বলে মনে করতে পারি না। আজও মনে পড়ে কী অস্বস্তি নিয়েই না তিনি ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতেন।

তখন দেখতাম গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোড়া বেশ চলত। বনেদি বংশে ঘোড়া থাকবেই, বিশেষ করে মোসলমান বনেদি বাড়িতে ঘোড়া, পালকি, বন্দুক, চমৎকার টপ্পর আছেই। আমি আমাদের বাড়ির বনেদিয়ানা-টনিদিয়ানা তেমন কিছু দেখিনি। কেবল শুনেছি সব কিছু বেচে ফতুর হয়েছিলেন আমার দাদা। সে বুড়োকে আমার দেখার কথাই ওঠে না, আমি নিজে আমার বাবার বায়ান্ন বছরের অযোগের ভূত। বাবা আবার তাঁর মাঝবয়েস পর্যন্ত বহুত লড়াই করে সম্পত্তি-টম্পত্তি ভালোই করেছিলেন। পুরুষ মানুষদের সবাইকে নাকি একটু-আধটু বাপের মতো হতেই হয়, সেপাইয়ের ঘোড়ার মতো। কাজেই বাবার শোবার ঘরের কোণে একনলা বন্দুকটা লাঠির মতো ঠেসানো থাকত, পালকিটা দলিজের অনেকটা জায়গাজুড়ে রোদে শুকাতো, জলে ভিজত। তার রঙটা জ্বলে গেল, ভিতরের বেতের ছাউনি যেখানে সেখানে খসে পড়ল, বড়ো বড়ো ডাণ্ডা দুটি নড়বড়ে হয়ে গেল। বেশ ছোটবেলায় একটা টগবগে আরবি ঘোড়া (আরবি না ফারসি জানি না, তখনকার দিনে ভালো ঘোড়া মানেই আরবি ঘোড়া) আমি দেখেছিলাম। নতুন জিন কেনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল, তার খসখস শব্দ আর নতুন চামড়ার দারুণ গন্ধ আজও যেন চেষ্টা করলেই টের পাই। কতক্ষণ ধরে কত যত্ন করে ঘোড়াকে জিন পরানো হতো, লোহার লাগাম কটর-মটর করে কামড়াত সে, বাবা লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাগাম হাতে নিতেন। তারপর কবে সে বিদায় হলো, এল একটা মাদি লাল ঘোড়া, তাকে নিয়ে হতচ্ছেদ্দা। মাহিন্দার জমিরউদ্দিন ভাইয়ের মনে নেহাৎ দয়া ছিল খানিকটা, তাই ঘাস কেটে আনা, ছোট ছোট করে খড়ের ছানি কাটা, ছোলা ভিজিয়ে রেখে সেই ছোলা ছোট করে কাটা ছানির সঙ্গে ভাতের মাড়ের মধ্যে দিয়ে খাওয়ানো—এই সব করত। একদিন কি দয়া যে তার হলো সে আমাকে সাপটে ধরে তুলে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। নাঃ, একটুও আরামের নয়, হটর হটর করে হাঁটছে সে, তার খালি পিঠের হাড় উঠছে নামছে, কিছুতেই বসে থাকতে পারছি না আমি। দরকার নেই বাবা আমার পেয়ালা রঙের মাদি ঘোড়াটায় চড়া! যাই হোক, এটা যে কবে বিদায় হলো ঠিক মনে নেই।

তবে ঘোড়া ছিল আমার এক শ্বশুর। তিনি চুলে জবাকুসুম তেল মাখতেন, মুখে ঘষতেন হ্যাজলিন স্নো, কিমাম দিয়ে পান খেতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর একটা জোরালো আলো লাগানো র‍্যালে সাইকেল ছিল আর ঐ নিমফুল রঙের সুন্দর মদ্দা ঘোড়াটা। চলনসই ঘোড়া থাকত গাঁয়ের ডাক্তারদের, এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে চলাফেরা করবেন কী করে? পথ-ঘাট তো বিশেষ নেই! পুইনির হরপ্রসাদ ডাক্তারের ছিল এমনিই একটি ঘোড়া। তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। নবগ্রামের এলএমএফ ডাক্তার চণ্ডীবাবুরও ছিল ঘোড়া।

একবার কার একটা মদ্দা ঘোড়া—বোধহয় গিধগাঁয়ের গুরুপদ ডাক্তারের—কী করে ছাড়া পেয়ে সারা গাঁয়ের রাস্তা ধরে বাতাসের বেগে ছুটতে শুরু করে। গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ছিলাম ছুটির দিনে স্কুলের মাঠে। ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে, পিছনে শাদা ধুলো। দৌড়ুচ্ছে সে, কেউ তাকে আটকানোর চেষ্টাও করছে না। সারা গাঁ ঘুরে এসে স্কুলের সামনে এসে একবার হিঁ হিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল, তারপর আবার দৌড়, আবার সারা গাঁ ঘুরে এসে স্কুলের সামনে হিঁ হিঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিঁ আওয়াজ। কী মজা যে পাচ্ছে সেই-ই জানে। তিন বার এই রকম করে তবে সে থামল। গাঁয়ের সবচেয়ে গম্ভীর মানুষটা, সঞ্জয় হাজরা, বলল, কই, গাঁয়ে তো কোনো মাদি ঘোড়া আসেনি!

এত কথা পণ্ডিতমশাইয়ের পেটমোটা ঘুড়ীটার কথা বলতে গিয়ে। খানিকটা ঘোড়া-কথা আর কী? এখন বরং পণ্ডিতমশাইয়ের কথায় ফিরে যাই। এখন আর ঠিক মনে পড়ছে না, আরবি শেখানো ঐ মাথাপাগলা মৌলভী তো ক্লাস ফাইভেই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, সংস্কৃতও কি ঐ ক্লাসেই পড়তে শুরু করেছিলাম? মনে হয় না। সংস্কৃত পড়া শুরু হলো বোধ হয় ক্লাস সেভেন থেকে। তাহলে ফাইভ-সিক্সে পণ্ডিতমশাই নিশ্চয়ই অন্য কিছু পড়াতেন আমাদের। এখন আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল, পণ্ডিতমশাই বললে স্কুলে একমাত্র সংস্কৃতের মাস্টার মশাইকেই বোঝাতো, আর কাউকে নয়। আর সবাইকেই একটা বাবু যোগ করে নাম ধরেই ডাকা হতো—যেমন শিবরামবাবু, শান্তিরামবাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু, দুর্গাশঙ্করবাবু, গোপীবাবু, কালীকিংকরবাবু। তবে সাধারণভাবে সবাই মাস্টারমশাই তো বটেই! পণ্ডিতমশাই ক্লাস ফাইভ বা সিক্সে আমাদের কিছু পড়ান বা না পড়ান, এই সময়কার একটা কথা মনে পড়ে। শ্রুতিলিখন-টিখন কিছু একটা লিখতে দিয়ে তাঁর কাছে খাতা জমা দিলে তিনি সেগুলো দেখে ঠিক করে দিতেন। সংশোধন করার জন্যে দরকার হলে ছেলেদের কারো কাছে কাঠ-পেনসিল চাইতেন। একদিন এই রকম পেনসিল চাইলে আমি আমার পেনসিলটা এগিয়ে দিলাম, তিনি কী রকম নাক কুঁচকে উঁহু-উঁহু-উঁহু করে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন না, না, তোর পেনসিল নয়, তোর পেনসিল নয়। আমি দেখেছি তুই পেনসিলের শিষে জিভে লাগাস। তিনি আমার পেনসিল তো নিলেনই না, তাঁর মুখে ফুটে উঠল কেমন একটা ঘৃণা। সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল, আমি মোসলমান, আলাদা জাত, হয়তো বা নিচু জাত। বয়েস কম তো, বেশ কষ্ট হয়েছিল। এর অনেক দিন পরে অবশ্য—আমাদের ভিতরে আলো দেবার জন্যে যে সূর্যের মতো কিছু একটা থাকে, তার সকাল দুপুর রাত হয়, জ্বলে নেভে, সেটার আলো যখন বেড়েছিল—তখন বুঝতে পেরেছিলাম, মানুষ কত কী যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব উল্টো-সিধে পুরে রাখতে পারে নিজের মধ্যে! কত কাজ করে, অভ্যেসে অভ্যেসে করে যায়।

সংস্কৃতের কথাটা মোটামুটি এইবেলা সেরে রাখি। অক্ষরগুলো—পরে জেনেছি সংস্কৃত অক্ষরের নামে দেবনাগরী—মোটামুটি আমাদের বাংলা অক্ষরের সঙ্গে মেলে, 'এ'-কার 'ও'-কার হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ই আলাদা হলেও চেনা যায়। তবে সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে যুক্তাক্ষরগুলো আর সে যুক্তাক্ষর যে কত তার সীমাসংখ্যা নেই। সব অক্ষর চেনার লড়াই শেষ করতে পারা গেল না, ধৈর্যে কুলোল না আর কিছুদিন পরে এমন ফাঁকি দেওয়া শিখে গেলাম যে পণ্ডিতমশাই আমার ফাঁকির কিছুই ধরতে পারলেন না। ফলে তিনি ধরেই নিলেন যে সংস্কৃতে আমার মতো দিগগজ তাঁর ক্লাসে আর একজনও নেই। আসল কারণটা বলি। আমি বেশ পরিষ্কার উচ্চারণে, কোনোরকম তোতলামি না করে, আঁ, উঁ, ইয়ে, অ্যাঁ, অ্যাঁ এসব আওয়াজ না করে গড় গড় করে দিব্যি ইংরিজি বাংলা গদ্য পদ্য রিডিং পড়তে পারতাম। সেটা সংস্কৃতের বেলাতে পারতাম না। বিদ্যাসাগর একটা উৎকট বই লিখেছিলেন উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী আর একটা বই ছিল ইংরিজি নামে, Help to the Study of Sanskrit ইংরিজির কোনো ব্যাপার নয়, ওটা সংস্কৃত ব্যাকরণের বাবা না হলেও বড়োদাদা। এই বইগুলিতে হাজার রেললাইন পাতা, সব খাঁটি লোহার রেল, এই সব রেললাইনের ওপর দিয়ে সংস্কৃত ভাষা চলাচল করে, এতটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। আমি ঐ পথই মাড়াইনি। সংস্কৃত পাঠ্য বইটার সঙ্গে একটা করে বাংলা নোটবই থাকত। তাতে খাঁটি সংস্কৃত হরফের সংস্কৃত গদ্য-পদ্য লেখা থাকত বাংলা হরফে। ঠিক তার তলায় থাকত বাংলা অর্থ, তারপর সংস্কৃত শব্দগুলোর বাংলা অর্থ আর সব শেষে এক-আধটু ব্যাকরণের বিষয়। আমি প্রত্যেক দিন বিকেলবেলায় নিজের হাতে হারিকেনটা মুছে-টুছে তেল দিয়ে রাখতাম। তারপর চলে যেতাম আমাদের ষাটতলার মাঠে ফুটবল খেলতে। ফুটবল খেলার কথাটা আমি আলাদা করে বলব—এখন নয়। সন্ধেয় বাড়িতে ফিরে হারিকেনটা জ্বালিয়ে আমাদের মাটির দোতলায় আমার একলা ঘরে পড়তে বসতাম। বাংলা হরফের সংস্কৃতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠ্য অংশের সঙ্গে এমন মিলিয়ে সড়োগড়ো করে নিতাম যে শুনলে মনে হতো ছেলেটা বাংলার মতো ঝরঝর করে সংস্কৃত পড়তে পারে। এরপরেই শব্দ ধরে ধরে প্রত্যেকটি সংস্কৃত শব্দের মানে আর সমাস-সন্ধি জেনে নেওয়া। ব্যস, সংস্কৃত বইটা গুটিয়ে নিয়ে একই কায়দায় ইংরিজি। অবশ্য ইংরিজিটায় অতটা ফাঁকি ছিল না। ওখানে ফাঁকিটা থাকত জটিল গ্রামারের বেলায়। এর পরে বাংলা তো হাতের মোয়া। সবশেষ অঙ্কটাতে হাত দিয়ে দরকার নেই—জানা কথা হবে-টবে না, সকালে বরং মদনের খাতা থেকে টুকে নিয়ে গেলেই হবে।

পণ্ডিতমশাই আমার ওপর খুশি। সবচেয়ে ভালো পড়াটা ঐ ছেলেটাই পড়লে—গড় গড় করে মানে বলে দিলে। এখন 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু'—অস্তির মানে 'আছে' না 'ছিল' তা কি জানে না? ধাতুরূপ, শব্দরূপ, কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়, লঙ, লৃট সন্ধি-সমাস এসব তুচ্ছ জিনিশগুলো কি এই ছেলেটা জানে না? রিডিং আর মানে বলার পর প্রত্যেক দিনই যদি বাহ্যি করতে যায় তো যাক না। এই করে প্রত্যেক ক্লাসেই পঁচাত্তর আশি করে সংস্কৃতে নম্বর পেতে পেতে স্কুল ফাইনালেও বোধহয় ঐরকমই নম্বর পেয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাকরণ অংশ থাকত বেশ কম। কী আশ্চর্য, সংস্কৃতে আমি আস্ত একটা উজবুক থেকে গিয়ে আজও আমাদের স্কুলের সবচেয়ে সেরা সংস্কৃত-জানা ছাত্রদের একজন।

পণ্ডিতমশাই আমাকে যে কতটা ভালোবাসতেন তা বোঝানো সত্যিই শক্ত। সেই একটা আলোর কথা বলছিলাম, তার জোরেই আমি নিশ্চিত জেনে গিয়েছিলাম, সংস্কার আর ঘৃণা মোটেই এক জিনিশ নয়, সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ হলেও গভীর ভালোবাসা প্রায়ই সম্ভব। ভালোবাসার মধ্যে কেমন একগুঁয়ে ব্যাপার আছে, সেটা মোটেই কোনো কথা শোনে না।

এবার একটা মিষ্টি লুকোচুরির কথা বলি। পণ্ডিতমশাই একটুও ইংরেজি জানতেন না। ক্লাসে হেডমাস্টারের নোটিশ আসত ইংরেজিতে। পণ্ডিতমশাই প্রত্যেক দিন ক্লাসে ঢোকার আগেই অফিসঘর থেকে শুনে আসতেন আজ কখন কখন কী নোটিশ আসবে। সেদিন শুনে এসেছিলেন কী একটা কারণে সেদিন থার্ড পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেকেন্ড পিরিয়ডে পণ্ডিতমশাইয়ের ক্লাসে স্কুলের বেয়ারা দিনেশ এসে ঢুকল একটা নোটিশ হাতে। দিনেশকে দেখে পণ্ডিতমশাই তার দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে চোখের একটা ইশারা করেই বললেন, দাও, দেখি কিসের নোটিশ। তারপর নোটিশটা হাতে নিয়ে একবার তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, থার্ড পিরিয়ডের পর থেকে স্কুলের ছুটি— বলে তিনি নোটিশটার তলায় সই করতে যাবেন এই সময় দিনেশ বলল, না, না, পণ্ডিতমশাই, এটা সে নোটিশ নয়। সামনের বুধবারের মধ্যে স্কুলের এ মাসের মাইনে না দিলে জরিমানা হবে দিনে এক আনা করে। ও নোটিশটা আর একটু পরে আসছে।

পণ্ডিতমশাইয়ের মুখটা কালিবর্ণ হয়ে গেল। আমি আর তাঁর দিকে তাকাতে পারছি না। এই ঘটনাটার কথা মনে পড়লে পরে আমার খুব কষ্ট হতো, কিন্তু তখন তো আমাদের দুষ্টুবুদ্ধির কাল! আমার সাহস গেল বেড়ে। বোধহয় ক্লাস নাইনে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' আমাদের পাঠ্য ছিল। তার একটা জায়গায় খানিকটা ইংরেজি উদ্ধৃতি ছিল—আমি তো তখন সংস্কৃতেও মহাপণ্ডিত, ইংরেজিতেও মহা-বাহাদুর। শুধু ঐ ঝর ঝর করে পড়তে পারতাম বলে। পণ্ডিতমশাই আমাকেই ঐ জায়গাটা পড়তে বললেন। পড়তে গিয়ে আমি দেখি কঠিন কাজ : প্রথমেই যে শব্দটা আছে তার উচ্চারণ 'চান্ডা'; না 'কান্ডা' হবে ঠিক করতে পারলাম না। আসলে শুরুটা ছিল এইরকম : In Canada... কানাডা দেশটার নাম তখনো জানি না, কাজেই আগাগোড়া 'চান্ডা' কিংবা 'কান্ডা' চালিয়ে গেলাম—আর সবটা কীভাবে পড়েছিলাম, সে কথা বলার মতো মানুষ আজ আর কেউ নেই। তবে পণ্ডিতমশাই আগাগোড়া প্রসন্ন মনে সবটাই শুনে গেলেন।

আমি ঠিক বুঝতে পারি না মুসলমান বলে যে ছেলেটির পেনসিল হাতে নিতে তাঁর ঘৃণা হয়েছিল, তাকেই তিনি এত ভালোবাসেন কেন। অথচ ছেলেটা তাঁকে বরাবর ঠকিয়ে এসেছে। আমার মুখ থেকে মুখস্থ বিদ্যার জোরে আয়ত্ত করা চাণক্যের শ্লোক কিংবা গীতার কিছু কিছু অংশ খুব শুনতে চাইতেন। বারে বারে শুনতে চাইতেন রামায়ণের যে অংশে বর্ষাঋতুর বর্ণনা আছে সেই অংশটা : স তথা বালীনং হত্যা সুগ্রীব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিষিচ্য চ, বসন মাল্যবান পৃষ্ঠে রাম লক্ষ্মণম অব্রবীৎ। অয়ং স কাল সমাগত, সময় অদ্য জলাগম...তারপরেই সেই অংশটা : বিদ্যুৎপতাকা সবলাকমালা...। সারা জীবনে তাঁর জন্যে কী জুটেছিল? মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মধুময় পার্থিব রজ? কী করে বলব?

শৈলজাবাবু আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। খুব ফরসা, মাথাভরা টাক, তাঁকে কোনোদিন কোনো ক্লাসে যেতে দেখিনি। দেখবই বা কী করে? আমি স্কুলে ভর্তি হবার পরে পরেই তিনি স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। রানীর ভিটের মাটির বাড়িটাতে তিনি থাকতেন ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে। তিনি চলে যাবার পরেই এখানে থাকতে শুরু করেন সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই। গাঁগুলোতে শুধু সরল-সিধে মানুষরা থাকে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। দলাদলিতে ভরা সব গাঁ-ই। আমাদের গাঁয়েও দলাদলি কম নয়। দলাদলির একটা জায়গা স্কুল, আর একটা জায়গা ইউনিয়ন বোর্ড। স্কুলে ঠিক কী যে ঘটেছিল জানি না—একদিন শোনা গেল শৈলজা মাস্টার চাকরি ছেড়ে গরুর গাড়িতে জিনিশপত্র নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

তখন আটচল্লিশ-ঊনচল্লিশ সাল। সময়টা খুব খারাপ। মন্বন্তরের সময় আমার বয়েস বছর চারেকের বেশি হবে না। দু-চারটি স্মৃতি যা আছে, খুবই আবছা। মন্বন্তর হাহাকারের কাল, আমার কাছে কিন্তু ঐ আটচল্লিশ-ঊনচল্লিশ সাল। সব কিছু ধসে পড়ছে—পুকুরের পাড় ধসে পড়ছে, বড়ো বড়ো বট অশথগাছের গোড়ার মাটি ধসে পড়ছে, মনবশচাচার একশ বছরের পুরনো মাটির বাড়িটা ধসে পড়ল। পাকিস্তানে 'অপশন' না কি দিয়ে আমার ছোট চাচা, ফুফাত ভাই কচিভাই পুব পাকিস্তানের খুলনা আর রাজশাহীতে চলে গেলেন আর ছ-মাসের বেশি টিকতে না পেরে বেকার হয়ে ফিরে এলেন—এই রকম সময়!

আমাদের বিরাট বড়ো সংসারও ঐ সময় ধসে পড়ল। কী আশ্চর্য, ঠিক ঐ সময়টাতেই প্রত্যেক দিন আমার বুকের মধ্যে একটা করে ধস নামে—রানী কাশীশ্বরী হাই স্কুলটা কি আর টিকবে না? শৈলজাবাবু খুব সম্মানের সঙ্গে গাঁ থেকে বিদায় নেননি। তারপর স্কুলে এখন হেডমাস্টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। মণীন্দ্রমাস্টার বাবার সামনে যতই কাঁচুমাচু করুন, তিনি নিয়ম করে লাগতেন আমাদের দু-ভাইয়ের পেছনে, স্কুলের তিন মাসের বেতন বাকি পড়েছে...কী রে, আজও স্কুলের মাইনেটা আনলি না, বাবাকে বলিসনি? পরশু দিনের মধ্যে বেতন শোধ না করলে নাম কাটা যাবে বলে দিচ্ছি! স্কুলটা কি দানসত্র খুলে রেখেছে? মহারানী কি তোদের বেতন জন্মের মতো দিয়ে রেখেছে? বেতন শোধ করবি না, স্কুলে পড়তে চাস কেন? আমরা দু ভাই কিছুতেই আর মণীন্দ্রবাবুর সামনে যাই না—তাঁকে দেখলেই লুকোই। এদিকে তিনি আবার স্কুলের গেমটিচার, কেরানি আর লাইব্রেরিয়ান। গেম তো হতো ছাই—ছিল একটা রিং, এটা নিয়ে শুধু ছোড়াছুড়ি খেলা। স্কুলের ভিতর খেলার কোনো জায়গা নেই, সরঞ্জামও কিছু নেই। শীতকালে ব্যাডমিন্টন খেলার একটা করা হয়েছিল ব্যবস্থা কোর্ট-টোর্ট কেটে, তার আবার ব্যাটগুলো ছেঁড়া, প্রায়ই দেখা যেত শাটল কক নেই কিংবা একটা কক নিয়েই খেলা হচ্ছে দিনের পর দিন। তার পালকগুলো প্রায় সবই খসে পড়েছে। তারপরে আছে বুড়োদের উৎপাত। গাঁয়ের দু-চারজন ভদ্রলোক তাঁদের পুরনো দিনের এই খেলাটাকে ঝালিয়ে নিতে আসতেন। তখন মাস্টারমশাইদের মধ্যে থেকেও দু-একজন র‍্যাকেট নিয়ে যেতেন। গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে জানাশোনা মানুষ হিশেবে খুব খ্যাতি ছিল ননু কাকার। তিনি তো আবার মহারাজার ভাগ্নীর ছেলে। ত্যাড়া হয়ে দাঁড়াতেন, ত্যাড়া হয়ে র‍্যাকেটের দিকে চেয়ে তিনি এক-একটা এমন সার্ভিস ঝাড়তেন যে সেটাকে আর পাল্টা তোলা কারো সাধ্যিতে কুলোত না। ব্যস, এঁরা এসে পড়লেই আমাদের ব্যাটমিন্টন খেলা শেষ।

আমার মনে হতো মণীন্দ্রবাবু এই স্কুলে আছেন শুধু আমাদের জ্বালাতন করার জন্যে। স্কুলের মাস-মাস বেতন ছিল বোধহয় এক টাকা—দু-ভাইয়ের জন্যে ফি মাসে দু টাকা। বাবার হাতে টাকা কই? পর পর দু-বছর ভালো ফলন হয়নি। আটটা ধানের মড়াইয়ের মধ্যে গোটা তিনেক মাত্র রয়েছে আমাদের বাড়িতে। পাকিস্তানের চাকরি ছেড়ে ছোটচাচা তাঁর বড়ো পরিবার নিয়ে শহর ছেড়ে গাঁয়ের বাড়িতে চলে এলেন। গরমের দিনে গাঁয়ের পুকুরের পানি প্রত্যেক দিন একটু একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে শুকুতে যদি কারো দেখা থাকে, তাহলে সে বুঝতে পারবে আমাদের পরিবার প্রত্যেক দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম দিকে বাড়িতে ভরা আনন্দের বন্যা বইতে লাগল, নাই-বা থাকল ছোটচাচার চাকরি, হলোই বা তাঁর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে—দরকার পড়লে সবাই আধপেটা খেয়ে থাকা যাবে কিন্তু ছোটচাচা ছিলেন খুব সুন্দর দেখতে ছোটখাটো মানুষ, প্রিয়ভাষী, মিষ্টভাষী, সত্যভাষী। তিনি আমাদের খুব প্রিয়। বাড়ি এসে তাঁরও আনন্দের শেষ নেই। বন্দুক নিয়ে পাখি মারতে বেরোচ্ছেন, দু-বেলা ননুকাকার চায়ের আড্ডায় যাচ্ছেন। রাত একটা পর্যন্ত বসে বই পড়ছেন।

এদিকে বৈশাখ পেরিয়ে যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঠা ঠা রোদে মাঠ-ঘাট পুড়তে থাকে। আকাশে মেঘের দেখা নেই। পুকুরগুলো শুকুতে থাকে। একটু একটু করে প্রত্যেক দিন। পাঁক দেখা দিল বলে। মড়াইয়ের সংখ্যা কমছে, যে দু-একটা রয়েছে তাদের আকার কমছে, মাসকলাইয়ের ডাল পাতলা হচ্ছে, সজনের শাক সেদ্ধ হচ্ছে প্রতিদিন, আঁতিপাঁতি করে ছোট-বড়ো হাঁড়ি খুঁজছে ফুফু। গাই দু-একটা মরেছে। দু-একটার বাচ্চা বড়ো হয়েছে, আর দুধ দেয় না। বাড়িতে জ্বালানির টান পড়েছে—যে যেমন পারছে পালুই থেকে খড় টেনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলছে। গরুর খাবারে টান পড়বে, পড়ল বলে—মুখে বলছে অথচ জ্বালানি না থাকলে যা-ই বা রান্না তা হবে কোথা থেকে? পুকুর যখন শুকোয় তখন শেষের দিকে বড়ো তাড়াতাড়ি পানি কমতে থাকে, মনে হয় পুকুর নিজেই নিজেকে শুষে নিচ্ছে। বাড়ির কেউ আর কারো সাথে ঠাণ্ডা মেজাজে কথা বলতে পারে না। পারলে কথাই বলে না।

আমার মন্বন্তরের কথা তেমন মনে নেই—কিন্তু বিভীষিকা হয়ে আছে এই দিনগুলি। বিবাহযোগ্য, বাড়ির সকলের পরম আদরের মেয়ে জানুর বিয়ে দিতে হবে। যোগ্য পাত্র চাই, চাই-ই চাই, সংসারের সর্বস্ব গেলেও চাই। বাবার ঘরে চিঠির তাড়া বাড়তে থাকে। শিকে গাঁথা চিঠির তিন-চারটে তাড়া হয়ে গেল। স্কুলের বেতন দু-একবার চাইতে গেলে মনে হতো বাবার মাথায় আগুন ধরে গেছে—সে যা এখন, পরে হবে—মনিন্দরকে বলবি বাবা এসে দিয়ে যাবে বেতন। আমার আর একটি কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলার সাধ্যি নেই। দিনেশ ক্লাসে আসে, ক্লাসের মাস্টারমশাইকে বলে, আমাদের দুজনকে অফিসে ডাকছেন কেরানিবাবু। পালাবার উপায় নেই—তোমাদের দু-ভাইয়ের জন্যে আমি কি চাকরিটা খোয়াব? বেতন না আনতে পারলে পরশু থেকে আর স্কুলে আসিস না।

ঐ দুঃসময়টার কথা মনে হলেই কেন যে শুধু গ্রীষ্মকালের ছবিটা মাথায় আসে জানি না। যেন বর্ষায় দুঃসময় ছিল না, শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তেও খারাপ সময়ের কথা মনে আসে না। অথচ দুঃসময় সারা বছর ধরে। তার তো আর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নেই। হতে পারে গ্রীষ্মকালে মাঠে ফসল থাকে না, আকাশে মেঘ থাকে না, পুকুরে জল থাকে না, মাঠে ঘাস থাকে না, মাটি পুড়ে পুড়ে তামা হতে থাকে— গাঁয়ের রাস্তায় মানুষ থাকে না, পালদের অন্ধকার ঘানিঘর থেকে একটানা কোঁ কোঁ আওয়াজ আসতে থাকে আর ভিনগাঁয়ের কোনো গরুর গাড়ির গরুদুটো, ঘুমুতে ঘুমুতে ফিরছে আমাদের গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে, তার চাকায় তেল নেই—একটানা মরণ-চিৎকার করছে গাড়িটা।

এমন দুপুরে স্কুলেও সাড়াশব্দ কম। দাশুমাস্টারের পাঠশালার সেই আসল মাস্টার, আমাদের বলরাম পাল, বলা, স্কুলে ভর্তি হয়ে নতুন ছাত্রদের ভিড়ে এমন করে হারিয়ে গেল যে সে ক্লাসে এলেও খেয়াল হয় না, না এলেও হয় না। ধারসোনার একমাত্র ছাত্র সোহরাব গত দু-তিন বছর ধরে ক্লাস ফাইভেই আছে আর সেই প্রাইমারি পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় সাঁওতা স্টেশনে যেবার ট্রেন-ডাকাতি হয়েছিল তখন গোবর্ধনপুরের আলী নেওয়াজ মিয়ার যে মেয়েটি ছিল সেই মেয়েটির এক আপন ভাই, আর তার দুই চাচাত ভাই ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েছিল। ওদের একজন হনুমান, আর একজন বাঁদর, আর একজন উল্লুক। স্কুলে ক-দিন ছিল মনে করতে পারি না।

সেই বছর আমাদের স্কুলের ফুটবল টিম মালডাঙায় ম্যাচ খেলতে গিয়ে পাঁচ গোলে হেরে গেল, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্যে যে পাঁচজন টেস্টে 'এলাউ' হয়েছিল, তারা পাঁচজনই ফেল করল। হেডমাস্টার নেই, স্কুল টিং টিং করছে। শুরুর ঘণ্টাও ঠিকমতো বাজে না, শেষ ঘণ্টাও তাই। কেমন ঠ্যান ঠ্যান আওয়াজ করে অতবড়ো ঘণ্টাটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলের বোর্ডিং হাউস দুটো। তিনটে ছোট ছোট ঘরওয়ালা খড়ো বড়ো ঘরটা স্কুলের একদম লাগোয়া। আর একটু দূরে দিঘির উত্তর-পুব কোণে তিন-চারটে ঘরের বড়ো বোর্ডিংটা। রান্নাঘর-টর নিয়ে এটাই আসল বোর্ডিং, ছাত্ররা থাকে। স্কুলের লাগোয়া যেটা তার একটা ঘরে হেডমাস্টার থাকেন, আর একটা ঘরে কোনো বুড়ো মাস্টারমশাই, যেমন ক্ষীরগাঁয়ের দুর্গাশঙ্করবাবু কিংবা আর কেউ থাকেন। বাকি ঘরটায় ক্লাস টেনের কিছুতেই বিদেয় হতে চায় না এমন গোঁফওয়ালা এক জামাইক্লাসের কোনো ছাত্র কখনো থাকে। স্কুলে হেডমাস্টার নেই, কাজেই তাঁর থাকার ঘরটায় তালা মারা।

একদিন স্কুলে এসে দেখি সে ঘরটা খোলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে, চৌকোয় বিছানা পাতা রয়েছে আর সেই চৌকোর উপর বসে রয়েছেন—ওরে, তাহলে নতুন হেডমাস্টার এসেছে! তাহলে নিশ্চয়ই ঐ চৌকির উপর যে লোকটা বসে আছে, সেই লোকটাই নতুন হেডমাস্টার! হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমাদের স্কুলে নতুন একজন হেডমাস্টার এসেছেন। তাঁর নাম নাকি পঙ্কজ ভট্টাচার্য। বর্ধমান শহরে বাড়ি, বি.এ. পাশ। যথেষ্ট, গ্রাজুয়েট হলেই হলো, অনার-গ্রাজুয়েট নাই-বা হলো! শৈলজাবাবুও বি.এ. পাস ছিলেন। আমরা সব উঁকিঝুঁকি মেরে নতুন মাস্টারকে দেখতে লাগলাম। ঠিক যেন চিড়িয়াখানায় নতুন কোনো বাঘ-ভাল্লুক এসেছে। ব্যাজারমুখে বসে আছেন একটা মানুষ—দেখতে সুন্দর, পরনে একটা সিল্কের লুঙ্গি, হাফ-ফর্শা মানুষটার গায়ে একটা হাফ শার্ট। সেদিন তিনি ঘর থেকে বেরুলেন না, কারো সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। ভালো করে পরখ-টরখ করে সেদিন বাড়ি গিয়ে মাকে জানালাম, জানিস মা, নতুন হেডমাস্টার এসেছে স্কুলে। মায়ের যা অভ্যেস, বড়ো বড়ো চোখে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কিন্তু আমাদের মনে খুব সন্দেহ। কদিন এই নতুন মাস্টার স্কুলে থাকে কে জানে? যবগ্রামের লোকের যা হেডমাস্টার তাড়ানোর অভ্যাস। গাঁয়ের ওপর দোষ চাপানো অবশ্য ঠিক নয়। শুধু স্কুল কেন, বারোয়ারি যা কিছু হবে তা ঠিক করতেন গাঁয়ের চার-পাঁচজন মানুষ। সেই চার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচজনের মধ্যেও আবার দলাদলি। এই চার-পাঁচজনের মধ্যে বাবাও একজন ছিলেন স্বীকার করতে হবে আমাকে।

ঠিক তিন কী চার দিন পরে—এই কদিনের মধ্যে নতুন হেডমাস্টারকে একবারও ঘরের বাইরে আসতে দেখিনি, ক্লাস-ট্লাস নেওয়া তো দূরের কথা—সন্ধেরাতে বাবা বাড়ি ফিরলেন বর্ধমান শহর থেকে। আগাগোড়া দেখে আসছি তিনি প্রায় প্রত্যেক দিন বর্ধমান বা কাটোয়া যান—কী কারণে জানি না—ধপধপে ধুতি শাদা শার্ট পরে ফিটফাট হয়েই যান আর অবশ্যই ফিরে আসেন সন্ধেবেলায়। আরো একটু আশ্চর্যের কথা—ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে একটু স্থির হয়ে বসেই তিনি খুব খোশমেজাজে সকালে বাড়ি থেকে বের হবার পর থেকে এই এখন ফেরা পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার বিবরণ দিতে থাকেন মায়ের কাছে। মাকে চুপচাপ বসে তাঁর সারা দিনের গল্প শুনতেই হবে। আমরা তখন আশেপাশে দাঁড়িয়ে শুনলেও দোষ নেই। যা চমৎকার কথা বলতে পারেন বাবা! সেদিন দেখি তাঁর মেজাজ আরো শরিফ, বসো, কথা শোনো, ঐ যে স্কুলে নতুন হেডমাস্টার এসেছে ভটচাজ, ও লোকটা একটা খুনি। নিজে খুন না করলেও একটা খুনের মামলার আসামি। আমি আজ সব খবর নিয়ে এসেছি। ও মোটেই গ্রাজুয়েট নয়, ম্যাট্রিক পাস, বর্ধমানে ওর নিজের বাড়িতে বউ ছেলেমেয়ে সব আছে। ব্যাটা পালিয়ে এসে য-গাঁ স্কুলের হেডমাস্টার সেজে বসে আছে। আজকের দিনটা আমার ঐ করতেই গেল।

ব্যস, গাঁয়ের লোক বিনি পয়সার একটা নাটক দেখার আর তাতে অল্প-স্বল্প অভিনয় করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। পরের দিনই বাবা ঐ গোনা-গুনতি চার-পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে হেডমাস্টারের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। এই মামলাটায় অন্তত এই চার-পাঁচজনের মধ্যে দলাদলি নেই। সবাই একমত। ঘরের ভিতরে এঁরা সবাই বসে আছেন, ঘরের বাইরে গাঁয়ের মানুষদের ভিড়। একজন আর একজনের কাঁধের ওপর দিয়ে কী ঘটছে দেখার চেষ্টা করছে। ভিতরে বক্তা একা বাবা, অন্যেরা কেউ চেয়ারে বসে, কেউ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে বাবার কথা শুনছেন। পঙ্কজবাবু ঘাড় নামিয়ে চুপ করে বসে আছেন আর যাঁরা বিচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেন তাঁদের মধ্যে দু-একজন যেন কাহিনী শুনে লজ্জায় মরে যাচ্ছেন এমনি ভাব করে মাটির দিকে চেয়ে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করছেন আর মাঝে মাঝে ছ্যা ছ্যা করে উঠছেন। তাহলে আপনি একজন খুনের আসামি, ম্যাট্রিক পাস ভণ্ড প্রতারক মশাই? ছি ছি ছি—মহারানীর স্কুলে এসেছেন হেডমাস্টারি করতে? তাহলে কী বলো ননু, একটা কথাও তো বলার ক্ষমতা নেই তাঁর! তাহলে উনি উঠুন, এক্ষুনি গাঁ ছেড়ে চলে যান। আমরা আর দয়া করে পুলিশ ডাকছি না, কী বলো। ঘরের ভিতরের কজন একবাক্যে জানালেন এক্ষুণি উনি বিদায় না হলে গাঁয়ের আর মান মর্যাদা থাকছে না। কী হলো মশাই উঠুন—এবার ননুকাকাই বললেন, জিনিশপত্র যা আছে আপনার ঐ টিনের স্যুটকেসে গুছিয়ে নিন। আমরা আপনাকে অন্তত মহানালা পার করে দিয়ে আসি।

এত কথার একটিও জবাব করলেন না পঙ্কজবাবু। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যাগ আর স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিয়ে দরজার ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দিনেশকে ডেকে ঘরে আবার তালা দেওয়া হলো। এবার নতুন মাস্টারের পিছু নিল গাঁয়ের লোক। আমি দেখতে পেলাম বাবা আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। না, মহানালা পার করে দিয়ে আসি বলার পরেও ননুকাকা আর থাকলেন না। গিরে রায়ের সঙ্গে তিনিও বাড়ির পথ ধরলেন। পঙ্কজবাবুর পিছন পিছন এখন শুধু গাঁয়ের নানা বয়েসী মানুষ—যতরকম অপমানের কথা ছিল সব এখন বন্দুকের ছররা গুলির মতো মানুষটার গায়ে গিয়ে লাগছে : বাটপারি করতে এসেছিস যবগ্রামে? চোর, ছ্যাঁচোর, জোচ্চর কোথাকার...নে রে, শালার গায়ের জামাটা খুলে নে, বদমাইশটাকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দে...এই, ওর স্যান্ডেলদুটো কেড়ে নে তো। আমিও যে পকেটমার, চোর, জাদুসোনা—এইসব কথা বলেছিলাম তা মনে করে এখন আমার ভারি খারাপ লাগে। যখন তাঁর গায়ে থুথু ছেটানোর কথাটা হঠাৎ উঠে পড়ল, আর দু-একজন ছোঁড়া যখন সেই কাজ করার চেষ্টা করল, তখন আমার সত্যিই লজ্জা হলো। আমি আর না এগিয়ে ঐখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম—নকল হেডমাস্টার মহানালা পার হলেন। গাঁয়ের লোকরা ফিরতি পথ ধরল। আমি তখন মাথা নামিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রকম করে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে অর্ধচন্দ্র পেয়ে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বিদায় হলেন। জানি না, এই একই সম্মান শৈলজাবাবুর কপালেও জুটেছিল কিনা। শুধু ভাবতে থাকি আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার হতে আর কে আসবে? গাঁয়ের লোকেরা স্কুলের ধারেকাছে ঘেঁষে না, তাদের মেয়েদের কাউকে স্কুলে পাঠায় না, শুধু এই মাস্টার তাড়ানোয় তাদের এত উৎসাহ কেন কে জানে!

তবু স্কুল চলছে। যতদিন নতুন হেডমাস্টার না আসছেন, স্কুল গোপীবাবুর দায়িত্বে। তাঁর পুরো নাম গোপীপদ পাঁজা, বাড়ি নিগণে। আমাদের গাঁ থেকে ঠিক এক ক্রোশ সিধে পশ্চিমে। বোর্ডিংয়ে থাকতেন না তিনি, প্রত্যেক দিন হেঁটে আসতেন নিগণ থেকে কাঁচা সড়ক ধরে। একদিন কামাই নেই, রোদ বৃষ্টি ঝড় জল যতই হোক গোপীবাবু ঠিক সময়মতো আসবেন, বাঁ হাতে মোটা চামড়ার জুতোজোড়া, ডানহাতে খোলা ছাতা, বাঁ বগলে স্টেটসম্যান কাগজ। একে খবরের কাগজ পড়ার মানুষই নেই গাঁয়ে, কারো কাছেই নেই কোনো দৈনিক কাগজ, ইংরেজি দৈনিকের তো কথাই নেই। বাবা রে, সারা গাঁয়ে ইংরেজি জানে কজন! টেনেটুনে তিনজন হতে পারে। তবে সবাই জানে গোপীবাবুর মতো ইংরেজি জানা লোক এ অঞ্চলে আর একজনও নেই। স্টেটসম্যান কাগজ পড়েন, সেটা বগলে করে স্কুলে নিয়ে আসেন। আরো একটা কথা, আমাদের গাঁয়ের স্কুলের একমাত্র গ্রাজুয়েট হচ্ছেন গোপীবাবু। আমি ক্লাস সিক্সে ওঠার পর অবশ্য আর একজন এসেছিলেন কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আবার বি.এ. বি.এল.। শিবরামবাবু, শান্তিরামবাবু, পণ্ডিতমশাই এমনকি দুর্গাশঙ্করবাবুও বি.এ. পাশ নন। ৫০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্যন্ত এঁদের বেতন।

গোপীবাবুর কোনো কিছুতেই কোনো আঁট ছিল না। হাতে ইয়া মোটা কঞ্চি থাকত—তা দিয়ে কাউকে তেমন মারতেন-টারতেন না। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর পৃথিবীর মানচিত্র চাপিয়ে দিয়ে ঐ কঞ্চিটা দিয়ে পৃথিবীর নানা জায়গা দেখাতেন : এ্যাদা, এ্যাদা মস্কো, এই যে র‍্যা, এ্যাদা কামস্কাটকা—সড়াৎ করে কঞ্চি নেমে আসত এই যে টোকিও—কিছুই বুঝতে পারা যেত না। তবু যাই হোক স্কুলটা তো চলছিল। আমরা মুখ বুজে মণীন্দ্র মাস্টারের অত্যাচার সয়ে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে এক ফুফু ছাড়া একজনেরও মাথা ঠিক নেই। বাড়ির তৈরি টিন টিন গুড় বিক্রি হয় না, পচে যাচ্ছে, পাকা কুমড়োগুলোও পচতে শুরু করবে এইবার, নিগণের দোকান ধারে-দেনায় অচল, চিনি জোগাড় হয় না, নুন কম পড়ে। টাকার টানাটানিতে দরকারি কেনার জিনিশও মেলে না। ওষুধ নয়, পথ্য নয়, জামাকাপড় নয়। স্কুলের মাইনে জুটবে কোথা থেকে? এক একবার ভাবি দরকার নেই স্কুলে যাবার। রাখালদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াই। তবে এই কথাটাও এখানে স্বীকার করতে হবে, কারণ জানি না, স্কুল ছাড়ার কথা মনে হলেই বুকে শেল বেঁধার মতো ভীষণ কষ্ট হতো। স্কুলে মার খেলেও সেটা অনেক ভালো আমার জন্যে।

তারপরও কী আশ্চর্য, বেঁচে গেলাম! সে-ও মণীন্দ্র মাস্টারের জন্যেই। তিনি আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। লাইব্রেরি থেকে বই ইস্যু করার দিন ছিল শনিবারের বিকেল। একসাথে মাত্র একটি বই। স্কুলের বেতন আদায়ের জন্যে তিনি আমাদের যতই পীড়ন করুন, শনিবারের বিকেলে বই আনতে গেলে তিনটি আলমারিরই তালা খুলে দিয়ে বলতেন, দ্যাখ, কী বই নিবি, নে। তখুনি আমি নিজের ভিতরে বুঝে গিয়েছিলাম যে পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি বই। বইয়ের তিনটি আলমারি নিয়ে আমি কী বলব? যত যাই-ই বলি, আমার মনের খাঁটি কথাটি তাতে বলা হবে না। একটা হিরের খনি, একটা সোনার খনি, একটা রুপোর খনি! নে, বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

প্রথম যে বইটা নিয়েছিলাম তার নাম আমার আজও মনে আছে—'কাজললতা'। সেই বইয়ের লেখক কে ছিলেন মনে নেই, গল্পগুলো কী ছিল তা-ও মনে নেই। বইটার সেলাই বলতে কিছু ছিল না, প্রত্যেকটি পাতাই খোলা, সেলাইয়ের সুতো নেতিয়ে একদিকে পড়ে আছে, শুধু ওপরের মলাটটা চমৎকার। আমার পড়ার বাইরের প্রথম বই 'ধ্রুব', আর দু নম্বর বই হচ্ছে এই 'কাজললতা'। নাম আর মলাট দেখেই বইটা নিয়েছিলাম, তার গল্পটল্প কিছু মনে নেই। পরের বইটা ছিল 'জাপানি ফানুশ'। যুদ্ধ ততদিন হয়ে গেছে। এই বইয়ে যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছু নেই, আছে কয়েকটি প্রচলিত জাপানি গল্প। তার একটার নাম 'আয়নার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাণ্ড'। একটা ছেলের ছোটবেলায় বাবা তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন একটা আয়না। সেই আয়না বাক্স বন্ধ ছিল বহুদিন। অনেক কাল পরে ছেলেটা যখন যুবক হয়ে গিয়েছে, তখন একদিন বাক্স খুলে পেল আয়নাটা। তার পেছনের পারদ-টারদ অনেকটা উঠে গেছে। তবু তার ভিতর দিয়েই ছেলেটা দেখতে পেল আয়নায় অবিকল তার বাবা বসে আছেন। কোনো ভুল নেই, তার বাবাই। ব্যস, লুকিয়ে রাখল সে আয়নাটা—কাউকে কিছু বলল না, যখুনি সময় পায় আয়নায় নিজের বাবাকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে, বিপদে পড়লে কেমন করে বাঁচবে জিজ্ঞেস করে। এই হলো গল্প। আসলে ছেলেটা বড়ো হয়ে অবিকল তার বাবার মতোই হয়ে গিয়েছে। আয়নায় সে নিজেকেই দেখে।

এরপরেই পেয়ে গেলাম খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ঝিলে-জঙ্গলে'। একটা শিকার কাহিনী। এখানেই বলে রাখি, আমি আজও হিংস্র বড়ো জন্তু-জানোয়ারের শিকার কাহিনী পড়তে খুব পছন্দ করি। নেশা করার দরকার পড়লে পড়ি জিম করবেট, কেনেথ এন্ডারসন, বনের খবর, সুন্দরবনের বাঘ শিকার, স্পিক টু দি আর্থ—মোটকথা যা পাই তাই। দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনী, বেপরোয়া অভিযানের বিবরণ, হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায় এমন, শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা বই, রোমাঞ্চ গল্প আর গোয়েন্দা কাহিনী। ষোলো বছর পর্যন্ত এদের নেশা কাটেনি। সুযোগ এসে গেলে আজও কাজে লাগাই। যাই হোক, 'ঝিলে-জঙ্গলে' যে সত্যিকারের শিকার কাহিনী তা হয়তো বলা যাবে না। তবে তার ভূগোলটা নির্ণয় করা যায়—অনেক ঘটনাই হয়তো সত্য। বইটা বার বার করে স্কুল লাইব্রেরি থেকে নিতে থাকি, বার বার পড়ি। ঝামাপুকুর লেনের দেব সাহিত্য কুটিরের এক টাকা দামের সব কটি বই কিনতে পারলে আমি হয়ে যাব এক মহাধনী মানুষ। বলতে এখন লজ্জা লাগে, বার বার হারিয়ে ফেললেও এই বইটার একটা নতুন কপি আজও আমার কাছে আছে, আরো লজ্জা পাই বলতে যে বইটা আমি ফাঁক পেলে পড়ি। খগেন্দ্র মিত্রকে তখন মনে হতো পৃথিবীর সেরা লেখক। তাঁর আরো একটা বই লাইব্রেরি থেকে নিয়েছিলাম। এক তিব্বতি বা নেপালি বদমাশের গল্প। সে লোকটা চুরি করত, ডাকাতি করত, দরকার পড়লে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুনও করত। থাকত বেশির ভাগ তরাই জঙ্গলে। নেপালি ভোজালি কুকরি নামটা তখনই প্রথম জানতে পারি। কুকরি শুনলে এখনো আমি কাঁটা হয়ে উঠি।

দেব সাহিত্য কুটিরের অনেকগুলো আলাদা আলাদা সিরিজ ছিল—কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, প্রহেলিকা সিরিজ। আসলে তখন আমার কাছে সত্যি সত্যি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হচ্ছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর লেখারও নানা রকম ভাগ ছিল। গোয়েন্দা কাহিনী—জয়ন্ত, মানিক গোয়েন্দা, বোকা ভালোমানুষ দারোগা সুন্দরবাবু। দুর্ধর্ষ সব অভিযান কাহিনী 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন' 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন'। সেখানেও একজোড়া নায়ক। ওফ! কীসব লোমহর্ষক কাহিনী। দেব সাহিত্য কুটিরের বাহাদুরি ছিল বলতে হবে। তাঁরা বাংলাভাষার সব বড়ো বড়ো লেখকদের দিয়ে এই সব কিশোরপাঠ্য অনেক বই লিখিয়ে নিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর 'ছায়া কালো কালো', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিসমিদের কবচ', 'চাঁদের পাহাড়', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ছিনিমিনি', 'প্রাচীর ও প্রান্তর', প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মহিলা গোয়েন্দা কৃষ্ণা সিরিজের একগাদা বই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো বই ছিল বলে মনে করতে পারছি না।

এক পোয়া দুধের সঙ্গে তিন পোয়া জল মেশানোর কথা হয়তো অনেকেই বলবে, তখনকার দিনেও আমাদের কেউ কেউ বলতেন। আমরা তাতে কান করতাম না, বুঁদ হয়ে থাকতাম ঐসব বই পড়ায়। ডিকেন্স পড়ার সাধ্য নেই কিন্তু দেব সাহিত্য কুটির এক টাকায় আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে, 'অলিভার টুইস্ট', নিকল্‌স্ নিকলবি', 'এ টেল অব টু সিটিজ'; পড়তে পারছি আর এল স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যান্ড', ডুমার 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স। একই সঙ্গে পড়ছি 'বলদর্পী হিটলার', 'দি লাস্ট অব দি মেহিকান'। এইসব বড়ো লেখকদের আবার পৃথিবীর বড়ো মানুষদের নিয়ে বইয়ের আলাদা একটা সংগ্রহ ছিল। তবে এখন আমার মনে হয়, সুবোধচন্দ্র মজুমদারের 'ছোটদের মহাভারত' বইটা খুব স্থায়ী হয়ে রয়েছে আমার মনে আজও আর বাংলাদেশের ঘরে ঘরে চালু একটি ডিকশনারি এটি দেবের অভিধান। এটা ছাড়া কোনো শিক্ষিত লোকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলত না। আমাদের বাংলার মাস্টারমশাই দুর্গাশঙ্করবাবু বলতেন, আঁটি দেব নিয়ে আয়। এই কথাটা নিশ্চয়ই বলা যায় যে দেব সাহিত্য কুটিরের ঐসব শস্তা জলমেশানো দুধের মতো বইগুলো বাংলাসাহিত্যের দিগন্তের বাইরে সারা পৃথিবীর সাহিত্যের সুবিশাল দিগন্তের একটা আঁচ তৈরি করে দিয়েছিল আমাদের মধ্যে আর এই শস্তা এক টাকা দামের বইগুলোই বাড়িয়ে দিয়েছিল বইয়ের মূল্য। এই মূল্য পরিশোধযোগ্য নয়। বিনামূল্যে পাওয়া, না চাইলেও পাওয়া আর বুঝে ফেলা যে বই-ই গড়েপিটে মানুষকে মানুষ করে তোলে।

ঐ সময়েই 'শুকতারা' নামে কিশোরদের একটি মাসিক পত্রিকা বের হচ্ছিল। দুর্ভাগ্য আমি তখনো 'সন্দেশ' পত্রিকাটা দেখিনি। 'শুকতারা'তেই মজে ছিলাম। চার আনার একটা সিকি দিয়ে আমার বড়োভাই আমাকে 'শুকতারা'র সদস্য করে দিয়েছিলেন। প্রতি মাসের সদস্যদের তালিকায় একদিন ছাপার হরফে নিজের নামটা দেখেছিলাম। কেমন মনে হয়েছিল এখন বলা অসম্ভব।

ক্লাস ফাইভ সিক্স পর্যন্ত শনিবারের বিকেলে বই আনতে গেলে আমি অন্য দুটো আলমারির দিকে হাত বাড়াতাম না। বই পড়ার ইচ্ছেটা আস্তে আস্তে একটা ক্ষিধের চেহারা নিল। সে যে কী রকম আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। একটু বলার চেষ্টা করি। সারা দুপুর জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি—বড়ো একটা জামগাছে উঠে বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে যেতে চলল, এইবার বাড়ি যাই, একটু সরষের তেল মেখে 'ঘোলা'য় গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসি। তারপর গামছাটা কাঁধে ফেলে বাড়ি আসি চেঁচাতে চেঁচাতে, ফুপু ভাত দে—এখুনি ভাত দে! রাক্ষুসে ক্ষিধে, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বাড়া ভাতের থালার সামনে বসেছি, শুধু ভাত, ভাত, পৃথিবী অন্নময়। ঠিক এই রকম ক্ষিধে কি আমার বই পড়ার? বলাটা ঠিক হলো কিনা জানি না, হয়তো এরকমই বা এর কাছাকাছি কিংবা একেবারেই এরকম নয়। বই তো ভাতের মতো গেলা যায় না—ঘরের একটা অন্ধকার কোণে কিংবা তেঁতুলতলায় জিনলাগানো ঘোড়ার পিঠের মতো শেকড়টার ওপর বসে—শুধুই কালো কালো অক্ষরের সারি—মিষ্টি, সন্দেশের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? তবু ঐটাই কথা! চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে না পাওয়ার মতোই ক্ষিধে। এখানে আর দুটো কথা বলা আমার উচিত। ক্ষিধে তো হলো কিন্তু কেন এই ক্ষিধে? জানি না। ঐ একই ক্ষিধে আমার বয়েসী আর কারো তেমন নেই কেন? বাড়িতে শুধু দেখতে পাই জানুর মধ্যে। এই কথা দুটোর কোনো উত্তর ছিল না আমার কাছে, আজও নেই। একটা কথা কিন্তু সবার বেলাতেই বলা যায়, সে হচ্ছে : এ এই রকমই। আর কোনো উত্তর নেই।

বই খুবই দুষ্প্রাপ্য জিনিশ অবশ্য। গাঁয়ে একশোটা বাড়ির মধ্যে হয়তো নব্বুইটা বাড়িতেই কোনো বই নেই। স্কুলে যারা পড়ে তাদের পড়ার বই এই হিশেবে ধরছি না। কখনো কোনো কোনো বাড়ি থেকে হঠাৎ একটা বই পাওয়া গেল। কোথায় ছিল কে জানে? হাঁড়ি-পাতিলের মধ্যে বা সিন্দুকের এক কোণে। হিরোদের বাড়িতে যে দুর্গাঠাকুরের পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু বিরাট চালচিত্র আর প্রতিমাগুলোর শুকনো পচা খড়ের কাঠামোগুলো এখনো টিকে আছে, তারই পিছন থেকে বিরাট একটা বই বেরিয়ে এল। বইটার নাম : শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী। কী অদ্ভুত নাম। তেমন কোনো উদারতা না দেখিয়েও বইটা আমাকে হিরো অকাতরে দিয়ে দিল। গল্পটা একটু একটু মনে আছে : জমিদারের প্রধান লাঠিয়াল মোনাহাতি একটা খুনে জড়িয়ে নিরুদ্দেশ। এর বহু কাল পরে ঐ গাঁয়েই ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জমিদারের একটা পাগলা হাতি। যা তা করে বেড়াচ্ছে হাতিটা। গাঁয়ের লোকের ভিড় তাকে ঘিরে। হঠাৎ একটা হামাগুড়ি-দেওয়া ছোট ছেলে গিয়ে পড়ল সেই হাতির সামনে। তাকে পিষে দেবার জন্যে হাতি একটা পা তুলেছে, সর্বনাশ চিন্তা করে গাঁয়ের মানুষ ভয়ে আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। এই সময় কোথা থেকে লাঠি হাতে একটা মানুষ বিদ্যুৎবেগে এসে দাঁড়াল হাতিটার সামনে, লাঠি তুললো সে হাতির মাথা লক্ষ করে, বোমা ফাটার মতো ভয়ানক একটা আওয়াজ হলো, হাতির মাথা চুরমার! কাঁপতে কাঁপতে সেটা বসে পড়ল, বাচ্চাটাও বেঁচে গেল। লোকটা যেমন বিদ্যুৎবেগে এসেছিল, তেমনি বিদ্যুৎবেগে চলে গেল। এ সেই খুনের আসামি মোনাহাতি!

বেশি ক্ষিধে নিয়ে খেতে গেলে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া হয়ে যায়। আমি তো আর বাছি না, বই পেলেই গোগ্রাসে গেলা—ভালো মন্দ যা-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের কাছে আসে। ব্যাঙের দেশ, গোপাল ভাঁড়ের গল্প, ঠাকুরমার ঝুলি, বাবা একসময় যে যাত্রপালা করতেন, তখন কেনা সীতার পাতাল প্রবেশ, বৃষকেতু—যার কাছে যা পাওয়া যায়। ঐ বয়সে যে রকম বই পড়া উচিত নয়, তেমন বই পড়া আর হাতে হাতে তার ফল পেয়ে যাওয়া, তার ক্লেদ শরীর-মনে ঢুকে পড়া, কিছুই ঠেকানো যায়নি। শরীর-চেতনা এত অল্প বয়সে এল কেন? কুঅভ্যাস দেখা দিতে শুরু করল আস্তে আস্তে।

এদিকে যত দুষ্প্রাপ্যই হোক, বই পেলেই হতো। কোনো কোনো বইয়ের নামমাত্র মনে আছে : পলাতকা। গল্পের কিছুই মনে নেই শুধু নামটা ছাড়া আর চিরকালের জন্যে সেটা মনের ওপর দাগ কেটে গেছে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কটা অদ্ভুত উপন্যাস পড়েছিলাম। একক্রোশ দূরের গাঁয়ে একজনের কাছে একটা বই আছে—সেখানে গিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিয়ে আসা আবার ফেরত দিয়ে আসা। বইয়ের গল্প আমি বলে শেষ করতে পারব না।

সময়টা খুব খারাপ হতে লাগল। সংসারে অভাবের চেয়ে তাতে ঘুণ-লাগাই বেশি দেখা গেল। কী কারণে সবাই সবসময় চুপ করে থাকে বুঝতে পারি না। অথচ বাড়ির বাইরে থেকে থালাবাসনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, ছেলেটাকে ধপ্ করে কোল থেকে ফেলে দেওয়ার শব্দ পাওয়া যায়, শিল-নোড়ায় ঘষর ঘষর মসলা বাঁটা হচ্ছে শোনা যাচ্ছে, জাঁতা দিয়ে ডালভাঙার আওয়াজ আসছে। শুধু মানুষের মুখের কথা নেই, সব যেন প্রেত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও যেন কোনোরকম রঙ নেই—অথচ সব রঙই আছে। রঙটা যে কোথাও নেই তা যে কারো একটি কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকে কি জানে বৈশাখ মাসের দুপুর বেলায় ফিকে নীল প্রায় শাদা আকাশে সুয্যিটা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে, তখন মাঠে নেমে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়? বেলা দুপুরে মধ্য মাঠে অন্ধ! বিশ্বাস হয়? ছোট চাচার চাকরিতে কাঁচা টাকা—পাকিস্তানে তিনটে মাসও সহ্য হলো না—তিনি ফিরে গেলে বাড়িতে সে কী আনন্দ, সে কী হৈচৈ। ছোট চাচার মুখখানা শুকনো, কাঁচা টাকা নেই অথচ বাড়িতে ছ-সাতজন মানুষ বেড়ে গেল। কেমন করে ছোট হয়ে এল ধানের মড়াইটা। নিগণের দোকান বন্ধ হয়ে গেল। হাজার তাগাদা দিয়ে দিয়েও কেউ ধার শোধ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল না। বড়োচাচা দোকান থেকে এসে বাড়িতে বসে থাকলেন। কয়েকটা বক, শামখোল, কান্তেচোরা ঘুঘু মেরে ছোটচাচা ক্লান্ত হয়ে বন্দুক রেখে দিলেন। তাঁর জন্যে রুটিন হয়ে গেল বেলা দশটায় ধুতি-গেঞ্জি গায়ে ননু কাকার বাড়ির ইজি চেয়ারটায় গিয়ে বসা, একটু পরে শঙ্করী দাঁয়ের জুটে পড়া, তিন-চার কাপ চা খাওয়া, তারপর বেলা তিনটেয় বাড়ি ফিরে গা ধুয়ে ভাত খেয়ে নিয়ে বসে বসে বই পড়া। সন্ধের পরে আবার ঐ একই রুটিন, রাত ন-টায় বাড়ি ফিরে খেয়ে নিয়ে বই নিয়ে বসা। রাত একটাতেও তাঁর ঘরের জানালায় আলো।

এর মধ্যে ঘটনা একটাই। জানুর বিয়ে হয়ে যাওয়া। এই একটা ব্যাপারেই শুধু পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কথাবার্তা হয়। সেখানে কোনো কথার অভাব নেই, মতের তফাৎ কিছু নেই। যত খারাপ দিনই পড়ুক এই বিয়েতে কোনো খুঁত রাখা যাবে না। বিশ ভরি সোনার গয়না তো দিতেই হবে, র‍্যালে সাইকেল না পারা গেলে অন্তত বি.এস.এ. দিতে হবে। বরযাত্রী যত খুশি আসবে—খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা বড়ো করে করতে হবে। পাত্র ইংরেজিতে এম.এ. পাস। এই গোটা এলাকায় মাত্র একজন বাংলায় এম.এ. পাস আছেন। ইংরেজিতে কেউ নেই— আর ইংরেজিতে এম.এ. পাস একজনও কেউ নেই। যশোরে একটা স্কুলে চাকরি করেন, শিগগিরই যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজে ইংরেজির প্রফেসর হয়ে যাবেন। বছর দুয়েক হয়েছে পাকিস্তান, তার জন্যে তফাৎ অবশ্য কিছুই বুঝি না—যে যখন খুশি যাচ্ছে, আসছে, ভিসা-পাসপোর্ট নেই, কারো ভাবনাতেও সেটা নেই। অন্তত আমি এই সময়টায় দুটো দেশ হয়ে গিয়েছে তার কিছুই বুঝিনি। শুধু এইটুকুই যে বড়োভাই ঢাকায় চাকরি করেন। জানুর বিয়ে যদি যশোরেই হয় তাহলে অসুবিধে কী?

যাই হোক আশ্বিনের দিকেই মনে হয় ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হয়ে গেল। শুধু আমি ছাড়া বাকি সকলেরই খুব স্বস্তি হবার কথা। আমি তখনো বুঝিনি, বুঝতে আমার সময় লেগেছে, কারণ বিয়ের পরে জানু বেশ কিছুদিন বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছেই ছিল। সে চলে যাওয়ার পরে বুঝতে পারি আমি কতটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। তবে আমার কথা যাই হোক, বাড়ির পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠল। দিনটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাতে শেষ পর্যন্ত কেটে যায়, সেজন্যে সারা দিন বাড়ির বাইরেই থাকি। খাবার সময়েও বাড়িতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, দিনটা কোনোরকমে 'নেই' হয়ে গেলেই হলো।

তারপর একদিন সেই চূড়ান্ত সময়টা এসে গেল। ছত্রখান হয়ে গেল সব। বাড়ির পাঁচ ভাইয়ের পাঁচটা আলাদা সংসার হলো। একদিন রাতারাতি হাতে হাতে জিনিশপত্র নিয়ে আমরা নতুন বাড়িতে উঠে গেলাম। বিরাট সেই মাটির বাড়ি। ঘরই ছিল আটটা, তেতলাটা একটা হলঘরের মতো। আমাদের অত ঘর লাগেই না। দোতলায় আমার নিজের একটা ঘর হলো, পাশের ঘরে জানু থাকে তার মেয়েকে নিয়ে। নিচের একটি ঘরে বাবা, সংলগ্ন ঘরটায় ছোটভাই আনুকে নিয়ে মা। বাকি ঘর সব পড়ে থাকে। বিরাট উঠোন। এক কোণে রান্নাঘর আর একটা আধা-দিশি পায়খানা।

পুরনো বাড়িটা ভাগ হলো বড়ো অদ্ভুতভাবে। ঘর যার যেমন আলাদা হয়েই থাকল। অবশ্য সেগুলোকে ঘর বলা কঠিন। একটি করে দরজাওয়ালা এক-একখানি ছোট কুঠরি। তবে আমার ছোট্ট বেলার খুব ছোট্ট মনে—বেশি ভাবনা-চিন্তার জায়গা তো সেখানে নেই—কী যে ভীষণ কষ্ট হলো যখন দেখলাম ফুফুকেও আলাদা করে দেওয়া হলো। তাঁকে কেউ নিল না। বাবাও নিলেন না। বাড়ির সবচেয়ে ভালো উত্তর-দুয়োরি যে ঘরটায় ফুফু থাকতেন, সেই ঘরটাই তাঁর থাকল। বাবা খাঁটি ন্যায়বিচারকের মতো পিতৃসম্পত্তি যা কিছু ছিল—এমন মনে না-পড়া স্বামীর সম্পত্তিটুকুও চুলচেরা ভাগ করে দিলেন। কেঁদে কেঁদে যখন চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন ফুফু—বাবা বললেন, তোকে কারো গলগ্রহ হতে হবে না। যে ঘরটিতে থাকতিস, বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর ঘর, সেই ঘরটাই তোর থাকল। কোনো অসুবিধে হবে না তোর আর যদি কখনো হয় তাহলে আমরা তো থাকলাম। ফুফু কিছুতেই কোনো দাবির কথা বলতে পারছিলেন না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু একটা কথাই বলে যাচ্ছিলেন, এসব কিছুই আমার লাগবে না, তোমরা আমাকে খেতে পরতেও দিয়ো না। শুধু ছেলেগুলোকে কেড়ে নিও না। মেজভাই, বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে, কে খেতে দেবে ওদের, জ্বরজ্বারি হলে কে একটু মাথায় পানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে দেবে। ওদের মায়েরা যে কিছুই জানে না, ছেলেমেয়েরাও কোনোদিন মায়ের কাছে যায় না। ও মেজভাই, সকালবেলায় দরমা থেকে মুরগির মতন করে আমি খাইয়ে তবে ওদের বাড়ি থেকে বেরুতে দিই। এক মায়ের পেটের বুনের ছেলে নবীনেওয়াজ কোন ছোটবেলায় বাপ-চাচার কাছে ফিরে গিয়েছে, আলমও এখন কাছে নাই।

কোনো কথায় কাজ হলো না। সংসার ভাগ হয়ে গেল। ফুফু একা হয়ে গেল। আমি তখনকার কথা এখন মনে করে বলছি : মায়ের চাইতে ফুফুকে আমি বেশি ভালোবাসতাম। সবার সামনে আমি কেমন করে কাঁদব? একা থাকলে কাঁদতাম—বাড়ির পেছনের দেয়াল ধরে কাঁদতাম। দু-একবার এরকম ধরাও পড়ে গিয়েছি। মা দেখে ফেললে ফুফুকে ডেকে এনে চোখভরা পানি নিয়ে বলতেন, দ্যাখো বুবু, আড়ালে-আবডালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলে কেমন কাঁদছে। ফুফু কাছে এসে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলতেন, কেঁদো না বাপ, বড়ো-ফুফু মরেছে বলে আমি তো আর মরে যাচ্ছি না।

নতুন বাড়িতে গিয়ে সময়টা যে একটু ভালো হলো তা কিন্তু মোটেই নয়। পুরনো বাড়িটা একটু অন্তত গোছানো ছিল, তিনবার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, পরে সেটা উল্টাপাল্টা হয়ে গেলেও একেবারে ব্যবস্থাটা যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা নয়, বরং এই নতুন বাড়িতে কোনো কিছুরই ঠিক নেই। মা চিরকাল বাড়ির গিন্নিদের হুকুম তামিল করে এসেছে, এখানে সে নিজেই গিন্নি, কী করবে, কাকে কী বলবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। সকালবেলার নিয়মমাফিক মেয়েলি কান্নাটাও আজকাল একটু ঘন ঘন হতে লাগল।

গাঁ-ঘরে এই এক আশ্চর্য ঘটনা। এক মাস-দেড় মাস পরে পরে গাঁয়ের বউদের—যে বয়েসেরই হোক—একবার করে ঘণ্টাদুয়েক কাঁদতেই হবে। একেবারে নিয়মমাফিক। কেন কান্না সে কথা কেউ জিজ্ঞেসও করবে না, সে নিজেও বলবে না। বাড়ির পুরুষরাও কোনো কথা বলবে না। কবেকার কোন শোক বুকের মধ্যে পাথরের মতো জমে আছে—হয়তো মাঝবয়েসী কোনো বউয়ের বিশ বছর আগে একটা মরা ছেলে জন্ম নিয়েছিল, হতে পারে সেই শোকটাই। হয়তো মায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনকালের মৃত্যু, ভাইবোনের মৃত্যু কিংবা শিশুবয়সেই চলে যাওয়া কোনো সন্তানের শোক—এরকম যে কোনো ঘটনা হতে পারে। কিংবা হয়তো তেমন কিছুই নয়—কোনো বিশেষ ঘটনা নয়—কতকাল সংসার করছে, কেন আজও বেঁচে আছে, মরে যায়নি! হয়তো শুধু সংসারের ছাইপাঁশ ভিতরে গাদা হয়ে আছে—সেটাকে কেঁদে বের করে দিয়ে একটু হালকা হওয়া। মা-চাচিদের সবাইকে এরকম কাঁদতে দেখেছি, কিন্তু ফুফুকে কোনোদিন নয়।

এই কান্নাটাকে সবাই সমীহ করে। কেউ কোনোরকম বাধাও দেয় না, সান্ত্বনাও দেয় না। কাঁদছে কাঁদুক। মা যেদিন কাঁদবে সেদিন ভোর বেলা থেকেই বুঝতে পারা যেত। তার ভারি গোলমুখ আরো ভারি। কাজকর্ম সবই করছে কিন্তু কারো সঙ্গে একটিও কথা বলছে না। বেলা একটু গড়ালে গুন গুন শব্দ শোনা যাচ্ছে—তারপর একটু জোরে হুঁ হুঁ হুঁ আওয়াজ, তারপর গলা ছেড়ে কান্না—শুধুই কান্না। মোটা গলায় জোরে টানা কান্না। কাজ যেটা করছিল, হয়তো মুড়ি ভাজছিল, সেটা কিন্তু ছাড়েনি। এই কান্না শেষ হতো—সময়মতো কেউ একজন এসে, হয়তো ফুফুই এসে মুখে কবার পানি ছিটিয়ে দিত—মুখটা একটু ধুয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দিত, তারপর কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস পানি মুখের সামনে ধরে খাইয়ে দিত।

এই হলো পুরোপুরি বিবরণ। এ বাড়িতে মা একা। দু-তিন মাস পরে পরে হলেও মুখে পানিটা ধরে কে। বাবার কথা ওঠেই না। এই সব মেয়েলি কাজের মধ্যে তিনি নেই—কেউই থাকে না।

নতুন বাড়িতে বিয়ের পর জানু এই বাড়িতেই অনেক দিন ছিল। বছরখানেক পরে তার মেয়ে হাসির জন্ম হলো আমাদেরই বাড়িতে। মনে হয় একান্ন-বায়ান্ন সালের দিকে দুলাভাই যশোর এম.এম. কলেজে চাকরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত জানু নতুন বাড়িতেই ছিল। দুলাভাই ইংরেজির প্রফেসর; এম.এ. পাস, এ গাঁয়ে তো বটেই, এ অঞ্চলেই তাঁর সম্মান। কিন্তু তাতেই তো আর সুসময় ফিরে আসে না। গ্রীষ্মের বা শরতের লম্বা ছুটিতে তিনি এখানেই থাকতেন। তখন কী যে গ্লানির মধ্যে এক একটা দিন কাটে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বাড়িতে জামাইয়ের সাত খুন মাফ। বাবাও সেখানে আলাদা নন। তিনি লম্বা সময় থাকায় আমাদের দিনের দিনের জীবনে টান পড়ছিল। কিন্তু বাড়ি আনন্দে মশগুল। তিনি এলে বন্দুক নিয়ে আমাদের সাথে শিকারে বেরুতেন। গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান ছেলেরা সঙ্গে থাকত। স্কুলের ছেলেরা ভয় করত তাঁকে, খুব সমীহও করত। বাপরে ইংরেজিতে এম.এ.! দূর দূর মাঠে, এক গাঁ পেরিয়ে অন্য গাঁয়ের অচেনা মাঠে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই আমরা—যদি পুকুরে বালিহাঁস নামে, যদি বিরাট বড়ো বটগাছটাতে হরিয়ালের ঝাঁক ডালপালার ফাঁকে নড়েচড়ে বেড়ায়। তাছাড়া ধানের জমিতে, মাঠের আধশুকনো পুকুরে দু-একটা শামখোল, মানিকজোড় বা কাস্তেচোরা থাকে! এতদিন বন্দুকে হাত দেওয়ার কোনো অনুমতি আমার ছিল না। একদিন দুলাভাই নিজেই বন্দুকটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, একটা ফায়ার করবে? আমি সাগ্রহে রাজি হয়ে গেলাম আর জীবনে প্রথম ঘটল মনে ভীষণ দাগ-কাটা একটা খুনের ঘটনা। গুলতি দিয়ে পাখি দু-একটা আমি আগেই মেরেছি। তাতে আমার কিছুই মনে হয়নি।

মোড়লপুকুরে একটা জামগাছের ডালে বসা ছিল এক বাঁশপাতা পাখি। তার আসল নাম জানি না। খুব চেনা, খুব দেখা যেত এই পাখিটা। সবুজ গায়ের রঙ—হালকা, লেজ-ঝোলানো চমৎকার দেখতে এই পাখিটা—বাঁশপাতা নাম সার্থক। দুই চোখের ওপর কালো কাজল দিয়ে আর একজোড়া চোখ আঁকা। এই যে এই পাখিটাকেই এই এমনি করে, না, বন্দুক বগলে নয়, কুঁদোর পেছনটা রাখবে কাঁধে, ফায়ার করার আগে ঘোড়া তুলবে না। লক্ষ্য স্থির হয়ে গেলে ঘোড়া তুলবে, আর একবার বন্দুকের মাছিটা ঠিক পাখি-সই করে নেবে, তারপরেই ট্রিগার টানবে। তাই করা গেল। প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছররাগুলো বেরিয়ে গেল—পাখিটা দুটো বাঁশপাতার মতো পাখা মেলে মাটিতে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখেছিলাম, তার চোখদুটো বোজা—কাজলে আঁকা বড়ো বড়ো চোখদুটো দেখা যাচ্ছে। জীবনে এত খারাপ কাজ কমই করেছি!

এই দিনগুলির কথা মনে করতে চাই না। জামাইয়ের সকালে রাতে লুচির সঙ্গে খাবার জন্য গুনে গুনে চারটে রসগোল্লা কেনা হতো ময়রার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকান থেকে। দুঃখ নেই, কারণ তাদের চারটের বেশি রসগোল্লাই নেই বিক্রির জন্যে। অতি সামান্য ডালডা আর ময়দা থাকত বাড়িতে আর এক ছটাক ছানা বা এক কাপ দুধ ঘন-করা ক্ষীর।

আর এই দিননামা বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি যে উড়ে বেড়াতাম বই পড়ার নেশায় আর ক্ষিধেয়—সে কার জন্যে? আমারই মতো ক্ষিধে যার, বড়ো বোন জানুর। ওর বিয়ে হয়ে গেলে বিয়ের পরেও সে অনেক দিন এই বাড়িতেই ছিল বটে কিন্তু আমার দুই ডানাই ভেঙে গেল। ঠিক সেই 'মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই'। যখন তার বিয়ে হয়নি—বর্ধমানে মামা-চাচার বাড়িতে ভীষণ মন খারাপ করায় সে যখন বর্ধমানের বিখ্যাত গার্লস স্কুল ছেড়ে বাড়ি চলে এল তখনো সময়টা তত খারাপ ছিল না। দিনগুলো ছিল সোনায় মোড়া, রাতগুলি গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ। এর কারণ একটাই—যেমন ক্ষিধে তেমনিই চমৎকার ভোজ্য। তক্কে তক্কে থাকতে হতো—কোথায় বই আছে, কার কাছে আছে, কী বই আছে। বাবা এই সময়ে আবার একটি কঠিন বই কিনে জানুকে দিলেন, 'মেঘনাদবধ কাব্য'। আমি বই আনি পাটনা থেকে। মুরাতিপুর থেকে 'বিষাদ-সিন্ধু', আর সেই 'পলাতকা' নামের বইটা যার নাম ছাড়া এখন আর কিছুই মনে পড়ে না। ক্ষীরগ্রামে বই থাকতো তারকদার কাছে—পুইনি পলাশিতেও বই ছিল কয়েকজনের। এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার, অন্য কোনো জিনিশই তোমাকে সহজে দেবে না কিন্তু বই দিতে কেউ তেমন আপত্তি করবে না। এমনকি একবার দিয়ে ফেললে ফেরত চাইতেও ভুলে যাবে। আরো একটা ব্যাপার এই সময়ে চালু হয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত সব বইয়ের একটা করে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মনে হয় 'পথের পাঁচালী'-র প্রথম অংশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' বেরনোর পরে এটা চালু হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'দত্তা', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি'-র এইরকম সব সংস্করণ আমরা ভাইবোনে পড়ে ফেলি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোও এই ধরনের সংস্করণে প্রথম পড়া হয়েছিল। মনে হয়, এতে আমাদের লাভই হয়েছিল। ভাষার ধাঁচটা মূল লেখকেরই মতো। পরে এই সব লেখা যখন মূলে পড়ি, তখন খুব একটা ফাঁকিতে পড়ে গিয়েছিলাম তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখারই এরকম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করার বোধহয় অনুমতি ছিল না, কারো সাহস হয়নি। সময়টা যতই খারাপ যাক, এভাবে পড়তে যখন পারছি তখন এক একটি দিনকে কেন নিটোল মনে হবে না? অনেক বাজে বইও তখন নিশ্চয়ই পড়েছিলাম আর নিশ্চয়ই তখন সেগুলোকে বাজে বলে চিনতে পারিনি, তবে সামাজিক উপন্যাস পড়তে যে একটুও ভালো লাগত না তা ঠিক। বিচ্ছিরি সব গ্রাম্য কথা শিখে ফেলেছিলাম। অমুকের সঙ্গে অমুক (কোনো একটি মেয়ে কিংবা বিধবা) 'আছে' বা 'ছিল' এমনি সব নোংরা কথা। তবে সেই বয়সে এ সমস্ত বইকে আমি সাহিত্য বলেই মনে করতাম। হেমেন্দ্রকুমার রায়, সব্যসাচী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র আর প্রভাবতী দেবী সরস্বতী—সবই শিকার কাহিনী আর অভিযানের গল্প লিখেছিলেন। ইয়েতির কথা পড়ে কী যে ভালো লেগেছিল! আর হ্যাঁ, সাহিত্যিক হচ্ছেন দস্যু মোহন সিরিজের লেখক শশধর দত্ত আর পৃথিবীর সেরা ডিটেকটিভ বই হচ্ছে পাঁচকড়ি দে-র 'মায়াবী', 'মায়াবিনী', 'নীলবসনা সুন্দরী'।

যাই হোক এত ফিরিস্তির দরকার নেই। ছাইপাঁশ সবই পড়া হয়েছিল। এর মধ্যে তিনটে দিনের কথা বলতে ইচ্ছে করছে। প্রথমটার কথা আগে বলি। সকাল ন-টা থেকে সন্ধে ছ-টা পর্যন্ত। গরমের দিন। খুব লম্বা। বিকেল ছটার সময়ও একটা লাল রোদ ঝিকমিক করছে। আগের দিন দুপুরবেলায় কলেরার ইনজেকশন নেওয়া হয়েছিল। রাতে জ্বর এসেছে, সকালেও জ্বর রয়েছে, ভোরে পেয়েছি একটা লাল কুকুরের বাচ্চা, তাকে পোষা হবে। নিমতলায় বেঁধে রাখা হয়েছে—কুঁই কুঁই করছে বাচ্চাটা। আমার হাতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনী'। পড়তে শুরু করেছি সকাল নটায়, গায়ে জ্বর, গরম নিঃশ্বাস। কোঠাঘরের এক কোণে বসে পড়ছি।

কে বলেছে বই সোনায় মোড়া হয় না! কে বলেছে বইয়ের পাতায় হিরে মানিক মুক্তো ঝলমল করে না? এ কেমন গল্প, এ কেমন ভাষা? গায়েব গায়েবি দিয়ে শুরু, শিলাদিত্যের রানী সূক্ষ্ম বস্ত্রের উপর সোনার সুতোয় নকশা আঁকছেন রাজার জন্য—আঙুলে সুঁচ ফুটে গেল রানীর। এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল আঙুলের মাথা থেকে, তাড়াতাড়িতে ধুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে সেই এক ফোঁটা রক্ত ফিকে হয়ে ছড়িয়ে গেল গোটা কাপড় জুড়ে। শিলাদিত্য, বাপ্পাদিত্য, হাম্বীর—রাজস্থানের এইসব বীর রাজাদের গল্প। বইটা শেষ করে যখন বন্ধ করলাম, চারিদিকে বিকেলের আলো সোনার মতোই ঝরে পড়ছে পৃথিবীতে।

সময়কে কি আর টানা সুদিন আর টানা দুর্দিনে ভাগ যায়? তা যায় না। সময়টাকে আমি খারাপই বলেছি, তবু এর মধ্যেই সামনে এক মহাভোজের আয়োজন এসে হাজির হলো। আমাদের ফুফাত আলম ভাইয়ের বড়ো ভাই কচি ভাইয়ের বিয়ে এসে গেল। সেই সময়ে আত্মীয়তার খুব জোর ছিল। যে কোনো উৎসবে অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে জুটতে হবে। যে যেখানেই থাকুক। এর এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। কেউ না এলে খুব নিন্দার কথা হতো। সেই জন্যে আমাদের বাড়ির সবাই বিয়েতে যোগ দিল। আমি তো আছিই ফুফুর আঁচলতলায়। সে এক এলাহী কাণ্ড।

কিন্তু মহাভোজের আয়োজন সেটা নয়। বর্ধমান শহরের কাছে গাংপুর, শক্তিগড় ছোট ছোট দুটো স্টেশন পেরিয়ে পালসীট গ্রামে কচি ভাইয়ের বিয়ে। খুব সুন্দরী একটি বউ এলেন। সেটা কথা নয়, তবে সেটাই কথা হবার কথা। আসলে বউয়ের সঙ্গে এল বউয়ের বাপের বাড়ির বইয়ের সংগ্রহ। বইও ঠিক নয়। সেই সময়ের বিখ্যাত সব পত্রিকার বছরওয়ারি বাঁধাই ঢাউস এক একটা সংগ্রহ। কী কী পত্রিকা ছিল এবার জানাই : 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'বসুমতী'—প্রত্যেকটি পত্রিকার টানা এক বছরের বাঁধাই-করা সংগ্রহ। 'ভারতবর্ষ'-এর কয়েক বছরের সংগ্রহ, এমনি 'প্রবাসী'র সংগ্রহ, 'বিচিত্রা'র সংগ্রহ। এক বছরের একটা সংগ্রহের ওজন তিন-চার কেজি। কচি ভাইদের বাড়ি থেকেই আনি, আলম ভাই বা জানু গুছিয়ে রেখে দেয়— ফেরত দেওয়ার কথাই নেই।

এই শুরু হলো আমাদের সত্যিকারের পড়া। সব লেখাই ঐ সময়ের। নতুন পুরনো সব লেখক একসঙ্গে লিখছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের নতুন লেখা তখন আর নেই অবশ্য। আমরা যে সংগ্রহ পেয়েছিলাম তার বেশির ভাগই তাঁদের মৃত্যুর পর ছাপা। তথ্য যা দিচ্ছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে কিছু কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। স্মৃতির সিন্দুকে গাদা গাদা জিনিশ হয়তো ঠেসে রাখা যায়, কিন্তু সেগুলো থেকে ভালো জিনিশ চিনে চিনে বের করা অত সহজ নয়। সেই সময়কার বিখ্যাত এই সব পত্রিকা থেকে বিপুল সম্পত্তি পেয়েছি বলে তখন হয়তো মনে হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে অনেক মেকি হিরে মুক্তো যে থেকে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের লেখা তখন আর থাকার কথা নয় অবশ্য, তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কি তেমন ছিল? হ্যাঁ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা যথেষ্টই ছিল, তারাশঙ্করের লেখাও ছিল বটে কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কি বেশি একটা দেখেছি? বোধহয় না। তখনকার লেখকদের মধ্যে যাঁরা বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন— অমৃতলাল বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু—এঁদের কিছু কিছু লেখা মনে পড়ে। কিন্তু অনেক বেশি মনে পড়ে এমন সব লেখা যেগুলির লেখকের নাম পর্যন্ত এখন মনে নেই। 'ক্রমশ' দিয়ে দিয়ে ছাপা একটা দীর্ঘ কাহিনীর নাম এখনো মনে আছে—নারীদস্যু সোনিয়া শার্লিং—কিন্তু তার লেখকের নাম তো মনে নেই-ই, কাহিনীরও কিছু মনে পড়ে না। অথচ স্পষ্ট মনে আছে দুর্ভিক্ষের একটা গল্প। এমনকি সেই গল্পের দুটি হাতে-আঁকা ছবিও মনে রয়েছে, গল্পটা তো মনে আছেই। শুধু মনে পড়ে না এই গল্পের লেখকের নাম। মফস্বলের এক নির্জন স্টেশনে নেমেছেন সেখানকার স্কুলে মাস্টারি করতে আসা এক ভদ্রলোক। একমাত্র স্টেশন মাস্টার ছাড়া আর একজন মানুষের সঙ্গেও তাঁর দেখা হলো না। প্রবাসী-বাঙালি স্টেশন মাস্টার স্কুলের নতুন মাস্টারবাবুকে বললেন, এসেছেন তো, টিকতে পারেন কিনা দেখুন।

সেদিন রাতেই জনশূন্য লোকালয়ের এক বাড়ির একটি ঘরে খস খস আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক জেগে উঠলেন। কে কে—বলে চেঁচিয়ে উঠে বালিশের পাশে রাখা দেশলাই বাক্স হাতে নিয়ে ফস করে একটি কাঠি জ্বালিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একজন স্ত্রীলোক। শতছিন্ন শাড়ির ছেঁড়া আঁচলে ঘোমটা দেবার চেষ্টা করে সেই প্রেতিনী মেয়েটি বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল, আমি তো শুধু দেশলাই খুঁজতে এসেছিনু। মেয়েটির হাতে-আঁকা ছবি ছিল পত্রিকায় কিন্তু এই মেয়েটির চেহারার বর্ণনা লেখক কী ভাষায় দিয়েছিলেন মনে নেই। আমার মেয়েটির চেহারা মনে রয়েছে, তবে এখন সেটা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। তার ধারণা পেতে গেলে ঐ ছবিটাই দেখতে হবে। পরের দিনই ফিরতি ট্রেনে শহুরে মাস্টারমশাই চালে যাচ্ছেন, তাঁর বগলে ছাতা, ছুঁচলো মুখটা ওপর দিকে তোলা—কী মশাই, টিকতে পারলেন না? কী ছিল মাস্টারমশাইয়ের মুখের চেহারায় সেটাও ভাষায় বর্ণনা করার উপায় নেই। করাল দুর্ভিক্ষের গল্প আর ছিল 'কুম্ভমেলা'। মনে হচ্ছে 'কালকূট' নামে সমরেশ বসুর লেখা 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'ও তখন মাস কিস্তিতে প্রকাশিত হচ্ছিল।

কি বিচিত্র এই সম্ভার! কতকাল সম্ভোগ করেছি এই সম্পদ। মূল্য হয়তো তার তেমন কিছুই ছিল না কিন্তু স্মৃতিতে যে তা অমূল্য হয়ে রয়েছে! প্রায় একই সময়ে ক্লাসে পড়াচ্ছেন শিবরাম মাস্টারমশাই। স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা কম—ক্লাস ফাইভে শিবরামবাবু ছাড়া শিক্ষক পেয়েছিলাম আর দুজন বা তিনজন—সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই, গেম-টিচার মণীন্দ্রবাবু—কই আর তেমন কোনো নাম মনে পড়ছে না। শিবরামবাবু পড়াতেন বাংলা ইংরেজি আর র‍্যাপিড রিডার, উপনিষদের গল্প, ঈশপের গল্প আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে কী একটা ছোট বই। মণীন্দ্রবাবু পড়াতেন অঙ্ক। বাংলা বইটার নাম 'বাণী বিতান' (প্রথম ভাগ)। তাতে বেশ মজার মজার গল্প ছিল। খুব আনন্দে শিবরামবাবুর ক্লাস করতাম। আবেগে ভরা তীব্র কণ্ঠ তাঁর। প্রাণ নিয়ে গল্প, নচিকেতার গল্প, সাবিত্রী আর সত্যবানের গল্প। তিনি নিজে বোধহয় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ—'ছিলেম খাঁচায় এখন বসেছি দাঁড়ে, পায়ের শেকল কাটল না।' এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যে চিরকালের জন্যে কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। শরীরের নানা ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গল্পটাও এমন করে করতেন যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। চোখ, কান, স্পর্শ, স্বাদ শরীরকে শিক্ষা দেবার জন্যে কিছুদিন ছুটি নিয়ে শরীর থেকে চলে গেল আর দিনকতক পরে ফিরে এসে শরীরকে জিজ্ঞেস করল তার অভাবে কতটা অসুবিধে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল? কান চলে গেলে বা চোখ চলে গেলে শরীরের অল্পবিস্তর মুশকিল তো হতোই। তবে সে আর তেমন কী? শেষ পর্যন্ত সকলের পরীক্ষা নেওয়া শেষ হলে একদিন প্রাণ বলল, তাহলে আমিও দিনকতক একটু ঘুরে আসি। কিন্তু প্রাণ শরীর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ নিতেই সব ইন্দ্রিয় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ও ভাই প্রাণ, তুমি শরীর ছেড়ে একদণ্ডের জন্যেও যেও না। তাহলে আমরা সবাই একসঙ্গে মারা পড়ব। এ গল্পটাও শিবরামবাবু বলতেন ভারি চমৎকার করে। আর নচিকেতা ও যমের গল্পটার তো কথাই নেই! নচিকেতা বার বার যমকে বলছে, বাবা আমাকে যজ্ঞ শেষে তোমাকে দিয়েছেন। আমাকে নিতেই হবে তোমার। যমও বারে বারে বলছেন, বাবা বিরক্ত হয়ে রাগ করে তোমাকে এ কথা বলেছেন। কোনো বাবাই তার সন্তানকে যমের হাতে দেয় না। যম তেমন করে নেয়ও না। তবু নচিকেতা যমের পিছু পিছু হাঁটছেন—যম বার বার তাকে বলছেন, নচিকেতা ফিরে যাও। বেঁচে থাকা কোনো মানুষ যমের বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না।

কদিনই বা পড়েছি শিবরামবাবুর কাছে? ফাইভ, সিক্স আর সেভেন। মনে হয় তখনই অনেক কিছুতে দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে। ক্লাস সিক্সে 'বাণী বিতান' বই বাদ দিয়ে পাঠ্য হলো 'সাহিত্য-সন্দর্ভ'। তাতে ছিল এক আঙুল হারানো রাজার কথা, যিনি তাঁর মন্ত্রীকে কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলেন তাঁকে এই অপ্রিয় কথা বলার জন্য যে, রাজা আঙুল হারিয়েছেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভালো কিছু আছে। এর কিছুকাল পরে রাজা ঘটনাক্রমে ডাকাতদের হাতে আটক হলেন। তারা তাঁকে বলির উদ্দেশে খড়্গ তোলার সময় লক্ষ করল রাজার হাতের একটা আঙুল নেই। কোনো খুঁত থাকলে তাকে আর বলি দেওয়া যায় না। রাজা ছাড়া পেলেন, মর্মে মর্মে মন্ত্রীর কথা সত্য বলে বুঝতে পারলেন আর বাড়ি ফিরে মন্ত্রীকে মুক্তি দিলেন। আরো ছিল হজরত মোহাম্মদ (সা) বিষয়ক সুন্দর গল্পটা। কাঠুরে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে এলে তিনি তাকে ভিক্ষা না দিয়ে তার কাছে সবচেয়ে দামি যে জিনিশটা আছে, সেটা আনতে বললেন। কাঠুরে তার একমাত্র সম্বল একখানি কাঁসার থালা তাঁর কাছে নিয়ে এল। তিনি সেটা নিয়ে তাকে একটা টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন আর বললেন টাকাটা দিয়ে একটু কুড়ুল কিনতে আর সেটা নিয়ে সে প্রত্যেকদিন জঙ্গলে যাবে, কাঠ কাটবে, সেই কাঠ বিক্রি করে স্ত্রী ছেলে-মেয়েকে খাওয়াবে আর যেমন করে হোক প্রতিদিন এক আনা করে জমাবে। ষোলো আনা জমানো হলে তাঁর টাকাটা শোধ করে থালাটা ফেরত নিয়ে যাবে। ষোলো দিন পরে সে থালাটা ফিরে পেল, কুড়ুলটা তার নিজের হলো। একসময় সে সচ্ছল হয়ে উঠল। সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শিখেছে। আর একটা হজরত উমর (রা)-এর দয়ার গল্প। তিনি প্রতি রাতে নিজের চোখে তাঁর প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্যে ছদ্মবেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। একদিন দেখলেন, এক বিধবা মহিলা তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে উনুনে কী একটা রান্না করছেন আর মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের বলছেন, বাছারা আর একটু অপেক্ষা করো—রান্না হয়ে গেলেই তোমাদের খেতে দেব। কিন্তু রান্না আর হচ্ছে না! আড়াল থেকে দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য রাখতে না পেরে খলিফা উমর ওদের সামনে হাজির হয়ে বললেন, মা, তুমি কি রান্না করছো? খিদেয় ছেলেমেয়েগুলো কাঁদছে। এত দেরি হচ্ছে কেন? বিধবা বাষ্পাকুলিত নয়নে, ওঁর দিকে চেয়ে বলল, বাবা, রান্না কি কিছু হচ্ছে যে শেষ হবে! ওদের ভোলাবার জন্যে শুধু জলই ফোটাচ্ছি। হাঁড়িতে কিছুই নেই। এ কথা শুনে হজরত উমর একটুও দেরি না করে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে ময়দার একটা বস্তা কাঁধে নিয়ে আবার পথে নামলেন। লেখা থেকে আমার মনে যে ছবিটা তৈরি হয়েছিল ঠিক তেমনিই আমার চোখে আজও লেগে আছে। ময়দার বস্তার ভারে হজরত উমরের পিঠ বেঁকে গিয়েছে আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি। এগুলো সব পাঠ্য গল্প, কেন যে আজও এত মনে থাকবে জানি না। পরীক্ষার জন্যে বেশ কবার পড়তে হয়েছিল আমাদের মনে আছে কিন্তু আমি নিজে বিনা দরকারে কতবার যে পড়েছিলাম মনে পড়ে না। ফাইভ সিক্সে গল্প-পদ্য যা ছিল প্রায় সবই মনে আছে—তবে গদ্যই মনে আছে বেশি—লেড (লিড) পেনসিল যে সিসে দিয়ে তৈরি নয়, একরকম গ্রাফাইট পাথর গুঁড়ো করে তৈরি তা জানা হলো—জগদানন্দ রায়ের লেখা পৃথিবীর প্রাচীন যুগের জীবজন্তু নামের লেখা থেকে ডাইনোসরদের সম্বন্ধে জানা গেল। জানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল পৃথিবীতে প্রাণী জন্মায় আর মরে আর এক একরকম জানোয়ার এমন মরা মরে যে আর কোনোদিন জন্মায় না।

ক্লাস সিক্সে এসে আরো দুজন শিক্ষক যোগ দিলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু আর কালিকিঙ্করবাবু আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা থাকলেন, বাদ পড়লেন শুধু মণীন্দ্রবাবু। প্রাণকৃষ্ণবাবু ইংরেজি পড়াতেন আমাদের। ভালোই পড়াতেন। ঝড় না একটা কী হয়েছিল, খরগোশ ভাবল পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এই খবর এখন তাকে জনে জনে জানাতে হবে।

মনে হয় তারপর ইংরেজি বই বদলে গেল—প্রাণকৃষ্ণবাবু চলে গেলে তাঁর জায়গায় কালিকিঙ্করবাবু ইংরেজি পড়াতে এলেন। তিনি অনেকগুলি কবিতা পড়িয়েছিলেন, মনে পড়ে গদ্য একেবারেই পড়াননি। কালিকিঙ্করবাবুর বিরাট দেহ, বিরাট গলা, নাটুকে স্বভাব। মারধর করার জন্যে তোড়জোড় বেশি কিন্তু তেমন একটা হাত তুলতেন না কারো গায়ে। জাঁকজমক করে আত্মপ্রশংসা করতে বেশ পছন্দ করতেন। 'মাই মাদার' কিংবা এই রকম নামের একটা কবিতা পাঠ্য ছিল আমাদের। ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে শেষের স্ট্যাঞ্জাটা আবৃত্তি করতেন আর তার মানে বলে দিতেন। একরত্তি অসহায় কচি একটি শিশু, মা ছাড়া একটি মুহূর্ত বেঁচে থাকার উপায় নেই। সেই ছেলে বড়ো হয়ে গেলে মায়ের আর কোন্ কাজে লাগে। অক্ষম বৃদ্ধ মা চলাফেরাও করতে পারে না। ব্যস এইখানে চলে এলেন কালিকিঙ্করবাবু আর উদাত্ত গলায় আবৃত্তি করতেন, আমি—এই যুবক আমি দু বাহু বাড়িয়ে তোমাকে তুলে নেব মা, তুমি আমাকে যা যা করতে বলবে তাই করব আমি। তোমাকে তোমার বিছানায় বসিয়ে দেব, তোমার খাবার একটু একটু করে খাইয়ে দেব—ইত্যাদি। কালিকিঙ্করবাবু আসলে খুব নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি হম্বিতম্বি বেশি করতেন সবচেয়ে বেশি আমার উপর। কারণ যে দুটি বিষয় তিনি পড়াতেন সে বিষয় দুটি ছিল আমার চক্ষুশূল—ইংরেজি আর অঙ্ক। অঙ্কে আমি শুধু কাঁচা নই—আমি কোনোরকম চেষ্টাই করতাম না। তিনি গুরুগম্ভীর গলায় বলতেন, আজিজুল হক গো টু দি বোর্ড।

ইয়েস স্যার?

টেক আপ দি ডাস্টার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়েস স্যার...

আমি চক ডাস্টার নিয়ে বোর্ডের সামনে উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

আর ইউ এ ল্যাম্পপোস্ট।

ইয়েস স্যার।

আমার সাহস একটাই—উনি কারো গায়ে হাত দিতেন না।

একটি চড়ে আমি তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

ইয়েস স্যার।

বফ্!

বলতে চাইতেন 'চুপ', রাগের চোটে হয়ে যাচ্ছিল 'বফ্'—

এবার কাছে এসে দু-হাতে আমার মাথা ধরে দেয়ালের কাছে গিয়ে বলতেন, দেব, তোমার মাথাটা ঠুকে দেব?

আমার বদমায়েশি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, দেন স্যার।

হফ্‌ফ্। এবার তাঁর মুখ দিয়ে কী বেরুল জানি না, উত্তেজনায় থাকা আর তাঁর পোষাল না।

কামবারসাম। এই শব্দটা উনি খুব উচ্চারণ করতেন : cumbersome, তাঁর ইংরেজি ভাষাটা একটু দুর্বল গাল বলে মনে হতো। আর একটা কথা উনি খুব ব্যবহার করতেন : রাস্টিকেট (rusticate) করে দেব। এই শব্দটা ব্যবহার করতেন অন্তত দিনে পঁচিশবার, কেউ তাতে একটুও ভয় করত না (সবাই জানে এ হচ্ছে শরৎকালের মেঘগর্জন)। তবে কালিকিঙ্করবাবু দরদ দিয়ে 'উই আর সেভেন' কবিতাটি পড়াতেন। যে মেয়েটি এক বোনের মৃত্যু সত্ত্বেও বার বার বলত, কবরের মধ্যে যে শুয়ে আছে, তাকে ধরে তারা মোট সাতজন। কবিতাটা পড়াতে গিয়ে কালিকিঙ্করবাবু কেঁদে ফেলতেন। তবে যে কোনো কারণেই হোক, আমাকে তিনি তেমন একটা পছন্দ করতেন না।

এত পড়া আর বইয়ের কথা এতক্ষণ ধরে বলা হলো, এর মধ্যে তেমন করে রবীন্দ্রনাথের নাম করা হয়নি। এই কথাটা আবার কেমন করে বোঝাব জানি না। কেউ আর মুখ ফুটে বলে না যে বেঁচে আছি, তা প্রতি মুহূর্তে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি বলে। পরে আমি ঠিকই বুঝব যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাও একটা সাজানো কথা হয়ে গেল—এভাবে বলে তেমন কিছু বোঝানো যায় না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা!

খুব ছোটবেলা থেকে দেখে আর শুনে আসছি যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সবই অচল। প্রতিদিনের খাওয়া পরার জন্যে বলছি না— আটপৌরে দিনরাতের বাইরে একটু কিছু করতে গেলই রবীন্দ্রনাথকে লাগত, অন্তত যেসব অতি সাধারণ বাড়িতে বই-অক্ষর এই সব থাকত। চার বছরের একটা ছেলে বা মেয়েকে—একটা কবিতা বল তো দেখি— বললেই সে ঠিক হয় রবীন্দ্রনাথ, না হয় নজরুল চালিয়ে দেবে। 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে', 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে' বা নজরুলের 'ভোর হলো, দোর খোলো' বা সেই মদনমোহন তর্কালংকারের 'পাখি সব করে রব' বলবেই। আমাদের এই ধাপধাড়া গোবিন্দপাড়া যবগ্রামে অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠানের তেমন চলন ছিল না। মুসলমানদের দু-চারটি পরব আছে—ঠিক ঠিক বলতে গেলে ঠিক দুটো—ঈদ আর বক্‌রীদ; ঈদে মিলাদুন্নবী, আখেরি চাহার সুম্বা, শবে বরাত, শবে মেরাজ—এই রকম। সবই একদিন কিংবা একরাতের— তবে তাতে উদ্দাম আনন্দ নেই। কুরবানিতে তবু খানিকটা। আর যে অনুষ্ঠান তাতে বাড়াবাড়ি এক রকম নিষেধই—মহররম। মাদার অনুষ্ঠান একটা ছিল বটে, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি বেদায়েত। এছাড়া আকিকা, খতনা ধর্মীয় বিধান হলেও একটু একটু আনন্দ তাতে যোগ হয়ে যেতই। বিয়েতে রায়বেঁশে হতো বটে, কিন্তু হিন্দুরা তা করত না। তবে তাকে তো আর একটুও ধর্মীয় বলা যায় না। 'নবান্ন' হিন্দু মুসলমান সবাই করত বটে তবে সবাইকে ডেকেডুকে নয়। গরিব মুসলমানদের জন্যে তো নয়ই। উঁচু উঁচু মুসলমান তা একটু নিচু চোখেই দেখত। এতে ধর্মীয় অনুমোদন নেই। না থাকলেও দু-চারটি মুসলমান বাড়িতে হতো।

তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে উৎসব অনেক বেশি। প্রত্যেকটার গোড়াতে মোটামুটি ধর্মীয় বিধান। তারপরেই ঐ বিধান-টিধান উধাও। বাকিটা সবটাই মজা, সবটাই আনন্দ, সবটাই উৎসব। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে চারশ মজা পাবার জন্যে অজুহাতের কোনো অভাব নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের পঁচানব্বই ভাগেরই গোড়ায় ধর্ম। কেউ কারো সঙ্গে মারামারি করে না। তবে দেবতাদের মধ্যেও পারিবারিক ঝগড়া ফ্যাসাদ, সিঁড়ির ওপরতলা নিচতলা, হিংসে প্রতিশোধ এসব অনেক আছে বটে, মানুষের মজার দরকার এতই বেশি যে ওসব ঝগড়া নিয়েও নানা উৎসব বা ফুর্তি। টাকা তেমন লাগত বলে তো মনে হতো না, গরিব মানুষ যেমন এসব করত, গেরস্থ কৃষকও তেমনি। মুসলমানরা ধর্ম নিয়ে এত বেশি ফুর্তি করার পথ বার করতে পারত না। তবে উৎসব, ফুর্তি, আনন্দের ফন্দি বার করতে ওস্তাদ ছিল তারা যারা গাঁয়ের ভিতরে বাস করতে না পেরে গাঁগুলোর সীমেনায় সীমেনায় থাকত। ডোম (একেবারে গাঁয়ের বাইরে), হাড়ি-বাগদি (গাঁয়ের সীমেনায়), মুচি বাউরি (গাঁয়ের অন্য কোনো সীমেনায়)। এদের মনে হয় কোনো ফিকিরেরই দরকার হতো না—আধভরা পেট, এক-আধটু নেশা, স্কুলে-টুলে যায় না এই রকম বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলেমেয়েরা থাকলেই যথেষ্ট। প্রত্যেকটা গাছের তলায় দেবতা আছে, তেল-সিঁদুর মাখানো গাছের ওপরেও আছে পোষ্য দত্যি, পেতনি, শাঁকচুন্নি, কঙ্ককাটা। এরা পাড়াতেই থাকে। তারপর মা মনসার বাছারা গোখরো, কেলে, চন্দ্রবোড়া, চিতে এসব তো পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায় গাছতলায় গাছতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর, হোক নিচুজাত—তবু কটা কাজ তো করতে পারে তারা—গান করতে পারে, নাচতে জানে, ঢাকঢোল পিটিয়ে খুব আওয়াজ করতে পারে। বাবারে পারেও বটে! সারা বছর চৌপর ভাত না খেয়ে ভাত-পচিয়ে মদ খেতে পেলেই হলো!

আমি 'প্রভাতরবি' বইটা খুব ছোটবেলায় পেয়ে গিয়েছিলাম। ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের লেখা। মনে হয় প্রথম সংস্করণই পেয়েছিলাম। একেবারেই চটি বই! পরে ১৯৬১ সালে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ দেখেছি। ভাগ্যিস আমি চটি বইটাই পেয়েছিলাম। রবি ঠাকুরের সঙ্গে সেটাই প্রথম প্রেম। মোটা ঢ্যাপসা বই হলে প্রেম সম্ভব হতো বলে মনে হয় না। জোড়াসাঁকোর বিরাট বাড়িতে জানালার ধারে একটি ছেলে বসে থাকে। তার বাইরে যাবার হুকুম নেই। নিচে বটগাছওয়ালা বিরাট পুকুর, হাঁসেরা সকালে আসে, সারাদিন গুগলি খোঁজে, সাঁতার কাটে, পাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাড়ে, পুকুরে সকালের দুপুরের বিকেলের রোদ পড়ে, মেয়ে-পুরুষ চান করতে আসে। কেউ ডুব দিয়েই চলে যায়, কেউ গা রগড়ায়, কেউ দুনিয়ার নোংরা বাঁচিয়ে চলতে এঁকেবেঁকে হাঁটে। বিকেলের ছায়া নামে, হাঁসগুলো পুকুর থেকে দুলতে দুলতে বাড়ির দিকে যায়। পশ্চিম আকাশে প্রথম বড়ো তারাটা ওঠে। খাবারের সময় একটা রুটি দিয়ে তারপর আর একটা রুটি চোখের সামনে দোলাতে দোলাতে ছেলেদের খবরদারি-করা চাকরটা বলে, 'আর লাগবে?' মা নেই, ফুফু নেই, বাবা-কাকাদের খবর নেই। কী আর করা যায়, কাঠের সিংহ বলিদান করা হয়, ঢ্যাম-কুড় কুড় কুটুম আন্দুবোসের কাটুম। আর যদি, আমসত্ত্ব পাতে ফেলি, তাহাতে কদলি দলি—হাপুস-হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথ 'বয়স যখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা। ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।'

বাড়িতে একখানা 'সঞ্চয়িতা' ছিল। এটা আমার বড়ো ভাইয়ের। তিনি বর্ধমানে স্কুলে পড়তেন—বাড়ি এলে দহলিজের ঘরে থাকতেন। সেখানে একটি তক্তপোশ পাতা থাকত। ঘরে সব সময় সিগারেটের গন্ধ। বালিশের পাশে এক আশ্চর্য বই 'সঞ্চয়িতা'। সেই পাতাটা খুঁজে বেড়াই : কালো কালিতে সরু নিবের কাটাকুটি। রাত—স্তব্ধতা, জানালার ধার—আর কোন পৃথিবী? 'রাত্রি যবে হবে অন্ধকার বাতায়নে বসিয়ো তোমার, ফেলে দিয়ো ভোরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি'—তারপর আড়াআড়ি, পাশাপাশি : 'সেই হবে স্পর্শ তব সেই হবে বিদায়ের বাণী।' তারপর বেশি বয়সের রবীন্দ্রনাথের কাঁপা কাঁপা হাতের লেখা : লেখে আর মোছে আলোছায়া তব ভাবনার প্রাঙ্গণে। কী যে বোঝায় এসব কথায় কিছু জানি না। আজও বলতে পারি না যে জানি। কখনোই জানব না তা, কিন্তু কখনো ভুলেও যাব না। কেন? জানি না, তখনো না, এখনো না। দহলিজে দুপুরের ঘর, অন্ধকার, খালি তক্তপোশে ধুলো, বিছানা রাতে হবে। সেই ধুলোয় শুয়ে 'সঞ্চয়িতা'র পাতা ওল্টাচ্ছি, কালো ভ্রমর একটা বোঁ বোঁ শব্দে একবার করে উড়ে কাছে আসছে। বাইরে মাঠ, ভিতরে খামারবাড়ি রোদে পুড়ছে : লেখে আর মোছে আলোছায়া তব ভাবনার প্রাঙ্গণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ো ভাইয়ের অন্তত দু-তিনটে অসম্ভব গুণ ছিল। প্রত্যেকটাকেই তিনি একটু একটু করে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন। এক. অতি চমৎকার গানের গলা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান; দুই. খুব মিষ্টি করে বাঁশের বাঁশি বাজানো; তিন. রবীন্দ্রনাথের ধাঁচেরই সুন্দর হাতের লেখা। কেউ কোথাও নেই, খামার বাড়ি পেরিয়ে বাড়ির ভিতরে যাচ্ছি, কানে এল, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'—সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম, দ্বিতীয় লাইনটা গাইলেন, 'আমি বাইব না, বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে গো'... তারপর আর গাইলেন না, একটু গুন গুন করলেন, তারপর চুপ করে গেলেন।

খুব ছোটবেলা থেকে—হয়তো ছিঁড়ে ফেলতে পারি বলে হাত থেকে বই কেড়ে নিয়েছেন বড়োভাই—'সঞ্চয়িতা' নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, ছুঁয়ে দেখছি, কোলে রেখে দিচ্ছি—অক্ষর চেনা শুরু করতে করতে 'সঞ্চয়িতা'র অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। এখন একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ছে, নয় কি দশ বছর বয়েসে একদিন মনে হয়েছিল, বই তো সব একদম গোড়া থেকে পড়তে শুরু করতে হয়, তাহলে 'সঞ্চয়িতা' একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলি না কেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। এইভাবে 'সঞ্চয়িতা' পড়তে যাওয়াটা যে কতটা ভুল ছিল তার পরিমাপ আমি তখন করতে তো পারিইনি, আজও পারি না। প্রথম পাঁচ-সাতটা কবিতা পর পর পড়লাম। তারপর মনের ওপর জোর খাটাতে লাগলাম। অনিচ্ছুক মনের মধ্যে কিছু ঢোকে না—সব কেমন পিণ্ড পাকিয়ে যায়। মনে হয় তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা পাতা টানা পড়ার পর এই চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। এখন বলছি, চিরকালের জন্যে ছেড়ে দিলাম, রবীন্দ্রনাথের বেলায় তো বটেই, অন্য কবিদের যে কোনো বই সম্বন্ধে ঐ একই কথা। এখনো আমার বদ্ধমূল ধারণা, কোনো কবিতার বই, কবিতাসংগ্রহ ওভাবে পড়তে যাওয়া চলে না। কবিতার বেলায় চলে না—নাটকের বেলা চলে, গল্পের বেলায় চলে, উপন্যাসের বেলায় চলে, মহাকাব্যের বেলাতেও চলবে কিন্তু একালের কবিতা নয়। 'সঞ্চয়িতা' ঐভাবে পড়ায় সেই যে ক্ষান্ত দিয়েছি, এখনো তাই। বইটা সব সময়ে আমার কাছে, টেবিলের উপর, হাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাগালের মধ্যে রয়েছে। সব সময় পড়ছি না, যেমন সব সময় রবীন্দ্রসঙ্গীতও শুনছি না।

এই সময় ফুফাত ভাই আলম ভাই ভাতার স্কুল ছেড়ে দিয়ে আবার আমাদের স্কুলে ভর্তি হলেন। তিনি কচি ভাইয়ের কাছ থেকে উপহার পেলেন একটা কালো শেফার্স পেন, শেফার্স কালি আর দামি সব লেখার কাগজ। তাঁর পড়াশোনা করাটাও আমাদের দেখার শোনার বিষয়। সন্ধেটা তাঁর পিছন ছাড়ি না। আমারও জানা হয়ে গেল তিনি কী পড়েন, কোন কোন বিষয়ে তিনি খুব কাঁচা, কখন তিনি শেফার্স কলমটা বার করবেন বা কালি ভরবেন। সবই দেখার আর শোনার জিনিশ। অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল তিনি ইংরেজিতে আর অঙ্কে খুব কাঁচা। বৈদ্যনাথ দাঁয়ের কাছে তিনি ঐ দুটি বিষয় পড়তে যান। বাড়িতে থাকে তাঁর অন্য সব বই। সব বই পড়তে নেই, অনেক বই আছে যেগুলো পড়া উচিত নয়, কিছু বই আছে যা কম বয়সে মোটেই পড়া উচিত নয়। আমার তখন জ্ঞানগম্যি প্রায় একটুও নেই—যা পাই তাই পড়ি।

মনে হচ্ছে—জোর করে বলতে পারব না—সেই সময় ইংরেজি বাংলা ইতিহাস ভূগোল অন্তত এই চারখানা পাঠ্য বই চার বছরের জন্যে ক্লাস সেভেনেই কিনে ফেলতে হতো। এখন যেমন মাধ্যমিক ক্লাস নাইন টেনের জন্যে কিনতে হয় তেমন নয়। স্কুলের মূল পাঠ্য বইগুলি কেমন হতে হয়, তাদের ছাপা, বাঁধাই, মান কেমন হওয়া উচিত—সেটা আজ পর্যন্ত আমাদের শেখা হয়নি। এসব বিষয়ে শিখতে চরম গুরুত্ব দিতে হলে ব্যক্তির ও জাতির সাংস্কৃতিক মান কতটা উঁচু হতে হয়, সে ধারণাও এখনো আমাদের নেই। আলম ভাইদের বাংলা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার বইটা ছিল অন্তত তিনশ সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার সবচেয়ে দামি কাগজে ছাপা—একেবারে নির্ভুল ছাপা—নীল কাপড়ে বোর্ড বাঁধানো। এই বইয়ের সমস্ত লেখা কতবার যে পড়েছি, তা বলা আজ সম্ভব নয়। আমি নিজে তখন ফোর ফাইভে পড়ি, চারদিকে চরম দুর্দিন—কিন্তু মনের মধ্যে জমা হয়ে গেছে চিরকালের জন্য এক অমৃতের ভাণ্ডার। উত্তর-দুয়োরি ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়ছি বই, দুপুরবেলা হলেও ঘরের মধ্যে আলোর অভাব। উত্তরের একটি দরজা আর একটি মাত্র জানালা আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে আলো আসে কম, ঘরের ভিতরটা আবছায়া, মাটির ঘর ঠাণ্ডা। লুকিয়ে পড়ছি বই। আলম ভাইয়ের চোখে পড়লে, 'ও তোদের পড়ার বই নয়'—বলে কেড়ে নেবে—এদিকে আমি পড়ছি 'গুপ্তধন'। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এই সময়ে র‍্যাপিড রিডার হিশেবে পাঠ্য ছিল। তাতে 'গুপ্তধন' গল্পটা ছিল না। আমার হিশেবে 'গুপ্তধন'ই আমার প্রথম পড়া রবীন্দ্রনাথের গল্প। তখন নিশ্চয়ই দশ বছরের বেশি বয়স হয়নি। 'গুপ্তধন' তেমন সহজ গল্প নয়, তা এখন জানি—'গল্পগুচ্ছের' পাঠ্য সহজ সংস্করণের মধ্যে গল্পটা ছিলও না। তবু এ গল্পটিই আমার কাছে খাঁটি হিরে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের সমালোচনা-তর্ক উঠলেই আমি 'গুপ্তধন'-এর বেলায় তর্জনি তুলে নিজের দুই ঠোঁটে দিয়ে বলি, চুপ থাকো। এক্ষুনি এই গল্পটা আমি আগাগোড়া এখানে তুলে দিতে পারি। হুবহু কিছু বর্ণনা আর সংলাপ আজও ঠিক ঠিক মনে রয়েছে। সোনার পাতে পরিপূর্ণ ঘরটির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় সোনার পাত বিছিয়ে শুয়ে পড়ছে, পাতলা একটা পাত খণ্ড খণ্ড করে চারদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে—পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো রাজা-বাদশাদের কিনে নিচ্ছে—তারপর কঠিন আক্রোশে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধুলোয় পরিণত করে দিতে চাইছে। মাটির পৃথিবীর জন্যে তার হাহাকার—'পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে...তাহাদের বাড়ির পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল।...পাতিহাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে...' এই গল্প যে মরণের মুহূর্ত পর্যন্ত মনে থাকবে!

রবীন্দ্রনাথের লেখা যে কবে প্রথম পড়া, কোনটাই বা তাঁর প্রথম পড়া কবিতা, কবে প্রথম তাঁর ছবি দেখেছি, এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করা বৃথা, আমি জবাব দিতে পারব না। তবে সেটা নিশ্চয়ই আমার পাঁচ-ছ বছর বয়সের মধ্যেই। কোথায় কবে কোন জায়গায় তার হিশেব কে করবে? এজন্যে অনেক সময় এ নিয়ে আমি কোনো কথাই বলি না।

আলম ভাইয়ের ঐ মোটা পাঠ্য বাংলা বইটায় আরো কত কী যে কতবার করে পড়েছি তার অন্ত নেই। 'ভারততীর্থ'ও মনে হচ্ছে ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকলনে ছিল। নবীনচন্দ্র সেনের ঐ যে কবিতাটা—তীরবেঁধা রাজহাঁসের গল্প—যেটাকে তীর দিয়ে শিকার করেছিলেন গৌতম বুদ্ধের খুড়তুতো ভাই—নাম মনে পড়ছে না—সিদ্ধার্থ তাকে যত্ন করে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলেছিলেন। সেটারই দাবি নিয়ে এসেছিল ভাই। সিদ্ধার্থ তাকে রাজহাঁস দেননি। যে জীবন নিয়েছে, তার চেয়ে যে জীবন দিয়েছে তারই দাবি বেশি। সুস্থ রাজহাঁসটি যখন নীল আকাশ পাড়ি দেবার জন্যে পাখা মেলে উড়ল, সেই দৃশ্যটা আজও আমার চোখে ভেসে ওঠে। এই কবিতাটি যে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, শুধু সেই কৃতজ্ঞতায় তিনি বাকি জীবনে যত ভারি ভারি কবিতা লিখেছিলেন তার জন্যে তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।

এই সংকলনে কবিতা আরো অনেকেরই ছিল। তাঁদের কথাও ঠিক ঠিক মনে রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রকুমার সরকার, দেবেন্দ্রনাথ সেন—এই রকম সেই সময়ের প্রায় সব কবিরই কবিতা ছিল। তবে তারপরে আর একজনেরও নেই— জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত— কারো কবিতা ছিল না। সমস্ত স্কুলজীবনে এঁদের একজনেরও নাম শুনিনি। গল্পের প্রবন্ধের হিশেবও প্রায় একই রকম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী— এঁদের সকলের লেখা ছিল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গল্পে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নয়। তবে মনে হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র অপুর পাঠশালা অংশটা ছিল। শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' বা 'রামের সুমতি' ছিল মনে পড়ছে। আর একটা লেখার কথা খুব মনে পড়ছে, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতের বর্ধিতাংশ থেকে ভ্রমণবৃত্তান্ত 'বিলেতের কথা'। প্রতিদিন সন্ধেবেলাতে হারিকেনের বাতিটা একটু উস্কে দিয়ে আলম ভাই কেন যে ঐ লেখাটার একটা কথা একশবার আওড়াতেন জানি না, 'বিলেতের সব চেয়ে আশ্চর্য বিলেতের পুলিশ'। কেন যে এত আশ্চর্য তা আর কখনো জানা হলো না। ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশটা একটা প্যাসেজ হিশেবে ইংরেজি গ্রামার বইটিতেও থাকত বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের জন্যে। 'বিলেতের কথা' লেখাটা দু-বার তিনবার পড়লেই তো হয়। কিন্তু কতবার যে পড়েছি বলতে পারব না। কেন? খুব ভালো লাগত বলে? সে তো অনেক লেখাই বার বার পড়তে ভালো লাগে। এটা যে বাড়তি টান! কেন?

শিবনাথ শাস্ত্রী বিলেতে এক বুড়ির বাড়িতে থাকতেন। সেই বুড়িই তাঁর দেখাশোনা করতেন। ইংরেজ এক বুড়ি—তাঁকে শিবনাথের মনে হতো দেশের বাড়ির দিদিমা বা ঠাকুরমা। সেই খুট খুট করে সারা বাড়িময় চলা, সব সময়েই ঠুকুর ঠুকুর করে কিছু না কিছু করা। ঠিক দেশের মতোই চালভাজা, কলাইভাজা, বড়িভাজা তৈরি করে বয়েমের মধ্যে ভরে রাখা। বড়ো প্রিয় যারা তাদের কাছে বসিয়ে খাওয়ানো আর পুরনো দিনের গল্প বলা। শিবনাথ শাস্ত্রীর বিলেতের বাড়িউলি বুড়ি অবিকল এই রকম—নিজের দিশি নিরক্ষর দিদিমা ঠাকুরমার মতোই। খুব ভালো লাগত এই জায়গাটা পড়তে আর একটা অদ্ভুত কথা : নিচের রাস্তায় কোনো হৈচৈ নেই, শুধু জুতোর মস মস শব্দ। মনে হয় কেউ নেই কোথাও অথচ জানালা খুলে নিচে রাস্তার দিকে দেখা যেত রাস্তায় জনস্রোত—অবিশ্রাম মানুষজন হাঁটছে। ইংরেজের চরিত্র!

এই সময়ের সামান্য কথা, টুকরা-টাকরা স্মৃতি কেন যে এত সাতকাহন করে লিখছি জানি না। ভালো-মন্দ ঐ যে সামান্য কিছু ছোটবেলার পড়ার কথা—কী মূল্য তার, কতটুকু মূল্য—কেন লেখা এত সব? আমি অন্তত বলতে পারব না। তবে এখন একটা কথা মনে হয়—অক্ষর-পরিচয় থেকে শুরু করে ষোলো-সতেরো বছর পর্যন্ত পড়াশোনার আয়োজনটা কি এখনকার চেয়ে আলাদা ছিল না? মানুষ তৈরির কোনো একটা মজাদার গোপন অথচ প্রবল উপায়ের কথা কি তখন ভাবা হতো? ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত পাঠ্য যে সংকলনটির কথা এতক্ষণ ধরে বললাম—সেটা কি একদিক থেকে গোটা বাংলাসাহিত্য—বিশেষ করে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একটা চমৎকার ভূমিকা নয়? সেটা কি শূন্য মাথা থেকে আপনা-আপনি গজিয়েছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই তো কথা তোলার মজাটা ধরে ফেললাম! বাংলা সংকলনের কথা বললাম—ইংরেজি এরকম সংকলন কি ছিল? নিশ্চয়ই ছিল, মনে পড়ছে না। কোনো না কোনো ভাবে ডেভিড কপারফিল্ডের একটা অংশ অবশ্যই পাঠ্য ছিল। উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে শিক্ষার সাধারণ বন্দোবস্ত আর সমাজের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিশুদের অবস্থাটা কেমন ছিল, স্কুলগুলো যে নরকেরই এক একটা সংস্করণ ছিল সেটা বোঝার জন্যে ঐ অংশটাই যথেষ্ট। কপারফিল্ডের শৈশবের গোড়ার দিকটা তো জানতাম না, সে অংশটা পাঠ্য ছিল না—যে অংশটা ছিল তাতে দেখা যাচ্ছে কপারফিল্ডকে স্কুলে পাঠানো হয়েছে। সেখানে আছেন মিসেস পেগোটি (তাঁর কি একটি পা কাঠের?)। এরকম ক্রূর হৃদয়হীন নিষ্ঠুর যে কোনো নারী হতে পারে তা আমার কল্পনাতে আসত না। ছেলেদের শাস্তি দেবার কত যে ভয়ানক ব্যবস্থা ছিল, তা তখন আমাদের মতো দেশেও ভাবা যেত না। নানাভাবে প্রহার, নির্যাতনে শিশুর ভিতরটাকে গুঁড়িয়ে দেবার কত যে অভিনব ব্যবস্থা তা ভেবে ওঠা যায় না। আমি আজও কাঠের পা নিয়ে ঠক ঠক শব্দে ওপর থেকে মিসেস পেগোটি নেমে আসছেন সেই শব্দ শুনতে পাই আর কপারফিল্ডের জন্যে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা : কাগজে বড়ো বড়ো করে 'সাবধান এ কামড়ায়'—লিখে তার পিঠে আটকে দেওয়া—মনে করতে পারি। এই লেখাটা পড়লেই ভীষণ কষ্ট হতো—শরীরের কষ্টই, দু পাশ থেকে চুলটাকে যেন কেউ কষে ধরেছে। অন্যদিকে মন ভালো করার লেখাটা পাশেই—অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের একটা অংশ। ব্যাঙের ছাতার ডান দিক খেলে লম্বা আর বাঁ দিক খেলে ছোট হয়ে যাওয়া। এপাশ-ওপাশ দু-পাশ থেকে খেয়ে অ্যালিস লম্বা হয়, ছোট হয়—একবার এত লম্বা হলো যে সে ভয়ে কাঁদতে শুরু করে—তখন ব্যাঙের ছাতার অন্য দিক খেয়ে সে এতই ছোট হয়ে যায় যে নিজের চোখের পানিতে নিজেরই ডুবে মরার দশা। তারপর সেই কেন্নোর কথাবার্তা—ফরশি হুঁকোর নল মুখে নিয়ে যে একটা বড়োসড়ো ব্যাঙের ছাতার ওপর বসে আছে। মন ভালো না হয়ে কোনো উপায় নেই। চেশায়ার বেড়ালটা একবার দেখা দিচ্ছে আবার সাথে সাথে অদৃশ্য হচ্ছে ইচ্ছেমতো। দাঁত বের করে আবার মিচকি হাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে। অ্যালিস বলছে, ওরকম করছো কেন? হয় থাকো, না হয় চলে যাও। অস্বস্তি হয় আমার। বেড়ালটা ঠিক করে তবে চলেই যাই। এবার সে লেজের দিক থেকে অদৃশ্য হতে থাকে। লেজ, পেছনের দু-পা, পেট, বুক, সামনের দু-পা, মাথা একটু একটু করে অদৃশ্য হলো। কিন্তু মুখের দেঁতো হাসিটা অদৃশ্য হতে একটু সময় লাগে। বেড়াল অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু হাসিটা তারপরও খানিকক্ষণ রয়ে গেল। অ্যালিস ভাবে, হাসি ছাড়া বেড়াল দেখেছি কিন্তু বেড়াল ছাড়া শুধু হাসি জীবনে দেখিনি।

ইংরেজিতে পড়ে তো তখন এসব বোঝার সাধ্যি ছিল না। মানে-বই পড়ে পড়ে বুঝতাম। প্যাসেজ ধরে ধরে টানা সুন্দর অনুবাদ থাকত বাংলায়। তখনকার নোটবইগুলোও অনেক ভালো ছিল। প্রত্যেক শব্দের মানে লেখা থাকত—বাক্যাংশ বুঝিয়ে দেওয়া হতো, ইংরেজিতে সারাংশ লেখা থাকত আর থাকত ব্যাখ্যা সহজ ইংরেজিতে। আশ্চর্য কথা, বাংলা প্যাসেজ অনুবাদের জন্য গ্রামার কম্পোজিশন বইতে যেসব প্যারা দেওয়া থাকত সেগুলো পর্যন্ত পড়তে চমৎকার লাগত। হয়তো কোনো প্রবন্ধের একটা অংশ বা গল্পের অংশ কিংবা বাংলা কোনো বিখ্যাত উপন্যাসের একটা অনুচ্ছেদ। পড়তে পড়তে এগুলোও প্রায় মুখস্থ হয়ে যেত।

এত যে পড়ার কথা বললাম, এসব নিশ্চয়ই আলম ভাইয়ের কাছে মহা দায় বলে মনে হতো। পরীক্ষার দায়। বার বার পরীক্ষা দিচ্ছেন আর ফেল করছেন। এদিকে আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। ইতিহাস বইটা বাংলা সংকলনের চেয়ে বড়—ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা। তখন তো তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এই বইটাও নীল কাপড় দিয়ে বোর্ড বাঁধাই। খুব মজবুত। একটা ছাপার ভুল নেই। ছাপার ভুলটাকে ক্ষমার অযোগ্য গর্হিত অপরাধ বলে মনে না করতে পারলে বই এত নির্ভুল ছাপা হতে পারে না। সন্দেহ নেই যে এই বইটা আমি একটানা পড়িনি। পড়লে বোধহয় সব গোলমাল পাকিয়ে যেত। আমি পড়তাম টুকরো টুকরো করে আমার ইচ্ছেমতো। ভারতবর্ষের মানচিত্র ভূগোল-টুগোল বাদ দিয়ে হয়তো পড়তাম হরপ্পা মহেনজোদারো সিন্ধুসভ্যতার বিবরণ। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরী, খাইবার গিরিবর্ত্ম, সিন্ধু প্রদেশে মহেনজোদারো আর পাঞ্জাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরপ্পা সভ্যতা—আজি হইতে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে—আর্যদের ভারতবর্ষে আগমন—এটা সেটা আপনা-আপনি যোগ হয়ে গিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই একটা ধারণা কী করে তৈরি হয়ে গেল!

লেখাপড়া মানেই ছেঁড়া ছিন্ন টুকরো। নানা টুকরো নানা জায়গায়। রাই কুড়িয়ে বেল করারও উপায় নেই—সব তো রাইসরষে নয়। সেই অনেক দুঃসময়ে, অনেক ছোট বয়সে কীসব অসংলগ্ন এলোমেলো আধপয়সা সিকিপয়সা জোগাড় করেছিলাম পড়ার নামে—কোনো মূল্যই যে তার নেই তা আমি জানি। তবু এতগুলো পাতা ভরে লিখে পাঠকদের যে ক্লান্ত করে তুললাম সেজন্যে একটুও অনুতাপ হচ্ছে না। ভিখিরিও কি তার রত্ন দেখায় না? ঐ যে ভোরবেলায় সকালে দুপুরে বিকেলে আকাশের খবর না রেখেই জানি ভোরে একবার অন্তত আকাশ সিঁদুর-লাল হয়েছিল, দুপুরে অনেকক্ষণ ধরে আকাশ একেবারে একা ছিল। আগুনতপ্ত রোদ নিয়ে। তারপর বিকেলে ছায়া পাঠিয়েছিল পৃথিবীতে, তারার আলোর সঙ্গে অন্ধকার ঘনিয়েছিল—আরো কত কী ঘটেছিল। আমি সেসব কিছুই জানি না, ঘরের কোণের আবছা আলোয় মাটির মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়া, আলম ভাইয়ের হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বইটা মুড়ে ফেলা আর ঐসব গল্প, গল্পের টুকরো, কবিতার লাইন, চাঁছাছোলা গদ্য পড়ার স্মৃতি। সুখ আর জীবন আবার কী? দুঃসময়ও বা কী!

সময়টা তখন জষ্টিমাসের উজ্জ্বলন্ত দুপুরের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে, একবার চোখের পাতাটা পর্যন্ত ফেলে না। এরই মধ্যে শ্রাবণ মাসের শুকনো একটা দিনে জানুর বিয়ে হয়ে গেল। এখানে ঘটার তেমন অভাব ছিল না—পাত্রপক্ষ মনে হয় ঘটাকে একদম বাজে বাহুল্য মনে করেছিল। ছেঁড়া ফাটা পোশাক পরে ফকিরের বেশে বর এল, সঙ্গে যারা এল তারা এল শূন্য পাকস্থলি নিয়ে, তবে তাদের বিপাকযন্ত্র একটুও বিকল নয়।

সব চুকেবুকে গেলে একদিন সন্ধেরাতে বাবারা পাঁচভাই একসঙ্গে বসলেন। বাবা হারিকেনের আলোয় পড়তে বসলেন তাঁর নিজের লেখা এক দলিল। তাঁর সংসারের দলিল, সেই দলিল যেমন রোখালো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনিই তেতো। আমাদের বড়োচাচা—প্রচুর খরচপত্র করা, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়া আর খাওয়ানো আর দরকার পড়লে হাউ হাউ করে কান্না ছাড়া আর তেমন কিছু করতে পারতেন না। নিঃসন্তান ছিলেন, পঞ্চাশ সালে সন্ধের দিকে ভূমিকম্প হবার পর থেমে গেলেও বলছেন, ভূমিকম্প এখনো হচ্ছে। সেই চাচা ডুকরে কাঁদতে শুরু করে দিলেন, সেজ একেবারেই বকলম, তিনি চুপ করে রইলেন। ন'-চাচা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, খাঁটি নুনঝাল স্বাদগন্ধওয়ালা ভালোমানুষ। বাড়ির কর্তার খুব বাধ্য, কোনোদিন তর্কাতর্কি করতে শুনিনি। তাঁর যখন এই দলিল শুনতে শুনতে নেহাৎ অসহ্য লাগছিল অন্যায় দোষারোপের জন্য—তিনি চেঁচামেচি করে উঠছিলেন। ছোটচাচা শুধু শুনে গেলেন।

সংসার আলাদা হয়ে গেল। শ্রাবণ দুপুর দাঁড়িয়েই আছে। এতটুকু গলল না। বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর উত্তর-দুয়োরি ঘরটা ফুফুর ভাগে পড়ল। ফুফু একটানা কেঁদে চলেছে—মায়ের পেটের মধ্যে থেকে শিশু যদি হুঁ হুঁ হুঁ শব্দে কেঁদেই চলে আর সেই কান্না যদি শোনা যায়, ফুফু যেন ঠিক সেই কান্না কাঁদছে। কিন্তু এই কান্নায় কান দেবার সময় নেই ভাইদের। ঠিক হলো এখন বাড়িতে যে যেমন আছে তেমনিই থাকবে। শুধু আমরা চলে যাব নতুন বাড়িতে। সে বাড়িটায় এখনো কেউ থাকে না। বিয়ের পর জামাই যে টানা এক-দেড় মাস এখানে ছিলেন, তাঁদের জন্যে নতুন বাড়িতে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। সকাল দুপুর রাতে তাদের খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হতো। খুব দামি বিস্কুট, টিনের বাদাম, আখরোট, মিষ্টি ছানা এসবের ব্যবস্থা হয়েছিল শুধু মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে। এদিকে বাড়িতে ছুঁচোয় ডন মারছে তিনবেলা।

যাই হোক, এখন জামাই এখানে নেই। আমরা সবাই চলে যাব নতুন বাড়িতে। সেখানে ঘরের অভাব নেই। এই এলাকার বিখ্যাত তেতলা মাটির বাড়ি। নিচের তলাতেই ঘর আছে চারটে। জানুকে নিয়ে আমরা মোট পাঁচজন। বড়োভাই তো পাকিস্তানে ঢাকায় বাকরি করেন। বাবা মা ছোট ভাই আনু আর আমি। এই তো ক-জন মানুষ। পুরনো বাড়িতে ন'-চাচা যে ঘরে থাকতেন, সেখানেই থাকবেন। সেজচাচা বড়োচাচাও তাই, নিজের নিজের ঘরে। তবে বড়ো টিনের ঘরটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালগাছের ঘষায় কোঁ কোঁ আওয়াজ, গরমের দুপুরে জ্যান্ত মানুষের মতো কটকট আওয়াজে হাড়ের গাঁট ছাড়ানোর শব্দ, তারপর গ্রীষ্মকালের অসহ্য গরম। ছোটচাচা ছেলেমেয়ে নিয়ে শহর ছেড়ে এসে এই ঘরটায় আশ্রয় নিলেও এখানে সবসময়ের জন্যে বাস করা অসম্ভব। এরও একটা সমাধান মিলে গেল। আমরা মূল বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা ছোট আর একটা বড়ো দরজাওয়ালা যে ঘরটায় থাকতাম, নতুন বাড়িতে চলে গেলে সেই ঘরটা ফাঁকা হবে। ছোটচাচা ঐ ঘরটায় থাকবেন। দরকারি কথা শেষ হলো, সংসার ভাগ হলো। গরু মোষ গোয়াল জমি সবই টুকরো টুকরো হয়ে পাঁচ ভাই আর তাঁদের বিধবা বোনের কাছে চলে গেল।

এই সমস্ত কাজের কাজ হয়ে গেলে সবাই চুপ করে রইল। দরকারি কথা এখন আর একটিও নেই। মনে পড়ছে, হারিকেনের তেল অনেকক্ষণ ফুরিয়ে এসেছে, আলো কমে আসছে, রাত বাড়ছে আর রাত বাড়ার শব্দ আসছে। টিনের চাল দু-বার কোঁ কোঁ আওয়াজ করল, কয়েকটা প্যাঁচা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একবার ডেকে উঠেই চুপ করে গেল।

বাবা পরে বলেছিলেন তাঁর বড়ো ছেলেটা যখন মারা যায়, তখন তার বয়স ষোল বছর আর তোদের ছোটচাচার বয়স আঠারো কি উনিশ বছর। তার একটা চিঠি পেয়েছিলাম সেই সময়, চিঠিটা আজও আমার কাছে আছে, তাতে লিখেছিল, 'মোজাম্মেল দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাতে কি হইয়াছে, আমিই চিরকাল আপনার বড়ো ছেলে হইয়া থাকিব।' এখন ঐ যে ছোটচাচা ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে আছে। তোদের ফুফু—বাবা খোশমেজাজে থাকার সময় এ কথাটাও বলেছিলেন—যখন বিধবা হলো, তখন তার বয়স সাত বছর, না ন-বছর। তাকে কোলে করে এই বাড়ি আনলাম।

দেখছি, কান্না থামিয়ে ফেলেছে ফুফু। আলো আরো কমে এখন লাল হয়ে এসেছে। বাবাদের পাঁচ ভাইকে এখন আর স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। সময়টা মনে হয় তখুনি এল। বাবা একটু সরে বসে চার ভাইয়ের একসঙ্গে গলা জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, এ আমরা কী করলাম রে—সংসার এত খারাপ! বড়োচাচা আর একবার ডুকরে কেঁদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলেন, অন্য চাচাদের বুকফাটা কান্না কিছুক্ষণ শোনা গেল। তারপর বাবা উঠে গেলেন।

একমাত্র আমাদেরই এ বাড়ি থেকে বাস উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দিনে সেটা কিছুতেই করা যাবে না। এই বাড়ি চিৎকার চেঁচামেচি মারামারি রক্তারক্তি করে ভেঙে গেল—এ কিছুতেই হতে পারে না। আমরা যে বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে চলে যাব তা কাকপক্ষীকেও টের পেতে দেওয়া হবে না। রাতের খাওয়া শেষ করে নিঃশব্দে হাতে হাতে জিনিশপত্র এ বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে নেওয়া শুরু হলো। ছোটখাটো জিনিশ সব নিজেরাই নিয়ে গেলাম। মা পর্যন্ত হাত লাগালেন। বাবা তেমন কিছু করতে গেলেন না, শুধু তদারকি করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দাসীর বড়ো ছেলে জমিরুদ্দি ভাইকে ডাকা হলো। বাক্স প্যাঁটরা যা মাথায় করে নিতে হবে—বড়ো চৌকিটা, মায়ের বিয়ের সময়কার বিরাট বাক্সটা, ভারি হিজ মাস্টার'স ভয়েস গ্রামোফোন এসব নিয়ে মাথায় করে নতুন বাড়িতে রেখে দিয়ে আসা হলো। সন্ধ্যে শেষে রাত তখন ভোরবেলার দিকে ঢলে পড়েছে, এই সময়ে বাবা এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে মোটা বেতের লাঠিটা নিয়ে নতুন বাড়ি চলে এলেন।

আমাদের এই রাঢ় এলাকাতেও মাটির বাড়ির বিস্ময় আমাদের এই বাড়ি। একতলায় পশ্চিম দিকের দুটি ঘরের (মাঝখানে দরজা আর জানালাও আছে) দক্ষিণের ঘরটায় বাবার তক্তপোশ পাতা হলো। গ্রামোফোন বন্দুকের জায়গাও সেখানে হলো। উত্তরের ঘরটায় আনুকে নিয়ে মা থাকবে। পুব দিকের দক্ষিণ দিকের ঘরটা যা খুশি রাখার জায়গা। তখন জানুর বিয়েতে বেঁচে যাওয়া তিন হাঁড়ি মতিচুরের লাড্ডু রাখা ছিল। তাতে আমার খুব সুবিধে কেটেছে কিছুদিন। উত্তর দিকের ঘরটা খাওয়ার ঘর। এই চার ঘরের মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় দক্ষিণ দিকের ঘরে জানু থাকে কচি মেয়ে হাসিকে নিয়ে। উত্তরের ঘরে একা আমি। একটা কাঠের ভাঙা আলমারিতে আমার কুড়িটা বই আছে। পশ্চিমের জানলা দিয়ে রবিশস্যের মাঠ পেরিয়ে দুটো বড়ো দিঘির উঁচু ঘেসো পাড় ডিঙিয়ে এক ক্রোশ দূরের নিগণ রেলস্টেশনের লাল টিনের চাল দেখা যায়। এই ঘরটা এখন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একার। দোতলার পুব দিকের ঘরদুটোর কোনো ব্যবহার নেই। তে-তলারও ব্যবহার নেই। অনেক কলাবাদুড় সেখানে বাস করছিল। তারা বোধহয় আর টিকতে পারবে না।

মাঝখানের সিঁড়িটা পাকা। দক্ষিণের টানা বারান্দাটাও পাকা। চৌকো শালকাঠের খুঁটি। কী নিশ্চিন্ত স্থির এই বাড়ি! বিরাট উঠোন এই বাড়ির দক্ষি-ণ দিকটায়। পুবেও আছে সেই উঠোনের একটা অংশ, সেখানে রান্নাঘর।

এক ঠেঙে তালগাছের মতো শুকনো শ্রাবণ দিন দাঁড়িয়েই রয়েছে। স্কুলে যাওয়া না যাওয়া বৃথা। নতুন হেডমাস্টার আসেননি আজও। সেই যে নকল বি.এ. পাস পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে গাঁয়ের লোক কুলোর বাতাস দিয়ে মহানালা পার করে দিয়ে এসেছিল, তারা নিজের নিজের চাষের কাজেকর্মে ফিরে গেছে। স্কুল চলে কী চলে না। ক্লাস সিক্সে নতুন যে মাস্টার যোগ হলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু, তিনি ইংরেজি পড়াতেন বলেছি। তাঁর ছেলে ফকিরচাঁদ ক্লাস সিক্সে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। সে দেখতে বেশ, একটু তোতলা আর আল্লাদে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো সে একজোড়া জুতো পায়ে দিয়ে ক্লাসে আসত। আমাদের একজনের পায়েও জুতোটুতো ছিল না। ফকিরের জুতোর নামও চমৎকার—'নটি বয়' স্যু। ঐ রকম এক জোড়া জুতোর জন্যে আমার প্রাণ ছেড়ে যেতে লাগল। এদিকে ফকিরের গায়ে আঙুল ঠেকাবার উপায় নেই। ভূমিকম্প হবার সময়ে একটা খরগোশ যে জনে জনে প্রত্যেকটি জন্তুকে জানাতে ছুটল, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—এই ইংরেজি গল্পটা আর পড়ানো শেষ হতে চায় না আর গরিলা সম্বন্ধে সেই লেখাটি : পৃথিবীতে গরিলার মতো বলশালী জন্তু আর নেই—তার সঙ্গে বাঘ-সিংহেরও তুলনা চলে না; আজ পর্যন্ত একটিও পূর্ণবয়স্ক জীবন্ত গরিলা ধরা সম্ভব হয়নি আর সে রাইফেলের নল দাঁত দিয়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে। এই সব গল্প পড়ানো হতো আর ফকিরচাঁদ ছাড়া কাউকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন না প্রাণকৃষ্ণবাবু। ফকিরচাঁদ তোতলাতে তোতলাতে অ্যাঁ অ্যাঁ করে প্রত্যেকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব করত। বোঝাই যেত ফকির আমাদের মধ্যে ফার্স্ট হবেই হবে। একদিন কাঁটারির বুনোদের সরল সিধে বোকাসোকা ছেলেটা কী কারণে যেন নিজের পেনসিলটা টান মেরে কেড়ে নিল ফকিরের হাত থেকে। ফকির বাবার কাছে নালিশ করল। সেদিন প্রাণকৃষ্ণবাবু পাকা কঞ্চির ছড়ি দিয়ে কি মারটাই মেরেছিলেন বুনোদের ছেলেটিকে তা আমার এখনো মনে আছে। তবু এই দুর্দিনের মধ্যেই প্রাণকৃষ্ণবাবু স্কুল থেকে বিদায় নিলেন। আমাদের ইংরেজি পড়ানোর দায়িত্ব এসে পড়ল কালিকিঙ্কর বাবুর ওপর। আমার ফাঁকি উঠল চরমে। ইংরেজি অঙ্ক কিছুই বুঝতে পারি না—বুঝতে কোনো চেষ্টাই করি না। এদিকে বেড়ে উঠল মণীন্দ্রবাবুর উৎপাত। শহীদুল আর তেমন স্কুলে আসছে না। অতিষ্ঠ করে মারছেন মণীন্দ্রবাবু আমাকে—হয় বেতন না হয় স্কুল আসা বন্ধ। এসব জানুর বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল—এখন প্রত্যেকটা ব্যাপার চরমে উঠল। ভাঙা সংসারে বাবাকে দেখছি, ভাঙবে তবু মচকাবে না। স্কুলের বেতন চাইলেই সেই একই রকমভাবে—সে হবে, এখন যা, মণীন্দ্রকে বলিস, বেতন দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে সত্যিই আর স্কুলে যাওয়া চলে না। কিছুই ঠিকঠাক নেই স্কুলের, হেডমাস্টার নেই, প্রাণকৃষ্ণবাবু ছাড়াও আরো দু-একজন মাস্টার স্কুল ছেড়ে দিলেন। আমার পাঠশালার গুরু বলা দেখি ক্লাস সিক্সে আর আসছে না। সময়টা কি এতটাই খারাপ ছিল যে আমরা যে কজন পাঠশালা থেকে পাস করে এসেছিলাম তাদের কেউ আর স্কুলে আসবে না। প্রফুল্ল ক্ষুদিরাম বোধহয় স্কুলে ভর্তিই হয়নি। কুকুরদেঁতো দুকড়িকে দিনকতক ক্লাস ফাইভে দেখেছিলাম, এখন আর আসে না। সুবল স্কুলে ভর্তিই হয়নি, সে তার মামাদের সঙ্গে মাঠের কাজ করে বেড়ায়। শহীদুল আমার মতো স্কুলে ভর্তি হয়েছে ঠিকই, তবে সে-ও দেখছি প্রায়ই কামাই করছে। এখন অঙ্ক আর ইংরেজি দুটোই কালিকিঙ্করবাবুর হাতে। অন্ধকার একানে ক্লাস সিক্সের ঘরে তাঁর হম্বিতম্বি আর সহ্য হয় না। ফকিরচাঁদ বাবার সঙ্গে সঙ্গে এ স্কুলে আসা বন্ধ করেছে। তবে আশ্চর্য একটা কাজের কাজ হয়েছে, বাবার কী খেয়াল হয়েছে, স্কুলের মাইনে দেবার বেলায় নেই, আমার জন্যে হঠাৎ একজোড়া 'নটি বয় স্যু' কিনে এনেছেন। এখন নতুন নিয়ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন বর্ধমান বা কাটোয়া গেলে ফিরবেন সন্ধের ট্রেনে, আটটা সাড়ে আটটার ট্রেনে, শনিবারে নটায়। লাঠি আর হারিকেন হাতে আমাকে যেতে হতো স্টেশনে, সেখানে ভুতুড়ে, লাল আলোয় ওজন মাপা যন্ত্রটার ওপর একা বসে থাকতে হবে, তারপর সামান্য নড়াচড়া হবে—ঘণ্টা বাজবে, সিগন্যাল ডাউন হবে, স্টেশন মাস্টার এসে টিকিট ঘরের জানালা খুলে দেবেন, ঘটাংঘট করে দু-চারটি টিকিট বিক্রি হবে আর শোঁ শোঁ শব্দ করতে করতে ট্রেন এসে হাজির হবে। দু-একজন উঠবে, দু-একজন নামবে, বাবা সঙ্গের থলে ব্যাগ ছাতা গুছিয়ে নেমে আসবেন, তারপর আমরা দুজনেই খোলা অন্ধকার মাঠে নেমে যাব। এখন তো আর বাবা বাড়ি ফিরে ঘরে গিয়ে বসেন না, বসেন নতুন বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায়। আগের মতো মা আর মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনতে আসেন না। জুতো জোড়া হাতে পেতে তেমন দেরি হলো না। ঘন খয়েরি রঙের ব্যাঙের গায়ের মতো বুটিদার চামড়ার দারুণ মজবুত 'নটি বয় স্যু'—দুষ্টু ছেলেদের সাধ্য নেই সহজে ছেঁড়ে!

খুবই আনন্দ হলো ক-দিন জুতো পরে স্কুলে যেতে কিন্তু দেখবে কে? আর যে একজনের ছিল, সে-ও এখন এই স্কুলে পড়ে না। গাঁয়ের প্রায় কেউ নেই ক্লাসে, আছে সেই বাউরিদের ছেলে—তিন বছর ফেল করে এই ক্লাসেই আছে। এদিকে জুতো আমার নতুন, পরনে রঙ জ্বলে-যাওয়া ফিতে-বাঁধা প্যান্ট। সত্যি কি পেচ্ছাবের গন্ধও লেগে আছে তাতে আর সেই পুরনো হাফশার্টটা। খেলাধুলো কিছু নেই স্কুলে। কাঁটারির বুনোদের ছেলেটা লং-জাম্পে আমার চেয়ে দু-ইঞ্চি বেশি লাফাচ্ছে। সেটা ভাববার কথা। আর নিগণের সেই কালো রোগা গোয়ালাদের ছেলেটা। আমি তখন একটু একটু খারাপ চিন্তা আর খারাপ কাজ শুরু করেছি—কেন করেছি জানি না—ভিতরে কী একটা যেন চন্দ্রবোড়া সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। বিষে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে সে নড়েচড়ে ওঠে। গোয়ালাদের ছেলেটা বলে, প্যান্টালুনে যত ঝামেলা, খাটো একটা ধুতি কোঁচা না করে পরে নে, তারপর গোয়ালঘরে হোক, পুকুরপাড়ে বেনাঘাসের জঙ্গলেই হোক, যেখানেই পাবি (এখানে বাগদিদের মেয়ে দুলির কথা হচ্ছে) ফ্রকের তলা থেকে ছোট্ট পেন্টিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামিয়ে ফেলবি। ব্যস শুয়ে পড় তার ওপর—ধুতি হলে কিছু করতে হবে না—দু ভাগ করাই আছে। ওর কথা শুনে বহুদিন আমার স্ত্রী-অঙ্গের ঠিক জায়গাটা সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল।

সে বছর ধান-টান অল্পস্বল্প যা হয়েছিল সব তোলা হয়ে গেল। মনের মধ্যে বিষ কস কস করছে। কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না। একদিন খবর এল স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যে কজনকে সেন্ট-আপ করা হয়েছিল তাদের একজনও পাস করতে পারেনি। এই স্কুলে কখনো এমন হয়নি যে একজনও পাস করেনি। এখন আর শ্রাবণ দিন নয়, বোশেখ মাসের দুপুরের শাসন এখন। ফেল-করাদের মধ্যে আলমভাইও ছিল। একটা ম্যাচ খেলা হলো মালডাঙা স্কুলের সঙ্গে। যবগ্রাম তিন গোলে গো-হারা। মাঠ শুকুচ্ছে। মাঠের ঘাস খড় হয়ে যাচ্ছে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে। আমাদের এখন একটাই গাই গরু। কার জমির গেমা খেয়ে একদিন দুপুরবেলায় মরে গেল। আখের মতো গাছ এই গেমা। খড়ের অভাব মেটাবার জন্য গোখাদ্য হিশেবেই গেমা লাগানো হয়, অথচ কচিতে এই গাছ গরু-মোষের জন্যে মারাত্মক বিষ। গাইটা মরল, তার বাছুরটা রয়ে গেল। গাইটা আর দুধ দিত না। বাছুর বড়ো হয়ে গিয়েছে। মা-টা মরে গেলে এখন ঐ আধুরে বকনাটা কী করে, কার সঙ্গে মাঠে যায়? বেলা বাড়লেই পাড়ার গরুগুলো যখন মাঠে চরতে যায় রাখালদের সঙ্গে তখন বকনাটা হাম্বা হাম্বা করে কেঁদেই চলে। বেশ বোঝা যায় সে কাঁদছে।

শহীদুল প্রায়ই স্কুলে যায় না। আমারও আর যেতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে যে করছে না সেজন্য কান্না পায়। শিবরাম বাবু ক্লাস সিক্সে খুব কম ক্লাস নিতেন, মাঝখানে কী যে হলো, তিনিও স্কুলে আসা বন্ধ করেছিলেন। চাকরি ছেড়ে দিলেন না, তাঁর জায়গায়, মনে হয় কিছুদিনের জন্যেই হবে, তাঁর এক শালা ক্লাস নিতে আসতেন। আমি দেখছি কেউ ক্লাসে যাচ্ছে না, স্কুল থাকবে কিনা তাই সন্দেহ। বলা দুকড়ি অনেক দিন হলো স্কুলে আসা বন্ধ করেছে, তারা বাড়ি আর জমি-জায়গায় কাজ করে। আকাশের দিকে দেখে আমার মনে হয় কোথাও কোনো লেখাপড়া নেই, থাকলে আকাশের কোনো এক কোণে হলেও একটু জলে-ভরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘের মতো থাকত। সারা গাঁয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের যেন কথা হয় না। আমি স্কুলে নাই বা গেলাম—বাবা অন্তত কিছু বলবেন না—লেখাপড়ার খবর তিনি কোনোদিন নেন না। মণীন্দ্রবাবু যে আমাকে প্রত্যেক দিন বেতন নিয়ে অসহ্য কথা বলেন তা তিনি জেনেও কিছু করেন না। একসময় আমার মনে হতে লাগল স্কুল না গেলে কী হবে? কে খারাপ আছে আমার চেয়ে? রাখালগুলো গরু মাঠে নিয়ে গিয়ে কী মজায় যে সময় কাটায় তা আমি জানি। আমিও বকনাটাকে নিয়ে ওদের সঙ্গে মাঠে যেতে শুরু করলাম। দেখছি, আস্তে আস্তে গরুর রাখাল হয়ে যাচ্ছি জেনেও বাবা কিছু বলছেন না। 'নটি বয় স্যু' ফেলে রাখলাম। বেলা এগারোটার দিকে গরুটাকে নিয়ে রাখালদের গরুর পালের সঙ্গে মাঠে চলে যাই। হাত-পা লোহার মতো হয়ে ওঠে, মুখ দিয়ে খারাপ নোংরা কথা বেরিয়ে আসে রাখালদের মতো। দুপুরবেলায় যেন নেশা লাগে—চলে গিয়েছি একেবারে পশ্চিমের মাঠে—ধোঁয়ার মতো আমাদের গাঁটাকে দেখা যায়। অশথগাছের তলায় রাখালদের সঙ্গে বসে থাকি—তারা বিড়ি খায়, তামুক খায়, আমিও দু-টান দেব কিনা জিজ্ঞেস করে, খুব নোংরা কথায় কসম খায় আর নিজেদের কতরকম গল্প যে বলে। পাঠশালার বলা তো শুধু মুখে বলত, এদের কথা শুনে মনে হতো এরা ঘুঁটে-কুড়ুনি, মাঠের ডোম-বাউরি জ্বালট-কুড়ুনি মেয়েদের এক-আনা দু-আনা পয়সা দিয়ে কিংবা কিছুই না দিয়ে শুকনো খালের মধ্যে, বনকুলের ঝাড়ের আড়ালে অনেক কিছু করে। এতে আমারও বেশ লাগতে থাকে। আমি বিড়ি-টিড়ি কিছু খাই না, ওদের গল্প শুনতে পেলেও কোনো কথা বলি না। কেমন একটা মাস্টার মাস্টার ভাব নিয়ে থাকি। দূরে গরুগুলো চরে বেড়ায়, তারা ঘাস খায়, না মাটি খায় জানি না। দুপুরের পরে প্রায় তিনটের দিকে আমরা বাড়ি ফিরি। তখন আমার যে পিপাসা আর খিদেটা লাগে, তাতে চোখে কিছু দেখতে পাই না। আমার একটুও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। একদিন হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম পুরোপুরি অমানুষ হয়েছি।

বকনাটাকে নিয়ে বোর্ডিংয়ের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরছি। বোর্ডিং তখন বন্ধ—তেমন কেউ নেই কোনো ঘরে। ঠাকুর আর দিনেশ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ যে ভাগ হয়েছে, পুব পাকিস্তান বলে যে একটা দেশ আছে এটা শুধু একটা জানা কথা মাত্র—এটা আমাদের কারো জ্ঞানে ছিল বলে মনে পড়ে না। সে সময়, অন্তত আমার কাছে একটাই জলজ্যান্ত প্রমাণ ছিল। স্পষ্ট মনে আছে, একদিন হাফপ্যান্ট পরা খালি গায়ে পৈতে ঝুলিয়ে একটা পেটমোটা ছেলে স্কুলের লাইব্রেরিতে এসেছিল। তার নাম দিনেশ রায়—সে নাকি ময়মনসিংহ থেকে মা-বাপ-ভাই-বোন ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সেই দিনেশ শেষ পর্যন্ত আমাদের স্কুলে পিয়ন হিশেবে বহাল হয়েছিল। আমাদের গাঁয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের একমাত্র প্রমাণ। দিনেশ ময়মনসিংহের ভাষায় কথা বলত—কী অদ্ভুত লাগত তার কথা শুনতে! ওর মতো বিশ্বাসী মানুষ স্কুলে চাকর-বাকরদের মধ্যে আর কেউ ছিল না। বোর্ডিং বন্ধ, পাহারা দেবার জন্যে দিনেশ আছে।

দিনেশ অনেকগুলো কাপড়-চোপড় কেচে শুকানোর জন্যে বোর্ডিংয়ের নিচু ঘেসো জায়গায় মেলে দিয়েছিল। বকনাটা করল কী—সেই শুকুতে দেওয়া কাপড়গুলোর ওপর উঠে পড়ল। দিনেশ হাঁ হাঁ করে ছুটে এল : কী করলা আজিজুল বাবু, কী করলা, গরু উঠাইলা কাপড়গুলোর উপর, কাচা কাপড় সব নষ্ট হইবে, হায় হায়...

মাথার ওপর বোশেখ মাসের দুপুরবেলার সূর্য, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে খিদের আগুন জ্বলছে, একেবারে পুরো অমানুষ আমি। হাতের লাঠিটা দু হাত দিয়ে মাথার ওপরে তুলে বললাম, বেশ করেছি শালা, কী করবি তুই, আর একটা কথা বললে মাথা ফাটিয়ে দোব তোমার।

তখন তো অন্ধ—এখন দেখতে পাই, কথাটা শুনে দিনেশ আমার দিকে চেয়ে রইল যেন কেউ তার পেটে একটা ছোরা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওর আহত গোবেচারা চেহারা আর দুই চোখের চাউনি আমি এখনো দেখতে পাই। আমারে কী বলিলে আজিজুল ভাই—

সেদিন আমাকে কেউ শাস্তি দেয়নি। কিন্তু কঠিন শাস্তি যে পেয়েছিলাম তা আমার আজও মনে রয়েছে। খুঁটির সঙ্গে কুকুর বেঁধে তাকে একশ চাবুক মারলে বজ্জাত কুকুরের যেমন শাস্তি হয়, আমারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক তাই হলো। দোতলা ঘরে একলা বসে এই চাবুকের মার আমাকে হজম করতে হলো।

বলতে ভুলেছি আর ভুলব নাই-বা কেন, এর মধ্যে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস সেভেনে উঠেছি। পরীক্ষা যে হয়েছিল তা এখন আর মনে পড়ছে না, হয়েছিল তো বটেই, তা না হলে ইংরেজি, অঙ্ক আর ভূগোলে ফেল করলাম কেন? স্কুলের যা অবস্থা, মনে হয়, পরীক্ষা নেহাৎ নিতে হয় তাই নেওয়া হয়েছিল। খাতা কারা দেখেছিলেন কে জানে, আমার অঙ্কের খাতা যে শিবরামবাবুর শালা দেখেছিলেন তা মনে পড়ছে। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন তোমাকে পনেরো নম্বরের বেশি দিতে পারলাম না। সে বছর কেউ ফেল করেনি, সবাইকে মই দিয়ে ঠেলে ক্লাস সেভেনে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি বাউরিদের সেই ফেল-করতে-দড় নবীন বাউরি পর্যন্ত পাস করেছিল।

অসুখে ভুগতে ভুগতে ভোগার পালা বোধহয় এইবার শেষ হলো। শেষবারের ভোগার কথাটা একটু পরে বলছি। বনে-বাদাড়ে ঘুরে আর রাখালি করেও যখন ক্লাস এইটে উঠলাম, ততদিনে আমার বেঁটেখাটো শরীর লোহার মতো শক্ত হয়ে থাকে, একেবারে রাঢ়ী চাষার মতো। এই সময় একবার স্তনের বোঁটাদুটো ফুলে উঠেছে। টন টন করত, হাত লাগলে গরম মনে হতো। এমন অবস্থা হলো যে মা আমার স্তনের বোঁটায় চন্দনের প্রলেপ পর্যন্ত লাগিয়ে দিল। ঠিক সময়মতোই শরীরটা নীরোগ হলো—তার আগে শুধুই ভুগেছি। তার কিছু বর্ণনা আগে দিয়েছি। সেসব কথা আর তুলতে চাই না। তবে ক্লাস সিক্সে ওঠার একটু আগে-পরে অদ্ভুত একটা রোগ হলো আমার। পেটের মাঝখানটায়, মনে হচ্ছে নাভির ঠিক নিচে, ছোটখাটো একটা রাবারের বলের মতো কিছু ফুলে উঠল। সেই সঙ্গে ব্যথা। যে কেউ হাত দিলেই টের পেতাম। কেউ কেউ বলেই ফেলল, এ ছেলে আর টিকবে না। তখন কারণে অকারণে টেঁসে যেত মানুষ ঐ সময়টায়। বাবা দিনকতক জেনেও চুপ করে থাকলেন, একবার নিজে হাত দিয়েও দেখলেন না। মা কান্নাকাটি শুরু করলেন, ছেলের আমার এ কী হলো গো! বাবা কিছুতেই গা করছিলেন না। তারপর ঠিক যা তাঁর স্বভাব, একবার যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক করে ফেলেন শেষ দেখবেন এর, তখন তিনি শেষ পর্যন্তই দেখেন। একদিন সকালবেলায় আমাকে নিয়ে নিগণ স্টেশনে এলেন। সকালের সাড়ে আটটার ট্রেনে সোজা বর্ধমান। হাঁটতে পারবি? আমার প্রচণ্ড ব্যথা করছিল, হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল, তবু বললাম, পারব। অদ্ভুত স্বভাব বাবার, কষ্ট সইতে পারলে খুব খুশি—ব্যাটা ছেলে কেন বলবে কষ্ট হচ্ছে, সইতে পারছি না? হাঁটতে পারব বলার সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে তিনি বললেন, চল তাহলে নিগণ, সকালের ট্রেন ধরে বর্ধমান গিয়ে শৈলেন ব্যানার্জিকে দেখিয়ে আনি।

সবাই জানে বর্ধমান শহর মহারাজাদের। কিন্তু তাঁদের তো চোখে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। চোতসংক্রান্তিতে তাঁদের হাতিটাকে দেখা যায় ক্ষীরগাঁয়ের মেলায় আর বর্ধমান শহরে একটা কালো মোটর গাড়িতে দেখা যায় মহারাজার এক ভাগ্নেকে। গাড়িটা একটু কাত হয়ে চলে। টের পায় রাজার ভাগ্নেকে নিয়ে যাচ্ছে সে! আসলে বর্ধমান শহর তিনজনের—ডা. শৈলেন ব্যানার্জি, মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম আর ডাকসাইটে উকিল টকু সরকারের। তিনজনের কাউকেই আমি তখনো চোখে দেখিনি। শ্যামসায়রের পাড়ে তখনকার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের আশেপাশে কোথাও ডা. শৈলেন ব্যানার্জির চেম্বারে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন। শৈলেন ডাক্তার তখন তাঁর চেম্বারেই ছিলেন। এমন সুপুরুষ মানুষ আমি যেন আর কখনো দেখিনি। ফর্সা রঙ, হালকা পাতলা শরীর, মুখে সুন্দর একটা হাসি। আমাকে একটা টেবিলে শুইয়ে পেটটা টিপেটুপে খুব খানিকক্ষণ দেখলেন—মুখটা একটু গম্ভীর হলো—স্টেথো কানে লাগিয়ে বুক-পিঠও দেখে নিলেন। তারপর নিজের চেয়ারের উল্টোদিকে বাবা যেখানে বসেছিলেন তার পাশের চেয়ারে আমাকে বসালেন। একবার উঠে গিয়ে একটা ড্রয়ার খুলে তিন-চারটে চকচকে ছুরি, কাঁচি আরো কী কী সব ডাক্তারি অস্ত্রপাতি এনে টেবিলে রাখলেন। আমার চোখে চোখ রেখে তিনি বললেন, এই যে অস্ত্রপাতি দেখছো, আমার কথা শুনে যদি না চলো, তাহলে বাবা তোমাকে আবার আমার এখানে নিয়ে আসবে আর আমি তোমার পেটটা চিরে এইসব কাঁচি আর ছুরি দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব কেটে কেটে বের করে আনব। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বলার দরকার ছিল না—আমি যতদূর পারি ঘাড় হেলিয়ে জানালাম, তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমি শুনে চলব।

কিছুদিনের জন্যে আমার দৌড়ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যথা কমল, শক্ত বলটাও চলে গেল। তবু কোনোরকম দৌড়ঝাঁপ করা গেল না। কারণ একটাই, আমি শৈলেন ডাক্তারের কথার চেয়ে বাবাকে অনেক বেশি ভয় করতাম। আমি কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছি, সামনে হাডুডু হিঙেডারি খেলা হচ্ছে। এই দুটো খেলাতেই হাত-পায়ের স্ফূর্তি চাই— কী সব খেলছে, দূর—একবার আমি ঠিক হয়ে উঠি—খেলা কাকে বলে দেখিয়ে দেব। সেদিন স্কুলের দক্ষিণ দিকের ইটের টুকরো ঘুটিংয়ে ভর্তি মাঠটায় হিঙেডারি খেলা হচ্ছে। এখানে মুসলমান রাখাল-বাগাল ছেলেগুলো আসেও না, তাদের স্কুলের ছেলেরা খেলতে নেয়ও না। সেদিন খেলাতাঁতি, দুকড়ি, সোনা, অমরেশরা খেলছিল। নন্দীদের ছেলে অমরেশ তখন আমার দারুণ বন্ধু হয়েছে। বিকেলে দুজনে একসঙ্গে হওয়া চাই। আমার অসুখের জন্যে মাসখানেক স্কুলের মাঠে আসতে পারিনি। সেদিন এসে চুপ করে বসে খেলা দেখছি। অমরেশ আমাকে দেখেও একটা কথা বলল না। দুই ঠোঁট টিপে মুখের কেমন একরকম ভাব করে রইল। হিঙেডারি খেলায় খুব দৌড়াদৌড়ি করে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে হয়। দু হাত বাড়িয়ে যে ঘর আগলায় তাকে বোকা বানাতে না পারলে ঘরের লাইনটা ডিঙানো যায় না। অমরেশ লাইন পার হতে গিয়ে একবার আমার প্রায় ঘাড়ে এসে পড়ল। তখন কী যে ঘৃণার সঙ্গে সে বলল, এই সরে বোস না, মাঠের মাঝখানে বসে আছে! আমি তার কথায় জড়োসড়ো হয়ে খানিকটা সরে বসলাম। এই সময় বহুদিন পরে বলা এল মাঠে। এমনিতে তাকে অনেক দিন দেখি না। স্কুলে বোধহয় সে আর যায় না। আমিও তো যাই না! অনেক দিন পরে বলাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল। এখন সে আরো জোয়ান হয়েছে—গোঁফের রেখা দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ওপর, চৈতন কেটে ফেলেছে।

এতক্ষণে খেলাটা থামল। যারা খেলছিল, তারা এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে, বলা এসেছে বলেই আমি দাঁড়িয়ে আছি, নইলে আমি বাড়ি চলে আসতাম। অমরেশের কী যে হলো, সে আমার পিছনে লাগল, ইঃ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাফিয়ে চলে এসেছে, হিঁদুপাড়ায় খেলা করবে! যা ভাগ—আমি খুব অবাক হচ্ছি, এরকম করছে কেন তেলা (অমরেশের ডাকনাম)? এই কেবল আমরা একজন আর একজনের বন্ধু হয়ে উঠেছি। দুর্বল গলায় আমি চিঁচিঁ করে বলি : কেন যাব রে আমি? স্কুলের মাঠ কি তোর একার? মারমুখো হয়ে উঠল অমরেশ—চোনো না তো আমাকে, তারে নাচাব। একপাশে দাঁড়িয়ে বলা সব শুনছিল। অমরেশের কথা শুনে সে এগিয়ে এল। তেলা, ওকে যেতে বলছিস কেন? ওর অসুখ করেছে, চুপ করে একপাশে বসে দেখছে, তাতে তোর এত জ্বালা কেন? বলার কথায় কান দিল না তেলা, শুধু বলল, তুই চুপ করে থাক, তোকে কি কিছু বলেছি? মোচলমানদের ছেলের ওপর তোর এত দরদ কিসের? এই তুই যা এখান থেকে। খপর্দার, এ পাড়ায় আসবি না। আমি আর একবার চিঁচিঁ করে কিছু বলতে গেলাম, অমরেশ নিচু হয়ে একরাশ ইটগুঁড়ো, বালি, ধুলো এইসব নিয়ে আমার দিকে ছুড়ে মারল আর বার বার নিচু হয়ে একটা করে ঢিল কুড়িয়ে আমার দিকে ছুড়তে লাগল, যাঃ পালা, নেড়ে কোথাকার! কী যে হলো বলার কে জানে, সে ঐ ধুলো আর ঢিলের মধ্য দিয়ে বার বার আমার চারদিকে বন বন করে ঘুরতে লাগল আর বলতে লাগল, যাবি না আইজুল। দেখি কে তোকে তাড়ায়...এটা কারো বাপের জায়গা নয়—বলা খালি এই কথা বলে আর আমার চারদিকে পাক দিতে থাকে। এই সময় তেলার হাতের বড়ো একটা ঢিল আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। ওকে ডেলা মারলি যে—বলা চিৎকার করে উঠল আর অমরেশ বলল, ওকে লাগলে লাগত, তোর তো লাগে নাই। আমার চারদিকে একইভাবে ঘুরতে ঘুরতে বলা স্কুলবাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠে, যদি লাগত...কেবলই ঘোরে আর বলে, যদি লাগত? তবে কতক্ষণ আর এমন করে চলে? অমরেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর কেমন একটা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলা বলল, আইজুল বাড়ি যা। কী যে গভীর দয়া তার দুই চোখে, সারা জীবনেও ঐ চাউনি ভুলতে পারলাম না। কেন যে তা-ও জানি না।

এর মাত্র কয়েক দিন বা কয়েক মাস পরে একদিন সন্ধেরাতে দলিজে বসে কপিলাবাস্তু নগরে গৌতম বুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত মুখস্থ করছিলাম। বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা চেয়ারে বসেছিলেন, হারিকেনের আলো অতদূর পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছিল না। বাবাকে ঠিকমতো দেখাও যাচ্ছিল না। এই সময় নন্দীদের তিন ভাইয়ের সবচেয়ে ছোটভাই আমাদের মরোদা দলিজের সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাবা বললেন, কে গো? আমি নন্দীদের মুরারি। বাবা বললেন, মরো বলছ—কী গো কী হলো, কী বলছ? বলতে বলতে বাবা চেয়ার ছেড়ে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতমশাই, বলছিলাম কী, আপনার কাছে থার্মোমিটার আছে? ভাইপোটার খুব জ্বর। মাত্তর একদিনের জ্বর, কত জ্বর বুঝতে পারছি না—গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরটা একটু দেখতে হতো। দাঁড়াও, দাঁড়াও, তাই নাকি! থার্মোমিটার তো আছে বাড়িতে। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি। বলে বাবা ঘরে গিয়ে থার্মোমিটার নিয়ে ফিরে এলেন। এই নাও, ভালো করে দ্যাখো কিসের জ্বর—হেলাকে একবার খবর দাও। কাল একবার আমাকে খবর দিয়ো কিন্তু।

মরোদা থার্মোমিটার নিয়ে চলে গেল। পরের দিন সন্ধের আগে খবর পাওয়া গেল মাত্র দুদিনের জ্বরে অমরেশ মারা গেছে। হু হু করে রাতে জ্বর চড়ে গিয়েছিল, প্রলাপ বকছিল, ডাক্তারের অপেক্ষা রাখেনি, বিকেলের দিকে মারা গেছে। মরোদা ভাইপোর জ্বর বলে যখন থার্মোমিটার চেয়ে নিয়েছিল, তখন একটুও ভাবতে পারিনি যে মরোদা অমরেশের কথা বলছে। যতই ভাইপো হোক, তেলা হবে কী করে? তেলার নাকি ম্যানিনজাইটিস হয়েছিল, তখন বলত ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া।

ঠিক এই সময়টাতেই তেলার বাবা-মা তীর্থে কাশী না কোথায় গিয়েছিল একমাসের জন্যে। ফিরে এসে ধুতির খুঁটটা গলায় জড়িয়ে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। কে একজন এসে আমাকে বলল, অমরেশের তুই খুব বন্ধু ছিলি তো। একবার তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে তার বাবা। তোকে খুঁজছে। অহিদ চাচা বলল, কাছে গিয়ে বুকের ওপর তোর মাথাটা রেখে চুপ করে থাকিস। কোনো কথা বলিস না। রায়েরপুকুরের পাড়ে তেলার বাবা যতীন কাকাকে দেখলাম—ধুতির খুঁট গলায় জড়ানো। খালি গা। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরা-টরা কিচ্ছু না, কেমন ফাঁকা চোখে তাকিয়ে শুধু বলল, হ্যাঁগো, তোমাকে কিছু বলে-টলে যায়নি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপরে, কতদিন পরে, সেভেনে পড়ার সময়ে নাকি এইটে ওঠার বছরে আমার মনে পড়ে না। স্মৃতির জায়গায় জায়গায় এমন মোছা থাকে যে তা আর কিছুতেই উদ্ধার করা যায় না। অতলে ডুবলেও সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

চৈত্রের কোনো একটা দিনে বা রাতে গাঁয়ে কলেরা দেখা দিল। কলেরা আর গুটিবসন্ত বাঁধা দুটি রোগ। মা শেতলা আর ওলা দেবী কিংবা ওলা বিবি—এই দুই খাণ্ডারনি সব সময়ে পুঁটলি বগলে কোনাকুনি মাঠ পার হয়। ওদের নাকি দেখতেও পাওয়া যায়। এক-একটা গাঁ উজাড় হয়ে যায়। গুটিবসন্তে যারা মরে তাদের মরার আগেই দশবার মরা হয়ে যায়—এমন যন্ত্রণা। আর যারা বেঁচে যায় সারা জীবন তাদের আধখানা সিকিখানা দেহ বয়ে বেড়াতে হয়। খাবলা মেরে মেরে তাদের অনেক মাংস খেয়ে নেয় বসন্ত। এর চেয়ে কলেরায় মরা খুব সহজ—যত কষ্টই হোক, চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

দু-বছর এক বছর পরে পরে কলেরাটা গাঁয়ে একবার করে দেখা দেবেই। সে বছরও একদিন বিকেলে শোনা গেল তিলিপাড়ায় কলেরা দেখা দিয়েছে। মাথায় বাজ পড়ার মতো খবর। কেউ বাড়ি থেকে বেরুবে না—বাবার হুকুম। বাড়ির ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে থেকে বাসি খাবার যা কিছু আছে সব ফেলে দেওয়া স্বচক্ষে দেখা, সব খাবার পাত্র ঢাকা, পানির কলসির মুখ ঢাকা—এসব করিয়ে তবে তিনি আবার বাড়ির বাইরে যান।

পরের দিন সকালবেলায় কাউকে কিছু না বলে তিলিপাড়ার দিকে গেলাম। বাবা জানতে পারলে ছাল তুলে নেবে জানি কিন্তু আমি কিছুতেই বাড়িতে বসে থাকতে পারলাম না। আমাদের নতুন বাড়ির পুব দিকেই খোঁনা ফকিরের দোকান আর খামারবাড়ি। সেটা পেরুলেই কাদের একটা তালা দেওয়া ঘর, উঠোনময় জঙ্গল, সেটা পেরুলেই বলাদের বাড়ি। চলেই যাচ্ছিলাম শিবতলার দিকে—কী মনে হলো বলাদের বাড়িতে ঢুকলাম। নিকানো ছোট্ট উঠন, একপাশে মাঝারি একটা ধানের মড়াই। তাদের একটিমাত্র ঘরের মাটির দাওয়া। বলার মা নেই, এক দাদা আর বাবা আছে। মেয়েমানুষ কেউ থাকে না তাদের বাড়িতে। নাকে খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢিমসোনো একটা গন্ধ এলো। পেচ্ছাপ, মল, বমি, একসঙ্গে মিশে বাসি হয়ে গেলে যেমন গন্ধ, ঠিক তেমনি। বলা শুয়ে আছে তাদের দাওয়ায়। আমি প্রথমে খেয়ালই করিনি—বলা তার ডান কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা বহু কষ্টে তুলে প্রায় ভুতুড়ে নাকি গলায় বলে উঠল, তুই কেন এইছিস আইজুল? যা যা চলে যা, পালা পালা—নিভে আসা চোখে আমার দিকে চেয়ে বাঁ হাতটা দু-তিনবার নেড়ে সে আবার বলল, সেই দুর্দান্ত বলশালী বলা, আমার কলেরা হয়েছে, খানিক বাদেই মরে যাব, তুই কেন এইছিস ভাই আইজুল, পালা পালা...

সেদিন বিকেলেই বলা মারা গিয়েছিল। একদম একা গিয়েছিল বলা। এরকম স্রেফ একা মরে যেতে বলার ভয় করেনি? ভয় তাকে কোনোকালে করতে দেখিনি। প্রস্রাব করতে করতে বাড়ির পাশের খালটাকে পচিয়ে দিয়ে মরে যেতে গদা সময় নিয়েছিল দু বছর। বলা চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় নেয়নি। বাড়ি ফিরে আমি কাউকেই এই কথাটা বলতে পারিনি। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে হারিকেনটা জ্বালিয়ে দোতলার ঘরে এসে হারিকেনের বাতিটাকে কমিয়ে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিয়ে লুকিয়ে বসে রইলাম। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল মড়াকে কাটোয়ার গঙ্গায় নিয়ে যাবার চিৎকার, বলো হরি হরিবোল। লোকেরা সব যাচ্ছে, উত্তর-পুব কোনাকুনি কাটোয়ার গঙ্গায়। বলাও এখন যাচ্ছে। একবার চারপাশ কাঁপিয়ে আমাকে সে পাক দিল চিৎকার করতে করতে, যদি লাগত...

অনেক দিন পর স্কুলে গিয়ে শুনি নতুন হেডমাস্টার এসেছেন। স্কুলটাকেও যেন কেমন খুশি খুশি লাগছে। মাস্টারবাবু-ছাত্ররা যেমন ১০টার সময় স্নান করে স্কুলে আসেন, মনে হচ্ছে আজ স্কুলটাও তেমনি একবার স্নান করে নিয়েছে। আমার নিজেরও মনে হচ্ছে কত দূর চলে গিয়েছিলাম, আজ ফিরে এসেছি বাড়িতে। শিবরামবাবু ছুটি কাটিয়ে স্কুলে ফিরেছেন। যে ঘরটায় আলো ছিল না, ঢুকলেই মন খারাপ করত, সেই ক্লাস সেভেন থেকে আমরা ক্লাস এইটের ঘরে এসেছি। কত আলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঘরে। শিবরামবাবু আর আমাদের ক্লাস নেবেন না। 'মহাপ্রস্থানের পথে' উপন্যাস থেকে যে অংশটা পড়াতেন, দুর্গম পাহাড়ি পথে একজন তীর্থযাত্রী কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে মোটা কম্বল মুড়ি দিয়ে হাঁটছে 'কেদারনাথ' 'বদ্রিনাথের' দিকে। তখনকার দিনে বদ্রিনাথ পৌঁছোতে পারলেই যেন স্বর্গের সবচেয়ে উঁচু শেষ সিঁড়িটায় পা রাখা হলো। এতে মহাপুণ্য হয়। কম মানুষই সশরীরে বদ্রিনাথ পৌঁছাতে পারে। এই অংশটা পড়ানোর সময় আবেগভরা তীব্র কাঁপা কণ্ঠে তিনি যে কথাগুলো বলতেন, 'ওরে ভাই, আর দেরি নেই, ওই দেখা যায় বদ্রিনাথের চুড়ো, আকাশের মেঘ হয়ে মেঘের সঙ্গে মিশে আছে। চলো ভাই, এগিয়ে চলো'—তাঁর এই কণ্ঠ এখনো যেন শুনতে পাই।

নতুন হেডমাস্টারকে দেখার জন্য ছটফট করছি। এর মধ্যে দু-একবার মণীন্দ্রবাবুর মুখোমুখি হয়ে গেলাম। চুপ করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে, কিন্তু কিছুই বললেন না। যা-ই হোক শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলাম নতুন হেডমাস্টারকে। ওঁর পুরো নামটা এখন কিছুতেই মনে পড়ছে না। তবে পদবি হচ্ছে কর্মকার। তারপর থেকে তাঁর আসল নামটাই লোকে ভুলে গেল। যত দিন থাকলেন আমাদের স্কুলে, সবার কাছে পরিচয় হলো কামার মাস্টার।

ক্লাস এইটে শিবরামবাবু আর আমাদের ক্লাস নেবেন না। তাঁর জায়গায় দুর্গাশঙ্করবাবু আমাদের বাংলা পড়াবেন, ইংরেজিও বোধ হয় পড়াবেন। আর পড়াতে আসবেন সারা স্কুলের যিনি আতঙ্ক সেই শান্তিরামবাবু। এঁকে দেখলেই ছেলেদের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত। তিনি পড়াবেন ভূগোল আর কালিকিঙ্করবাবু নেবেন অঙ্কের ক্লাস। দুর্গাশঙ্করবাবুর বিরাট চেহারা, ধবধবে ফর্সা, অনেকটা ছবি বিশ্বাসের মতো দেখতে। তাঁর পায়ের জুতোজোড়াকে নিউ কাট না কী যেন বলত সবাই। শুধু একটা ধুতি পরে খালি গায়ে ক্লাসে আসতেন। কখনো একটা গেঞ্জি বা ফতুয়া আর শীতের দিনে শুধু মোটা একটা সুতি কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তিনি ক্লাসে হাজির। খালি গায়েই বেশি, মোটা সাদা উপবীতখানা দেখা যেত এক কাঁধ থেকে ঝোলানো। তাঁর ভুঁড়িটাও বেশ বড়। মাথায় পাকা চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, এতই ছোট যে চিরুনি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁচড়ানোর কোনো দরকারই হতো না। মস্ত বড় একখানা শরীর তাঁর, কিন্তু অতি ভালো মানুষ তিনি। সব সময়েই মোটা একটা কঞ্চি হাতে ক্লাসে ঢুকতেন। কিন্তু তাঁকে কোনো ছেলের গায়ে হাত তুলতে কখনো দেখিনি। শরীরের তুলনায় তাঁর মাথাটা ছোট দেখাত। কিন্তু ছোট বা বড় মাথার সঙ্গে কি বিদ্যার কোনো সম্পর্ক আছে! প্রাচীন ভারতীয় ভাষায়, নানা শাস্ত্রে—বেদ-উপনিষদ-গীতা-পুরাণ ইত্যাদিতে তাঁর জ্ঞান অগাধ। পালি জানতেন, সংস্কৃত জানতেন তো বটেই, পুরনো বাংলা গদ্য আর সংস্কৃত বা বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধেও তাঁর জানার কোনো পরিধি ছিল না। তিনি আমাদের বলতেন—শুদ্ধ বাংলা যদি লিখতে-পড়তে চাস, তাহলে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথে পাবি না। ওতে অনেক গলদ। শুদ্ধ বাংলা লিখতেন একমাত্র বিদ্যাসাগর। অক্ষয় দত্তও ভালো, তবে লোকটার শাস্ত্রজ্ঞান নেই, নাস্তিক ছিলেন। আশ্চর্য, এরকম মহাপণ্ডিত মানুষটি কিন্তু ইংরেজিও জানতেন চমৎকার। ক্লাস সেভেনে থাকতে থাকতেই একটা নেসফিল্ড কিনতে হয়েছিল, অত ভালো ইংরেজি ব্যাকরণ আর হয় না। যে দুটো বিষয়ে আমি পাঠশালা থেকেই খোঁড়াচ্ছি—ইংরেজি আর অঙ্ক—তার একটার দায়িত্ব নিলেন দুর্গাশঙ্করবাবু আর অন্যটির দায়িত্ব এসে পড়ল কালিকিঙ্করবাবুর ওপর। আমার নতিজার আর অবধি রইল না। প্রায় সারা বছর আমি স্কুলেই যাইনি, পুরোপুরি গরুর রাখাল হয়ে গিয়েছিলাম। চুয়ার নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেলে। ভূগোল পড়াতে এলেন শান্তিরামবাবু। তাঁর তো পেটানোর জন্য হাত নিশপিশ করে। আমি প্রায় প্রতিদিন মার খেতাম। কালিকিঙ্করবাবু হম্বিতম্বি ছাড়া আর কিছুই করতেন না অবশ্য, আর দুর্গাশঙ্করবাবু কখনোই ছেলেদের মারধর করেননি। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় রায়েরপুকুরের পশ্চিমপাড়ের কুলতলায় দাঁড়াতাম। ডান হাতের একটা আঙুল ঠিক করতাম মার খাব বলে আর একটাকে খাব না বলে। বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরতে হতো ওই দুটো আঙুলের যে কোনো একটিকে। প্রায়ই ধরা পড়ত মার খাব আঙুলটার ওপর। সব দিন যে এটা ঠিক হতো, তা অবশ্য নয়।

তবে ইংরেজি নিয়ে বড্ড নাকাল হতে থাকলাম। প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিডিং পড়া, সেটা এক রকম করে হয়ে যেত—তারপর মানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা, তা-ও এক রকম করে হয়ে যেত। এবার বাক্য ধরে ধরে পার্টস অব স্পিচ বুঝিয়ে দিতে হবে। সাবজেক্ট টু দি ভার্ব কোনটা? সাবজেক্ট একটা শব্দ দিয়েও হতে পারে, একগাদা শব্দ দিয়েও হতে পারে কিনা? ফাইনাইট ভারব কোনটা, জিরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ কোনটা? তারপর অ্যাকটিভ বাক্য, প্যাসিভ বাক্য। 'ইট রেনস' বাক্যের সাবজেক্ট কোনটা? এর কোনো অবজেক্ট আছে? দ্যাট আই অ্যাম এ ফুল ইজ নোন টু এভরিওয়ান—এই বাক্যের সাবজেক্ট কই, ভার্ব কই? এত সব বলতে না বলে গলায় দড়ি বেঁধে ফাঁসি দিয়ে দিলেই হয়। এত দক্ষানো কেন? এদিকে অঙ্ক তো করতামই না—কালিকিঙ্করবাবু যতই 'কাম্বারসাম' 'রাস্টিকেট' বলুন না কেন। তাঁর হাত দুটি তুলতুলে, আলতো করে কান ধরলে আরামই লাগত। প্রায় দিনই সকালে মদনের খাতা থেকে অঙ্ক টুকে নিয়ে আসতাম, তাতে যেটুকু হয়। এদিকে ভূগোলে একটা দেশেরও ম্যাপ আঁকতে পারি না। ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি বলে ভূগোলের প্রথম দিকে যা যা থাকত, তারও কিছু মনে রাখতে পারতাম না। শান্তিরামবাবু গরুর মতো ঠ্যাঙাতেন। তাঁর নিয়মকানুন আলাদা, একেক দিন একেক রকম। কোনো দিন কঞ্চি দিয়ে পিটিয়ে পিঠ ফাটিয়ে দিতেন বা দু আঙুলের মাঝখানে পেন্সিল দিয়ে এমন টিপে ধরতেন যে প্রাণ বেরিয়ে যেত। দুই গালে দুটো চড় মারলে মনে হতো এত সরু সরু আঙুল দিয়ে এমন হনুমানের মতো মারেন কী করে! তার চেয়ে মারাত্মক শাস্তি হচ্ছে টেবিলের তলায় মাথা ঢুকিয়ে কুঁজো করে দাঁড় করিয়ে রাখা, পিঠটা শিরশির করত, কখন পিঠে গদাম করে কিলটা পড়বে। কিলটা মারলেই হয় বাপু—এই মারে, এই মারে করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

তবে তিনি পড়াতেন খুব ভালো। স্পষ্ট উচ্চারণ, ঝাঁঝালো গলা। ক্লাসের পড়াটা পড়ানো হয়ে গেলে তিনি এক দুই তিন চার বাক্যে এমন করে সারাংশটা বলে দিতেন যা কেউ কিছুতেই ভুলবে না।

ক্লাস এইটে ওঠার সময় তো বখেই গিয়েছি। বাবা বেতন-টেতন না দিলে আমি আর স্কুলেই আসব না ঠিক করেছি। তাছাড়া এখন কাজও বেড়ে গেছে। নতুন বাড়িতে মানুষ কম। আমরা দুই ভাই, বাবা-মা আর জানু থাকে তার প্রথম কন্যাকে গর্ভে নিয়ে। শিশু এখানেই জন্মাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনকার প্রথামতো। গ্রাম্য দাইই এসব করাবে। জানু মোট কতবার তার শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল হাতের আঙুল গুনেই বলা যায় আর কোনোবারই বেশি দিনের জন্য নয়। তখনো পর্যন্ত পাসপোর্টের চল হয়নি বলে বরং দুলাভাইই আসতেন ঘন ঘন, পুরো ছুটি এখানেই কাটাতেন।

বাড়িতে টিউবওয়েল নেই, বলতে গেলে সারা গাঁয়ে হিন্দু-মুসলমান কোনো বাড়িতেই টিউবওয়েল নেই। আমাদের বাড়ির কাছে রায়েরপুকুরের ধারে বোর্ডিংয়ের গায়ে একটা টিউবওয়েল ছিল, তিলিপাড়ায় একটা ছিল, আগুরিপাড়াতেও একটা। আর নেই। বাড়িতে পানি লাগবে রান্না-স্নানের জন্য, খাবার পানি তো লাগবেই, বাসন-কোসন, থালা-বাটি, গ্লাস—সবই কাঁসার—ধোয়া মাজার জন্য—এত পানির জোগান কে দেবে? নতুন বাড়ির পাশেই রায়েরদিঘি নামে বড় একটা পুকুর ছিল। তার পানির ওপর ঘন সবুজ সরের মতো আছে। সেটা সরিয়ে একটু পরিষ্কার পানিতে থালা-বাসন মাজা বা স্নান করা চলত। এই দিঘির পশ্চিম পাড়ের ঘাটগুলো মুসলমানরা ব্যবহার করত, উত্তরের দুটি ঘাটের একটি মল্লিকদের আর একটা নাপিতদের। বাকি সমস্ত পুব-দক্ষিণ দিকের ঘাটগুলো ব্যবহার করত হিন্দুরা। এতে কোনো অসুবিধা হতো না। শুধু ঈদে বকরিদে গরুর হাড়গোড়, নাড়িভুঁড়ি ধুলে বা ফেললে কখনো কখনো এক-আধটু উত্তেজনা হতো। পশ্চিমপাড়ে গাঁয়ের মাটির মসজিদটাও ছিল। সেখানে পাশাপাশি দুটো ঘাট—একটা মসজিদের ব্যবহারের জন্য আরেকটা কালোর (যে মেয়েটি কোমরে দগদগে ঘা নিয়ে মরে গেল) বিধবা মা আর তার ছেলে এহসানুর-রা ব্যবহার করত। তার পরই ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বালিঘাট ছিল। সেটা দাশুমাস্টার মশাইদের পরিবার আর দু-একটি তিলি পরিবার ব্যবহার করত।

এই ঘাটটার ঠিক ওপরেই আমাদের বাড়ির খিড়কির ছোট দরজা। সেটা খুললে সামনেই ঘাট। ব্যবহারে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু দরজাটা সব সময়ই বন্ধ থাকত। মা কখনোই এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে পুকুরের ঘাটে নামত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন পর্দা নিয়ে কিছু কথাবার্তা শুনতাম বটে—তবে বোরখা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কখনো শুনিনি। বোরখা পরতে প্রায় দেখিইনি। অথচ কোনো বনেদি মুসলমান পরিবারের বউ-মেয়েদের কাউকে দিনের বেলায় বাড়ির বাইরের রাস্তায় দেখিনি। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে যেতে হলেও সন্ধের পর গায়ে একটা সুতি-চাদর কিংবা চাদর ছাড়াই চুপচাপ হেঁটে যেতে দেখতাম। গরুর বা মোষের গাড়িতে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে যেতে হলে কিংবা রেলস্টেশন থেকে কোনো কুটুম্বিনীকে আনতে গেলে গাড়ির টপ্পরের দুই দিকে অবশ্যই দুটো শাড়ি বা কাপড় দিয়ে বেঁধে ঘেরাটোপ তৈরি করা হতো। বর্ধমান শহরে গেলেও মা বা ফুফুদের রিকশা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার নিয়ম ছিল। তবে সে হয়তো শুধুই গ্রাম থেকে আসা মেয়েদের বেলাতেই ঘটত।

গাঁয়ের ভদ্র-হিন্দু পরিবারের বউরা টিউবওয়েল কিংবা পুকুর থেকে জল আনতে হলে বা স্নানে গেলে দিনের বেলায় রাস্তায় বেরোত বটে, তবে তাদের কারো মুখ দেখা যেত না। গলা পর্যন্ত ঘোমটা টানা। অবশ্য গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা, যাদের সারা দিন নানা কাজ করতে হতো—গোয়াল পরিষ্কার করা, ঘুঁটে দেওয়া, বাসন-কোসন ধুতে ঘাটে যাওয়া, সিদ্ধ ধান শুকানো—এমন কাজের জন্য হিন্দু-মুসলমান সাধারণ বাড়ির মেয়েরা—তাদের সংখ্যাই নব্বই ভাগ—ঘোমটা-টোমটার বালাই না রেখেই রাস্তায় বেরোত। ছোট মেয়েরা ফ্রক, বড়রা সবাই শাড়ি পরত। ব্লাউজ পরার চল প্রায় ছিলই না।

গাঁয়ের জীবন এমন স্বাভাবিকভাবে চলত যে এসব নিয়ে নিন্দা-মন্দ তো দূরের কথা, কোনো আলোচনাই হতো না। অবশ্য বড় বড় সম্ভ্রান্ত মুসলমানপ্রধান গাঁয়ের বেলায় কেমন ব্যবস্থা ছিল, তা আমি বলতে পারব না।

আমাদের গাঁয়ের পুব দিকে মাইলখানেক দূরে ধারসোনা ছিল পুরোপুরি মুসলমান গ্রাম। আমাদের গাঁয়ের মতোই নিয়ম। একটি কী দুটি মোটামুটি বনেদি পরিবারের মেয়েদের রাস্তায় দেখা যেত না। বাকি সব মেয়েই নানা কাজে বাইরে আসত। পুরুষদের মতোই চলাফেরা তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র একজন মহিলাকেই তখন বোরখা পরতে দেখেছি আর বোরখা কেমন তা দেখেছি। তাঁকে আমরা বলতাম হাজিবিবি। জীবনে কোনো এক সময় তিনি হজ করে এসেছিলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন বোধ হয় তেমন কেউ ছিল না। একটা কালো রোদজ্বলা বোরখা পরে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে, খাল-বিল, জলা-জঙ্গল উজিয়ে হাজিবিবি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতেন আর স্বেচ্ছা-আতিথ্য জোগাড় করে নিতেন বিশেষ বিশেষ বাড়িতে। ছয় মাস এক বছর অন্তর অন্তর তিনি আমাদের বাড়িতেও আসতেন। খুনখুনে বুড়ি, আঁকিবুকি কাটা ভাঙা ছেঁড়াখোঁড়া মুখ। বোরখার কালো রঙ এখন পুরনো ছাতার কাপড়ের রঙ হয়েছে। ফুফু আর মা তাঁকে বাড়িতে থাকতে দিতেন যতটা সম্ভব বাবাকে এড়িয়ে। হাজিবিবি সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকতেন। বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কর্তা বাড়িতে আছে কিনা, থাকলে কোথায় আছে খোঁজখবর নিয়ে তবে বাড়িতে ঢুকতেন। একবার এলে আর সহজে নড়তে চাইতেন না। কী জানি কেন, বাবা হাজিবিবিকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যে এ বাড়িতে আছেন তা বাবার বুঝতে দেরি লাগত না। আশি বছরের বুড়ি, গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা কাঁসর আঁঝরের বাদ্যির মতো। গোটা পাড়া বুঝতে পারত হাজিবিবি এসেছেন। এই গলার ওপর বুড়ির তো হাত ছিল না, বাবা ঠিকই বুঝে ফেলতেন তাঁর আগমন ঘটেছে। কিন্তু যতই বিরক্ত হোন, কখনোই তিনি তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি।

এখন এই যে বাড়িতে এত পানি লাগত প্রতিদিন, সেটা আনবে কে? পুরনো বাড়িতে যে দুজন মাহিন্দার বাঁধা ছিল, জমিরুদ্দি-মহীরুদ্দি দুই ভাই, তারাই এসব কাজ করে দিত। এ বাড়িতে কেউ নেই। পানি বওয়ার কাজটা আমাকেই করতে হতো। কঠিন পরিশ্রমের কাজ। স্নানের জন্য ঘোলা বা তামিল পুকুর থেকে দু তিন কলসি, রান্নার জন্য, থালা-বাসন ধোয়ার জন্য তিন কলসি আর খাবার জন্য টিউবওয়েলের পানি দুই কলসি আনতেই হবে। এক দিন বাদ দেওয়ার উপায় নেই। সকালের পড়া, পানি বয়ে আনা, তারপর গা ধুয়ে স্কুলে যাওয়া—এগুলো সকালের কাজ। কাঁধে করে বড় একটা কলসি, ডান হাতে পেতলের বড় একটা বালতি নিয়ে পানি আনতে যেতে হতো। ভরা কলসি কাঁধে নিয়ে, ভরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালতি ডান হাতে ঝুলিয়ে পানি নিয়ে আসতাম। গাঁয়ের মানুষ দেখলেই বলত, ছোঁড়াটার গায়ে অসুরের বল গো! মা-ও বুঝত ছেলের কষ্ট, কী করবি বাবা, পানি ছাড়া কী করে চলবে! ছেলের আমার খুব ছুম হচে! আমি সাথে সাথে ঝাঁকিয়ে বলতাম, তুই থাম দিকিনি—ছেলের আমার খুব 'ছুম' হচে! তুই পানি আনবি? ম্লান মুখে মা তখন বলত, পারলে আনতম বাপ। আমাদের যে সে উপায় নাই।

নীরোগ শরীর আমার দিন দিন দড় হতে থাকে। ছাতিটা শক্ত আর চওড়া হয়, হাতের পায়ের পেশি ফুলে ওঠে। আমার মনে হতো, হাত দুটোই আমার সবচেয়ে জোরালো। আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই করে কেউ জিততে পারত না। গাঁয়ের রাখালগুলোও না। প্রচণ্ড বেগে দৌড়াতে পারতাম। আগুরিপাড়ার নরা ছাড়া আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কেউ নেই। কখনো সে হারে কখনো আমি হারি। পাড়ার হা-ডু-ডু খেলায় খেলুড়ে ধরাধরির মধ্যে আমি ছিলাম না। বিপক্ষের খেলোয়াড় আমাদের কোট ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে তার পিঠে থাপ্পড় মেরে কিংবা পায়ে পা লাগিয়ে ফেলে দিয়ে 'মর্' করে দিতাম।

বাবা কোনোদিন আমাদের বাবুগিরি করতে দেননি। ছেলে তালগাছ থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনা, মারামারি করতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে ফেলল কিনা, গাছ থেকে পড়ে খোঁড়া হলো কিনা, পাখির ছানা আনতে কোনো গাছের গর্তে হাত ঢুকিয়ে গোখরো সাপের কামড় খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরল কিনা—তিনি কখনো এসবের খবর রাখতেন না। এদিক থেকে আমার স্বাধীনতা ছিল অগাধ। শরীরের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও ছিল অনেক। বর্ষার দিনে পাঁচ-ছয়জন মুনিষের দুপুরের ভাত-তরকারি—যেহেতু সকালের পানিখাবার শহীদুল দিয়ে এসেছে—এখন আমাকে দিয়ে আসতে হবে। মাথার ওপর এই ভার চাপিয়ে, খাল-বিল পেরিয়ে, জলভর্তি চষা জমি ভেঙে দূরের মাঠে ভাত দিয়ে আসতে হতো। কোনো কোনো দিন একটু দেরি হলে মুনিষদের মুখ রাগে থমথম করত। বীজ-মারা বা রোপা সাথে সাথে বন্ধ রেখে ওই একহাঁটু পানিতেই কোনো রকমে কাদামাখা হাত ধুয়ে, জমির ভেজা আলে তারা খেতে বসত। এর মধ্যে ব্যাঁকা চাচা ছিল গাট্টাগোট্টা, কুচকুচে কালো রঙের অতি বলশালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ। তার সঙ্গে দশ গ্রামের কেউ গায়ের বলে পারবে না বলে আমরা গর্ব করতাম। কোনো গাঁয়ের বলবান কোনো জোয়ানের নাম শুনলেই আমরা বলতাম, ব্যাঁকা চাচার সঙ্গে পারবে?

দুপুরের খাবার নিয়ে যেতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে বলে ব্যাঁকা চাচা ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে রাগী মোষের মতো। ছোট ছোট লাল চোখে খাবারের দিকে চেয়ে আছে। অহিদ চাচা ব্যাঁকা চাচার বড় ভাই। ওখানে অন্য যারা ছিল তাদের সবার চেয়ে বড় বলে জমির আলে বসে থালায় ভাত বেড়ে দিচ্ছে অহিদ চাচা। ভাতের পাশে পাশে তরকারি। তরকারি আর কী! শর্ষের ফুল মেশানো সজনের শাক, পাকা কুমড়োর ঘ্যাঁট বা করলা রাঁধা। কালেভদ্রে এক টুকরো মাছ কিংবা গরুর গোশতের দুটো টুকরো আর বড় একটা জামবাটিতে পাতলা মাষকলাইয়ের ডাল। ব্যাঁকা চাচা বাঘের মতো বড় বড় থাবায় এক এক গরাস ভাত মুখে তুলছে, আঙুলের ডগা দিয়ে একটুখানি কুমড়ো-ছেঁচকি তুলে জিভে ঠেকিয়ে নিচ্ছে। গায়ে-গতরে খাটা ক্ষুধার্ত মানুষের খাওয়া দেখাটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। অমৃত খেলে মুখের কী রকম ভাব হয় তা তো দেখিনি। তবে ক্ষিদেয় ভাত আর অমৃত একই।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে কড়া তামুকে হুঁকো টানা। খড়ের বড় বিড়েতে আগুন জ্বালানোই থাকত। তাছাড়া আছে চকমকি পাথর। আগুন তৈরি করে নিতে কতক্ষণ। থলো হুঁকোয় তামুক খাবার সময় আয়েশে চোখ বুজে আসে কিষেন চাচাদের। এদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যাঁকা চাচার বড় ভাইও ছিল। তার কথা সময় পেলে পরে বলা যাবে। তবে আমি অহিদ চাচার মতো নিরক্ষর জ্ঞানী মানুষ—কই, আর দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

আষাঢ়ের আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে যায়। সারা দিন-রাত যখন তখন বৃষ্টি নামে। কখনো টিপ টিপ টানা বৃষ্টি, আবার একটু পরেই মুষলধারে ঘন ঘোর বর্ষণ। সারা আকাশে মেঘের রঙ একরকম হয়ে ওঠে। বাসি ভাতের আমানির মতো রঙ। এরকম আকাশ হলে বৃষ্টি কখন যে থামবে কেউ বলতে পারে না। মাথা বাঁচানোর জন্য বড় বড় 'টকো', মাথা-পিঠ একসঙ্গে বাঁচানোর জন্য তালপাতার তৈরি 'পেকে' থাকত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ওসব কিছুই লাগে না, ছাতা তো নয়ই। টিপ টিপ বৃষ্টিটা একটু বিরক্ত লাগত বটে—ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলেই আমার আনন্দ। প্রাণভরে ভিজব। এই যে এখন থালা-বাসন-গামলা নিয়ে বাড়ি ফিরব, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে, ঠাণ্ডা বাতাস আসছে পুব দিক থেকে।

আমাদের এই মাঠের যেন আদি-অন্ত নেই। এর বাইরে এখন আর দুনিয়াও নেই। ফেরার জন্য থালা-বাসন মাথায় নিয়ে মাঠে নামি। কিষেন চাচারা কাজে লেগে গিয়েছে ফের। একটা দুটো জমি পেরিয়েছি, নামল বৃষ্টি। মৃদু গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। দু-একবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল, পুবের বাতাসটা খুব জোরালো হয়ে উঠল। তারপর অঝোর বৃষ্টি। হাওয়া কমে এল। পৃথিবী যেন স্থির হয়ে আছে যাতে বৃষ্টির কোনো বিঘ্ন না ঘটে। আমি দাঁড়িয়ে যাই। মাথা থেকে বাসন-কোসন নামিয়ে ফেলি। পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে তাকাই। পুব-পশ্চিম এসব এখন আর নেই। এই পৃথিবী গোলাকার হয়ে গিয়েছে। কোনো অন্ত নেই—আবছা ঝাপসা। চোখে চলে না কাছে, কিন্তু গোটা পৃথিবী দেখা যায়। নিচের দিকটা ধোঁয়া-ওঠা সাদা, তারপর আকাশ পর্যন্ত শুধুই ঝাপসা সাদা। হাওয়া নেই, গাছপালা স্থির। কী যে তারা এখন মাথা পেতে নিচ্ছে, কে জানে। আমি ভিজছি আর ভাবছি বৃষ্টি কি আমার শরীরে হচ্ছে, না শরীরের ভেতরে যে আছে সে-ও ভিজছে, বৃষ্টি নিচ্ছে? আমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে বসে পড়লাম। আমাকে কোনো গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে বৃষ্টি, পুরোপুরি লুকিয়ে ফেলেছে, নিশ্চিন্তে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে। কোনো শব্দ নেই, শুধু জলভরা ধানের জমি থেকে চড়বড় আওয়াজ উঠছে। প্রাণ গ্রহণ করার সময় পৃথিবী এই রকম স্থির হয়েছিল? তবে তাল কাটল বৈকি দু-তিনবার। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথাও।

বৃষ্টি কমে এলে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকি। গাঁয়ের শুরুতে বড় বড় গাছপালা, বন-ঝোপ, ছোট-বড় দিঘি এসব থাকে। তালবন তো আছেই। মোড়লপুকুরের পারে যখন এসেছি তখন বৃষ্টি একদম থেমে গিয়েছে। এখানে জামগাছ আছে চার-পাঁচটা। প্রথম জামগাছটার তলায় এসে দেখি গাছ গা থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে ফেলছে আর বড় ডালগুলো পাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামের ভারে নুয়ে পড়ছে। লোকে বলে গাছপাকা জামে কালো হয়ে আছে, আমি দেখি কালো মেঘের ছায়া যেন জামগাছে। আর কি বাড়ি ফেরা যায় এখন? তরতর করে কাঠবিড়ালির মতো গাছে উঠে পড়লাম। দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে। তা যাক, নাই বা খেলাম দুপুরের ভাত। জাম খেয়েই পেট ভরিয়ে ফেলা যাবে। এসব কিন্তু তেমন ভালো জাম নয়, আমরা কাদাজামই বলি। বড় বড় রাস্তার দুই পাশে এমন জামগাছ থাকে। ছোট ছোট মুরকি জামটা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু মোড়লপুকুরে কাদাজাম হলেও খেতে খুব ভালো। ফুফু বকবে বটে, আয়, মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব—ভাত দোব, না দু-চুলোর ছাই দোব।

এখন ফুফু এ বাড়িতে নেই। শুধু মা আছে। তাকে আমার থোড়াই তোয়াক্কা। যা ইচ্ছে তাই করি। কোনো কোনো দিন খুব বিরক্ত লাগলে বলতাম—পানি আনতে পারব না, যা। মা তখন কাছে এসে খরখরে হাতে আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলবে, লক্ষ্মী বাপ আমার, পানি না আনলে চলে? সেটা আমিও বুঝতাম, পানি ছাড়া চলবে না। হাঁড়া কলসি আর বালতি কই?

আসলে পরিশ্রমে আমার কোনো কষ্ট নেই। খুব ছোটবেলা থেকে আমাকে বয়সের তুলনায় বড় বড় দায়িত্ব দিয়েছেন বাবা। একা একাই বর্ধমান শহরে যাই। ছোট চাচা বা বড় ভাইয়ের কাজে। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর দুটোয় আগুনজ্বলা কাঁচা সড়ক ধরে এক ক্রোশ হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যেত যেন। প্রায়ই সপ্তাহে দুই দিন নিগণের হাটে যেতাম। আমাদের দোকান থেকে সারা মাসের ডাল-নুন-চিনি, মিছরি-মসলা নিয়ে আসতাম শহীদুল আর আমি। ঠিক এক মাইলের মাথায় যে অশথ গাছটা আছে তার ছায়ায় খানিকক্ষণ বসে নিতাম। অবশ্য তখন দোকান থেকে চিনি-মিছরি যতটা দেওয়া হতো বাড়ি পর্যন্ত আসতে আসতে তার পরিমাণ বেশ খানিকটা কমে যেত। আমাদেরই পানির তৃষ্ণা বেড়ে যাওয়া ছাড়া তাতে আর কারো ক্ষতি তো হতো না।

বাবা আমাকে কাজ করতে দেখলে কিংবা কষ্ট সহ্য করতে দেখলে মনে মনে খুশিই হতেন। কোনো দিন আহা উঁহু করেননি। সেই বাবা বাড়িতে আছেন, প্রতিদিন পানি আমাকে তো আনতেই হবে। ওই প্রচণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভার কাঁধে নিয়ে বাড়ি আসার পথে আমাকে দেখে কেউ কেউ বলে উঠত, ছেলেটা আর বাড়বে না, বাঁট্‌কু হয়ে থাকবে। ওইটুকু ছেলে অত ভার বইলে কি বাড়তে পারে?

যতই হোক, আমি আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছি। ক্লাস এইটে উঠে শহীদুলটা মনে হয় স্কুল ছেড়েই দিল, সে আর আসছে না। নতুন হেডমাস্টার কর্মকারবাবুকে দেখলাম। কোঁচাটা লম্বা করে ঝোলানো। কিন্তু ধুতিটা খাটো করে পরা। গায়ে মোটা সাদা, বোধ হয় মার্কিন কাপড়ের পাঞ্জাবি, মাঝবয়েসী, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। ভারি ভালো মানুষের মতো চেহারা। এঁকে স্কুলের ছেলেরা, মাস্টারমশাইরা মানবে তো! আমার কিন্তু ভালোই মনে হলো। তিনি কোনো ক্লাস নিতেন বলে মনে পড়ছে না। কোনো ক্লাসই নয়। বি.এ পাস বটে, এবারে আর কোনো সন্দেহ নেই।

দুর্গাশঙ্করবাবু, কালিকিঙ্করবাবু আর সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইয়ের ক্লাসের ঘানি টানতে থাকি। দুর্গাশঙ্করবাবু খুব ভালো পড়ান তবে পড়ানোর ঢং-টা একটু সেকেলে। হবে নাই বা কেন? এত জানেন তিনি! সংস্কৃতটা খুব ভালো জানেন—বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, গীতা, ভাগবত—সে এক অবাক কাণ্ড! বাংলার তো কথাই নেই। পড়েননি হেন জিনিশ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালিপ্রসন্ন সিংহ, রাজনারায়ণ বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত এসে তবে পড়া শেষ। পুরনো কবিদের মধ্যে কালিদাস, বাণভট্ট, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, চৈতন্য চরিতামৃত, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত—এসব গুলে খেয়েছেন। তখনকার কালে আধুনিক কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী রায়, যতীন্দ্র বাগচী, এমনকি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত তাঁর প্রিয় ছিল। কিন্তু কিছুতেই নাম করতেন না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর পুরনোদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শুদ্ধ বাংলা শিখতে চাস যদি, তাহলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পড়্‌গা। বঙ্কিমের বাংলাতেও ভুল আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব নিরীহ মানুষ দুর্গাশঙ্করবাবু। বিশাল বপু, ছোট মাথা, খালি গা—তিনি বসতেন চেয়ারে। চেয়ারে ধরতে চাইত না তাঁকে আর এমন করে তিনি চেপে বসতেন যেন আর কখনো উঠবেন না এখান থেকে। ক্লাসে এসে চুপ করে একটু বসে থাকতেন। তাঁর চেহারা একটু ফ্যাকাসে শাদা, মনে হয় শরীরে তেমন রক্ত নেই। তারপর তিনি নিচের ক্লাস থেকে অমরেশের জ্যাঠতুতো বড় ভাই সমরেশকে ডেকে আনতে বলতেন। সে স্কুলের পাশেই নন্দীবাড়ির ছেলে। যা, বাড়ি থেকে জল এক গ্লাস নিয়ে আয়। সমরেশ এক ছুটে বাড়ি গিয়ে একটা সোনার গ্লাসে টলটলে জল নিয়ে আসত। আসলে কাঁসার গ্লাস, তেঁতুল দিয়ে এমন করে মাজা, দেখতে যেন সোনার গ্লাস। এমন গ্লাসে জল দেখলেই খেতে ইচ্ছে হয়। দুর্গাশঙ্করবাবু হাঁ করে গ্লাস তুলে জলটা ঢকঢক করে খেয়ে নিতেন, গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াতেন না।

আমাদের নতুন বাড়িতে শীতের শেষে টমেটো যখন এক রকম শেষ হয়ে যেত, তখন আধশুকনো লতানো গাছগুলোতে ছোট ছোট পাকা লাল টুকটুকে টমেটো থেকে যেত। প্রায় বড় কুল বা ডুমুরের মতো। আমাকে বলতেন, তোদের শুকনো গাছে টমেটো থাকলে নিয়ে আয়গে, যা। আমিও এক ছুটে বাড়ি গিয়ে টমেটো যা থাকত তাই তুলে ধুয়ে মাস্টারমশাইয়ের টেবিলে একটা কাগজের ওপর রাখতাম। তিনি টপাটপ একটার পর একটা টমেটো খেয়ে যাচ্ছেন আর অদ্ভুত সব ছড়া বলছেন, 'কদু, কুমড়ো রইল পড়ে তুশ্চুনারিয়েল ব্যাল, আজগুবি এই দুনিয়ার খেলা সরষের ভিতরেই ত্যাল, মানিকপীর ভব পাড়ে যাবার লা'। তবে ওসব তো ক্লাস নাইনে ওঠার পর। ক্লাস এইটে ইংরেজি আর অঙ্ক আমার বিভীষিকা হয়ে উঠল। অঙ্কটঙ্ক টুকে নিয়ে কালিকিঙ্করবাবুর হাত থেকে এক রকম পার পেয়ে যেতাম। তাঁর তর্জন-গর্জনে ভয় পেতাম না। কিন্তু ইংরেজির বেলায় তা হওয়ার উপায় ছিল না। দুর্গাশঙ্করবাবুই ইংরেজি পড়াতেন। শুধু গড়গড় করে রিডিং পড়লে আর মানে বললেই হবে না। বাংলার মতোই ইংরেজিতেও তাঁর খুঁটিনাটি ধরা চাই। বাক্য ধরে ধরে বলতে হবে সাবজেক্ট কী, এখানে এক শব্দের না পাঁচ শব্দের—সমাপিকা ক্রিয়াটা কই, ক্রিয়াটা সিংগুলার হবে না প্লুরাল হবে সেটা কী করে বুঝবি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেন্‌স কী, ক-রকম, জিরাডিয়াল ইনফিনিটিভ কী, বাক্যের প্রতিটি শব্দের পার্টস অব স্পিচ বল তো দেখি, ফ্রেজ ক-টা আর ক্লজ কটা। এ দুটোর মধ্যে তফাত কী। স্রেফ মেরে ফেলবে, বাপরে বাপ! পালানোর উপায় নেই, বাংলায় ভালো ছিলাম বলে আমাকে তিনি আবার পছন্দও করতেন খুব!

এবার তো মনে হচ্ছে অন্য কারণে স্কুল ছাড়তে হবে। মণীন্দ্রনাথবাবুর তাগাদা কমে এলেও আছে। হেডমাস্টার কর্মকারবাবু এসব কিছুই দেখেন না। খাটো ধুতি পরে লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ান। একদিন কানাঘুষা শোনা গেল, এই স্কুলের হেডমাস্টারেরও হায়াত লটকে এসেছে। এ গাঁয়ের গণ্যিমান্যি মানুষ মাস্টার তাড়াতে ওস্তাদ। কর্মকারবাবুকে নিয়ে কী বিষয়ে গোলমাল সে আমি জানি না। এর মধ্যে একদিন ফোর্থ পিরিয়ডের পরে টিফিন হবে হবে এই সময় লাইব্রেরি ঘরের দুই ধাপের সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে, তিনি হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি নিচের ধাপের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, তিনি ওপরের ধাপে। আমার দিকে একটু ঝুঁকে ডান হাতটা আমার কাঁধে রেখে তিনি বললেন, শোন, দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য যেমন আলাদা আলাদা সুযোগ-সুবিধার বিধান আছে, সেখানে তোর নামটা স্কুল থেকে পাঠানো হয়েছিল। আজ খবর এসেছে, তুই স্কুলে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পেয়েছিস। যত দিন এই স্কুলে পড়বি, তোকে আর বেতন দিতে হবে না। কামার মাস্টার আমার দিকে ঝুঁকে এই কথাগুলো বলছিলেন, আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলাম। কোনো দিন ভুলতে পারব না সেই মুখ। ভেজা ভেজা দুই চোখ থেকে মায়া আর ভালোবাসা ঝরছিল যেন। এইমাত্র চা খেয়ে এসেছেন। মুখ থেকে ভালো চায়ের সুন্দর গন্ধ টের পাচ্ছি।

এরপর বেশিদিন আর স্কুলে থাকতে পারেননি কামার মাস্টারমশাই। স্কুল ছেড়ে তিনি চলে গেলেন। অল্পদিন পরেই তাঁর জায়গায় এলেন বনমালী বাঁড়ুজ্জে। হ্যাঁ, এইবার একজন হেডমাস্টার এসেছেন বটে! দশাসই দারুণ স্বাস্থ্য তাঁর। ধবধব করছে গায়ের রঙ, বড় বড় দুই চোখ। মাঝবয়সী মানুষ। ইংরেজিতে বি.এ অনার্স পাস। কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সময়ে নাকি দারোগা ছিলেন। কী রাগী আর গম্ভীর মুখ রে বাবা! তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কারো কথা বলার সাধ্য কী? কাউকেই মানতেন না, গাঁয়ের মানুষদের স্কুলের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিতেন না। সাহসই হতো না কারো তাঁর কাছে ঘেষতে। যেখানে তিনি থাকতেন তার বাইরে এসে উত্তর দিকের দেয়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন তিনি। সবার সামনেই। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

স্কুল বসত সকাল ১০টায়। একদিন আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। তিন-চার মিনিট হবে। স্কুল বসে গেলেই বনমালীবাবু একটা বাঘের মতো স্কুলের চারপাশে হাঁটতেন। আমাকে তিনি দেখতে পেলেন ক্লাস নাইনের কাছে। সোজা এগিয়ে এসে আমার কান ধরলেন। তেমন জোরে নয়, নরম আঙুলে আলতো করে। নিয়ে গেলেন ক্লাস এইটে। তখন দুর্গাশঙ্করবাবু পড়াচ্ছিলেন। তাঁকে হেডমাস্টার মশাই বললেন, এই পিরিয়ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি চলে গেলেন, একবারও আমার নাম কিংবা পরিচয় জানতে চাইলেন না। দুর্গাশঙ্করবাবু বললেন, কী করবি বাবা, কোনো উপায় নেই, দাঁড়িয়ে থাক।

ক্লাস এইটের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা দিয়েছি। তারপর গরম আর বর্ষাকালের লম্বা ছুটির পর আবার স্কুল খুলেছে। আকাশে মেঘের রঙ এখন শাদা, ঘন নীল আকাশে তারা মাখনের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। রোদ ঝকঝকে দিন, বাতাস হালকা আর ঠাণ্ডা। সন্ধের পর থেকে শিশির পড়া শুরু হয়েছে। পুজোর ছুটি হবে হবে। স্কুল খোলার দিনে এইটে ফার্স্ট বেঞ্চির সেকেন্ড বয়ের জায়গায় বসেছি, বিনয় বসেছে ফার্স্ট বয়ের জায়গায়। তখন শহীদুল বোধহয় আর স্কুলে আসছে না, তবে আমার আর এক চাচাত ভাই গড়া স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তার বাবা রাজশাহীর চাকরি ছেড়ে বাড়ি এসে স্থায়ী হয়েছেন। একবার মনে হলো গড়া কী করছে দেখে আসি। সিক্সে এসে দেখি গড়ার সঙ্গে আর একটা ছেলে ঠেলাঠেলি করছে। যতবার সে বেঞ্চিতে বসছে, ততবার তাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে পুইনির ছেলেটা। আমি বললাম, এই ওকে বসতে দিচ্ছিস না কেন? সে বলল, বেশ করছি, তাতে তোর কী—এটা কি কারো কেনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গা? আমাকে দেখে গড়া আর একবার বসতে গেল, ছেলেটা এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিল, তোর বাবার জায়গা? আমার আর সহ্য হলো না। চুল ধরে ওকে টেনে তুলে আমি গড়াকে বসিয়ে দিলাম। ছেলেটা ছিচকাঁদুনে, কাঁদতে কাঁদতে সে হেডমাস্টার বনমালী বাবুর কাছে দৌড়ুল। স্কুলের অফিসঘরে এসে দেখছি তখনো মাস্টারমশাই তাঁর চেয়ারে বসেননি। সেখানে তাঁকে না দেখে সে স্কুলের লাগোয়া তাঁর মাটির ঘরের দিকে দৌড়ুল। মাস্টারমশাইকে কী বলতে কী বলবে ভেবে আমি পিছু পিছু ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বনমালীবাবু ধুতিটা পরে কোঁচাটা নাভির নিচে গুঁজে গেঞ্জিটা কেবল পরেছেন, এই সময়ে সিক্সের ছেলেটা গিয়ে ঘরে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ক্লাস এইটের এই আইজুল আমাকে মেরেছে, আমার সিট থেকে আমাকে ঠেলে মেঝেতে ফেলে দিয়েছে। কেন? শুধু এই কথাটা বলে হেডমাস্টার আমার দিকে এমন ভয়ঙ্কর চোখে তাকালেন যে আমি ভয়ে কেঁচো হয়ে আমতা আমতা করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার কাঁপা কাঁপা ঠোঁট থেকে আওয়াজ বেরুনোর আগেই বনমালীবাবু সোঁদরবনের বাঘ যেমন লাফিয়ে হরিণের ঘাড়ে পড়ে, তেমনি করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল চড় ঘুষি ঝড়ের মতো চালাতে লাগলেন। মনে হলো মেরেই ফেলবেন আমাকে। এক পশলা ঝড়-বৃষ্টির পরে আমাদের কাউকেই কোনো কথা না বলতে দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলেন। বেরিয়ে আসার সময় শুধু শুনতে পেলাম, ক্লাস এইটের ছেলে গিয়েছে ক্লাস সিক্সে, বদমাশ! আমি ভাবতে ভাবতে আমার নিজের ক্লাসে গিয়ে ঢুকলাম। এ কীরকম বিচার হলো! আমাকে একটা কথা পর্যন্ত বলতে দিলেন না! এই নিয়ে দু-দিন হলো তাঁর শাস্তি দেওয়া আমার একটা কথাও না শুনে।

যাই হোক, এইটে তো ভালো করছি না। ইংরেজি কিছুই শিখতে পারিনি। অঙ্কে তো বরাবরই আমি হাঁটুভাঙা। শুনতে পাচ্ছি নাইন-টেনে ইংরেজি পড়াবেন বনমালীবাবু নিজে। স্কুলে আর বেতন না দিতে হলেও দেখছি লেখাপড়া ছাড়তে হবে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা তো যায় না।

শরতের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হলে হাতে বেশ সময় নিয়ে দুলাভাই এলেন। এবার আর টানা-হেঁচড়া করতে হয় না ওঁদের খাবার-দাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে, পুরনো বাড়িতে আমরা সবাই যখন ছিলাম তখনকার মতো। আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি। অভাব-অনটনও এখন আর নেই আগের মতো। গাঁয়ের সবাই জানত সারা এলাকার মধ্যে আমার জামাইবাবু ছাড়া ইংরেজিতে এম.এ. পাস আর একজনও নেই। হিন্দু-মুসলমান সবার কাছেই তাঁর সম্মানের অন্ত নেই। কথা বলতে ভয় পেত সবাই। গাঁয়ে এলে তাঁর মেশামেশি আমাদের স্কুলের কয়েকজন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গেই। এবারের ছুটিতে হেডমাস্টার বনমালীবাবু বাড়ি গিয়েছেলেন, তাঁর সঙ্গে দুলাভাইয়ের পরিচয় হয়নি, পরেও হয়তো কোনোদিন হয়নি। ভাগ্যিস হয়নি, তাহলে কী টক্কর লেগে যেত কে জানে? বনমালীবাবু আমাদের স্কুলে বেশিদিন ছিলেনও না। এর মধ্যে গাঁয়ের দু-তিনজন মাতব্বর মানুষকে তিনি রীতিমতো অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গাঁয়ের গোপী নন্দী ছিলেন বি.এ. পাস। শান্তিপ্রিয় মানুষ তিনি, চাকরি করতেন বলগনা স্কুলে। একবার তিনি নাকি কী একটা কথা বলতে বনমালীবাবুর কাছে এসেছিলেন। কী কথা হয়েছিল তা তো আর জানি না। সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হয়, স্কুলেরই স্বার্থ নিয়ে। দু-একটা কথার জবাবে গোপীবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বনমালীবাবু বলেন, গেট আউট ফ্রম মাই স্কুল কম্পাউন্ড, শালা! চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল কথাটা। গোপীনাথবাবু ঘাড় নিচু করে সুড় সুড় করে বেরিয়ে গেলেন স্কুল থেকে। তাই বলছি দুলাভাইয়ের সঙ্গে বনমালীবাবুর যে আলাপই হয়নি, সে বোধহয় ভালোই হয়েছিল। দুলাভাই মোয়াজ্জেম হোসেন, ডাকনাম মাজেম, অপ্রতিহত খ্যাতি নিয়ে গাঁয়ের সকলের মাথার মণি হয়ে থাকলেন। আমাদের বাড়িতে খুব আনন্দ। আমার তিরিক্ষি মেজাজের বাবা বাড়ির জামাইয়ের কাছে একেবারে ভিন্ন মানুষ। কতরকম খাবার আয়োজন যে করতেন! দরকার হলে জমি পর্যন্ত বেচে দেবেন। কিন্তু তিনি তাঁর সামনে আসতেন না কখনো। দুলাভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কথা প্রায় হতোই না, ওঁর সামনে তিনি কেমন যেন লাজুক হয়ে যেতেন।

আমি আর আমার দু-একজন চাচাতো ভাই সব সময় তাঁর পিছনে ঘুর ঘুর করতাম। আমাদের সঙ্গে গাঁয়ের স্কুলের কয়েকজন হিন্দু ছাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আমার কয়েকজন বন্ধু। এর মধ্যে নন্দীদের সমরেশ ছিল আমার সব সময়ের সঙ্গী। সমরেশ আমার সেই বন্ধু অমরেশের জ্যাঠতুতো ভাই। এদের মধ্যে সমরেশ একটু বড়ো, অমরেশ ছোট। সে দু-দিনের জ্বরে মারা যাবার পরে তার দাদা সমরেশের সঙ্গে কবে যে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি জানতেও পারিনি। সব সময়েই দুজনে একসঙ্গে থাকি। সকালে দুপুরে রাতে বাড়িতে খেতে যাওয়া ছাড়া বাকি সময়টা সে আমার সঙ্গেই থাকে। একদল বন্ধুদের মধ্যেও আমরা দুজন আলাদা হয়ে যেতাম, বনে-বাদাড়ে, নির্জন দিঘির পাড়ে গাছতলায় বা ঝোপের আড়ালে দুজনে গলা জড়াজড়ি করে বসে থাকতাম। গুলতি দিয়ে পাখি মারার জন্যে জায়গায়-বেজায়গায় স্থানে-অস্থানে-কুস্থানে সারা গাঁ চষে বেড়াতাম। সমরেশের কাজ ছিল পাখি খুঁজে আমাকে দেখিয়ে দেওয়া। সে নিজে কোনোদিন গুলতি হাতে নিত না। নিজে একবারও গুলতি চালাত না।

এখন দুলাভাইয়ের সঙ্গে আমি সবসময়ে থাকি—সে-ও থাকে সঙ্গে। অন্য ছেলেদের মতো সে-ও দুলাভাইয়ের অগাধ বিদ্যায় মুগ্ধ। অন্যেরা কাছে আসতে ভয় পেত, সমরেশের সে ভয় ছিল না। এদিকে দুলাভাইয়ের পাখি শিকারের খুব শখ। বাড়িতে যে একনলা দামি একটা বন্দুক ছিল, সেটা ছোঁয়া এতদিন বারণ ছিল। বারণ মানে বারণ। স্পর্শও করতে পারতাম না। এটা দিয়ে বাবা জ্যাঠা যখন শিকার করতেন মাঝে-মধ্যে, তখন আমার জন্মও হয়নি। অপশনের চাকরি ছেড়ে ছোট-চাচা যখন বাড়িতে ফিরে এলেন তখন তিনি মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে শিকারে বেরুতেন মহা উৎসাহে। তবে বেকার চাচার উৎসাহে একদিন ভাটা পড়ল, সংসারে ভাঙন দেখা দিল, ছোট চাচা সব ছেড়ে দিলেন। বন্দুকটা হয়ে গেল বনেদি বাড়ির চিহ্ন। মাঝে মাঝে ওটা নিগণের দোকানে নিয়ে যাওয়া হতো—সে-ও মানুষের মনে একটা সম্ভ্রম জাগানোর জন্যে। এতদিন পরে দুলাভাইয়ের শিকারের শখ থাকায় আবার সেটার খোঁজ পড়ল। বন্দুকের নলের ভিতরটা পরিষ্কার করার জন্যে যে বিশেষ তুলো লাগানো লাঠিটাকে এতদিন চোখেই দেখিনি, সেটাকে বের করা হলো। গান-অয়েল ন্যাকড়া ভেসলিন ইত্যাদি সরঞ্জাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে বাবা নিজেই বসে গেলেন বন্দুক পরিষ্কার করতে। নলের ভিতরটা এখন ঝকঝক করছে, ধুলো-ময়লা ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। বন্দুকটাকে তিন খণ্ড করা হচ্ছে—কুঁদো, কাঠ-হাতল, নল এইসব। ঘোড়ায় তেল, ট্রিগারে তেল দিয়ে সব পরীক্ষা করা হচ্ছে। বহু পুরনো দু-চারটে এলি, রেমিংটন এক্সপ্রেস, বাঘ-মারার ডবল বি, বড়ো পাখি মারার জন্যে এক নম্বর দু-চারটে টোটা আর ছোট পাখির জন্যে ছয় সাত আট নম্বর কিছু টোটা বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। সেগুলো নিয়েই শিকারে বেরুনো গেল। তারপর থেকে নিয়মিত নতুন টোটা কেনা হতে লাগল বর্ধমান শহর থেকে।

আমরা দলবল নিয়ে বেরিয়ে যেতাম বেলা ন-টা দশটার দিকে। আমি আর সমরেশ তো আছিই, অমরেশের ছোটভাই হেলা, তারপর এককড়ি, নরা, মানিক, গোপেশ্বর আছে, আমার চাচাতো ভাইরা আছে, গাঁয়ের রাখাল ছেলেগুলো আছে। সে এক বিরাট দঙ্গল। মারা হবে হয়তো একটা ঘুঘু, না হয় একটা বক কিংবা তেঁতুলগাছে চুপচাপ বসে-থাকা মায়াবী কালো চোখের ওয়াক। এসব হচ্ছে গাঁয়ের আশেপাশেই। গাঁয়ের একবারে লাগোয়া দিঘি, তার পাড়ে বড়ো একটা বটগাছে বসে হরিয়াল। তারা কোনো শব্দ করে না, তবে বটের ঘন পাতার আড়ালে থেকে অবিরাম নড়াচড়া করে, কিছু কিছু লাল রঙের বটফল টুপটাপ ঝরে পড়ে। কালেভদ্রে দু-একটা পুরনো পুকুরে দু-একটা ছোট বালিহাঁস এসে বসে। এরপরে মাঠের শুরু। সেখানে পনেরো বিশটা করে এক একদল হট্টিটি এক ঠ্যাঙে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এরা অবধ্য, কেউ মারে না।

ধু ধু মাঠ শুরু হয়। এখন শরৎকাল, মাঠ ধু ধু নয়। বাতাস ঠাণ্ডা আর শরতের নীল আকাশ। পৃথিবী ভরে আছে নীল রঙ মেশানো শাদা রোদে। সমস্ত মাঠই ধানে ভরা, হাত দুই লম্বা হয়েছে ধানগাছগুলি। তার মধ্যে লুকিয়ে পড়লে কেউ খুঁজে বের করতে পারত না। জমিগুলো পানিতে ভরে টইটুম্বুর—বর্ষার ঘোলা জল এখন কাচের মতো পরিষ্কার। আকাশ আছে তার নীল নিয়ে, শরতের মাঠ আছে তার সবুজ নিয়ে। পথ-আলগুলোর পায়ে-চলা পথ বিধবার ধবধবে সিঁথির মতো শাদা—দু-ধারে দূর্বা আর ময়ূরকণ্ঠী ঘাস। জমির পানির আয়নার নিচে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে ছোট ছোট পুঁটি মাছ, ছেলেপুলের দলবল নিয়ে মাঝারি সাইজের মা শোলমাছ। অন্য সব আলগুলো ঘন ঘাসে ঢাকা। হঠাৎ পায়ের কাছে ফোঁস করে উঠে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে কুচকুচে কালো কেলে সাপ। কেলে, কেউটেও বলে কেউ কেউ। আসলে গোখরো সাপ, ঘন কালো রঙের, এদের মাথায় শুধু গো-ক্ষুর চিহ্নটা নেই। সবটাই কালো। হয়তো এরই দু-চারটে ছানা জমিতে কিলবিল করছে, কাছে গেলে ছোট ছোট ফণা তোলে মাথা উঁচু করে। এদের বিষ নাকি বড়োদের চেয়ে মারাত্মক। কত লোক মারা যাচ্ছে প্রতি বছর। সাপের দেখন, ললাটের লিখন। কাজেই ওদের দেখলেই মারতে হয়। কোমর ভেঙে মাথা গুঁড়ো করে তবে আমাদের শান্তি। শিকারে বেরুলে আলপথ বাদ দিয়ে সরু-মোটা সবরকম আল ধরে হাঁটতে তো হবেই।

শিকারের সময় হচ্ছে বর্ষা আর শরৎ। ঐ সময়ে বড়ো পাখিগুলো আসে। শামখোল, কাস্তেচোরা, মানিকজোড়। মানিকজোড়গুলো দুটো একসঙ্গে থাকে। শামখোল দলেও থাকে, একা একাও চরে বেড়ায়। খুব সকালে এলে এদের লম্বা লম্বা পা ফেলে চরে বেড়াতে দেখা যায়। খানিকটা বেলা হলে আলের ওপর, জলকাদায় চষা জমির মধ্যে দশ-পনেরোটা স্থির হয়ে থাকে। একটু বোকা পাখি, মারা পড়ে বেশি। এক গুলিতে একটা, দুটো, ভাগ্য ভালো হলে তিনটেও মারা পড়ে। কাস্তেচোরা আগাগোড়া ধবধবে শাদা, কাস্তের মতো বাঁকা ঠোঁট, আকারে শামখোলের চেয়ে ছোট, ওজনে সমান কিংবা একটু বেশি। একা থাকলে মারা খুব কঠিন, বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে আসার আগেই উড়ে যায়। শামখোলের দলের মধ্যে একটা-দুটো থাকলে বা সাত-আটজনের দলে থাকলে কখনো কখনো মারা পড়ে। মানিকজোড়ের জন্যে মানুষের একটু মায়া থাকে। দাঁ-দের একটা বিশাল কদবেল গাছে একজোড়া মানিকজোড় থাকে। কী জানি এখানে যদি সেই দুটিই বসে থাকে? বর্ষাকালে আর একটা পাখি দু-একটা দেখা যায়। তার নাম সুয়োতা—ছাই ছাই রঙ, হালকা গড়ন, উড়লেই মনে হয় পাখিটা কুঁজো। লেখাপড়া-জানা মানুষরা বলত অলীক পাখি—পাখিই নয়, কোনো মানুষের অভিশপ্ত আত্মা। তার অনেক কাছে যেতে হয়, তারপর বন্দুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুললেই ওড়ে। খানিকটা দূরে গিয়ে আবার বসে। হেঁটে সেখানে পৌঁছে বন্দুক তুলতেই আবার উড়ল। এমনি করে এই একটি পাখিই মাইলের পর মাইল শিকারিকে হাঁটায়। ঘোরে পড়ে যায় শিকারি— তাকে নেশায় পেয়ে বসে—সারা দিন সে ওর পিছু পিছু ঘোরে। শেষ পর্যন্ত সূর্য ডুবে যাবার সময় টানা উড়তে থাকে। ছাই রঙের পাখি; একটু দূরে গেলেই আর দেখা যায় না। তারপর একটা বিন্দু হয়ে দূর আকাশে মিলিয়ে যায়। কোনো শিকারিই সুয়োতার পিছু পিছু ছুটতে চায় না। ঐ মৃত আত্মার সঙ্গে পারা যাবে না।

আমরা দল বেঁধে ঘুরতে থাকি। প্রথম দিকে কলবল করে কথা বলি, তারপর কথা কমে আসে, শেষ পর্যন্ত বন্ধই হয়ে যায়। সবাই কেমন আলাদা আর একা হয়ে যায়। দু-একজন ফিরে যায়। আমরা পশ্চিমের প্রকাণ্ড মাঠ শেষ করে অন্য একটা গাঁয়ে। সেখানকার পুকুর, বড়ো বড়ো গাছ, ঝোপঝাড়, পানিফল, পদ্ম আর শাপলাভরা পুকুর, তালগাছের সারি। তন্ন তন্ন করে খুঁজে গাঁ-টা পেরিয়ে আবার একটা বিরাট মাঠে পড়ি। সেটাও ধু ধু করার কথা কিন্তু এখন যে শরৎকাল!

এখন খুব একটা দূরের বোধ হচ্ছে। বাড়ি থেকে, গাঁ থেকে কতদূরে চলে এসেছি। মাঠে একজনও মানুষও নেই। যদি থাকে তাহলে লুকিয়ে। জমিতে পানি রয়েছে, ধানগাছ বাড়ছে। মানুষের হাতে কাজ কিছু নেই। তবে শেষ নিড়ানির কাজ একটা থাকে। হয়তো এখানে সেখানে ধানগাছের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে নিড়াচ্ছে কিছু মানুষ। কিন্তু তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কী নির্জন যে লাগছে! অথচ এসেছি হয়তো মাইল চারেক! ঐ বিরাট শ্যাওড়ার কাছে যাওয়া যাবে না—ওর গোড়ায় জড়িয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড অজগর, ঐ তালগাছটার নিচে বনকুল শেয়াকুল বঁইচির কালো ঝোপে চন্দ্রবোড়া সাপেরা কিলবিল করছে—নানা জায়গায় গেছোভূত, মাছখেকো শাকচুন্নি আর কঙ্কাকাটা ভূত তো আছেই। রবীন্দ্রনাথের বড়ো একটা কবিতার শেষে আছে, 'প্রান্তরের শেষে কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে'। কতদূর প্রান্তরের শেষ!

দলটা বেশ ছোট হয়ে এসেছে। শত খোঁজাখুঁজি করেও এই মাঠে একটা পাখিও মিলল না। আজ দেখছি খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরেই আসছি, যে গাঁটা পেরিয়ে এই মাঠে এসেছি, ফিরছি সেই গাঁয়ের পাশ দিয়ে একই পথে। যাবার সময় শাপলাভরা যে পুকুরটা দেখে গিয়েছিলাম, এখন তার পশ্চিম পাড় ধরে ফেরার সময় দেখছি সেখানে চারটে বড়ো বালিহাঁস বসে রয়েছে। আমরা সবাই বটগাছটার আড়ালে চলে গেলাম। বন্দুকে টোটা ভরে একেবারে ঘোড়া তুলে দুলাভাই আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেলেন। হাঁস চারটে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমাদের তর সইছে না, কখন তিনি বন্দুক তুলবেন, নিশানা ঠিক করে নিয়ে ফায়ার করবেন। মনে হয় এক যুগ চলে গেল, জুতসই জায়গা আর পাচ্ছেন না দুলাভাই। শেষ পর্যন্ত বন্দুক তুললেন, নিশানা করলেন, ফায়ারও করলেন। প্রচণ্ড গুড়ুম আওয়াজ, একটুখানি শাদা ধোঁয়া—তারপরে দেখলাম দুটো বালিহাঁস উড়ে গেল আর দুটো পানিতে মুখ গুঁজে ভাসছে। তার মানে ও-দুটোর হয়ে গিয়েছে। এখন ঐ কালো কুচকুচে অথৈ জলে নামবে কে? আমিই বা কী করে নামি? ফর্শা সমরেশ আছে খালি গায়ে, একটা হাফপ্যান্ট মাত্র পরে। একটু পরেই দেখি, সে প্যান্টটা খুলে ফেলল, পুরো ন্যাংটো হয়ে, আমি নামছি বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। খানিকটা সাঁতরে, খানিকটা ডুবসাঁতার দিয়ে পদ্মপাতা, শাপলা পাতা সরিয়ে সে হাঁসদুটোকে তুলে নিয়ে এল। মুখে তার কতই না তৃপ্তি! চুল বেয়ে, মুখ থেকে, সারা শরীর থেকে টপটপ করে জল ঝরছে, ন্যাংটো আছে তাতে একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই।

জবাই করতে হয় তাই করা। হাঁসদুটো পুকুরেই মরে গেছে। শেষ পর্যন্ত সারা দিনের খাটনিটা বৃথা গেল না। খালি হাতে ফিরতে হলো না। হাত দিয়ে মাথা মুখ মুছে প্যান্ট পরে নিল সমরেশ, হাঁসদুটোর ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিলাম আমি। কত উঁচুতে আকাশে লম্বা ছাইরঙের গলাটা এগিয়ে দিয়ে ক্যাঁক ক্যাঁক আওয়াজ করে যে অধরা পাখিগুলো দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, শরৎ আর শীতকাল ছাড়া যাদের দেখাই যায় না, তাদের দুটো এখন গলা-ঠোঁট দোলাতে দোলাতে আমাদের বাড়িতে যাচ্ছে। তাদের পাখা পাখনা নাড়িভুঁড়ি কোথায় চলে যাবে। কেউ কোনোদিন তাদের মনে রাখবে না। যে দুই সঙ্গী উড়ে গিয়েছিল, তাদের কোনোদিন মনে পড়বে কি? তাদের ঝাঁককে বলবে কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারই একদিন হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সকালবেলায় নিচের পাকা বারান্দায় পড়তে বসেছি। হেমন্তকালের আমেজ এসে গিয়েছে, বাতাসে সামান্য শীত শীত ভাব। সকালের রোদটা মিষ্টি লাগছে। ভাবছি ভূগোলের পড়াটা একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে যাব। গাঁয়ের পাশের একটু উঁচু রবিশস্যের মাঠে আউশ ধান পেকে উঠেছে কিংবা পাকছে। আল ধরে হাঁটলেই ধানের গন্ধ পাওয়া যায়, পাকা কাটা ধানের একরকম গন্ধ। তেজে বেড়ে উঠেছে বলে কাটাধানের নাড়াগুলো কালো—দু-চারটে শীষ পড়ে আছে, এখনো শিশিরে ভেজা। কুড়িয়ে নিতে ভালো লাগে। আউশ ধানের শীষগুলো বড়ো বড়ো হয়, ধানের রঙও দু-তিন রকম হয়। যেসব জমির ধান এখনো কাটা হয়নি, আলের দু পাশের জমির বড়ো বড়ো শীষগুলো শিশির আর ধানের ভারে নুয়ে পড়েছে আলের উপর। চলতে গেলে পা ভিজে তো যায়ই, ছড়াৎ ছড়াৎ করে চাবুকও মারে। প্রথম দিকে ভালোই লাগে, তারপর ঝাঁটা মারার মতো ব্যথাও লাগে।

এই সময়টা আউশের মাঠে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে। ভূগোলের পড়াটা আর একটু পড়ে উঠতে যাচ্ছি—দুলাভাই বললেন, তোমার ইংরেজি বইটা আমার কাছে একটু আনো তো। তিনি মাদুরে বসে চা খাচ্ছিলেন। ইংরেজি পড়া আমার সকালেই হয়ে গিয়েছে। বইগুলোর তলা থেকে ইংরেজি বইটা বের করে নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। বইটা নেড়েচেড়ে একটু দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পড়তে-টড়তে পারো তো?

ঘাড় হেলিয়ে বললাম, পড়তে পারি ঝর ঝর করে।

আজকের পড়াটা রিডিং পড়ে আমাকে একটু শোনাও তো!

সে কথা আর বলতে—আজকের পড়াটা চট করে বের করে রিডিং পড়তে শুরু করলাম। আমার গড় গড় করে পড়া শুনে তিনি যেন একটু অবাকই হলেন, বেশ! দু-চারটে উচ্চারণ ভুল বলেছো। এখন যা যা পড়লে তার মানে বলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানেটা এখনো পড়া হয়নি। রেতে মানে-বই পড়ে মুখস্থ করে নেব।

এখন পারবে না?

না।

যে ইংরেজিটা ঝর ঝর করে পড়লে তার মানে বোঝো না?

না তো।

একটুও না?

না, মানে-বই মুখস্থ না করে কী করে বলব?

দু-একটা শব্দেরও না?

দু-একটা শব্দের মানে হয়তো জানি। তাতে আমার লাভ কী?

অক্ষর চেনো তো?

আমি একটু হেসে বলি, অক্ষর না চিনলে পড়লাম কী করে?

তোমার গ্রামার বই আছে?

আছে একটা, আগাগোড়া ইংরেজিতে লেখা। কিছুই বুঝতে পারি না, পড়িও না।

নাম বলতে পারবে?

হ্যাঁ, ঠিক হবে কিনা জানি না। ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত একটাই বই তো?

বলো তো।

খটোমটো নাম—কোনোদিনই খুলিনি, পড়া বইগুলোর নিচে আছে।

কী নাম?

নেসেফিল্ড না নেসেফিয়েল্ড কী যেন নাম। আলম ভাইয়ের বই, সে-ও বোধহয় কোনোদিন খোলেনি, নতুনই আছে।

যাও, ওপর থেকে খুঁজে নিয়ে এসো। যে দুটো নাম বললে তার একটাও ঠিক নয়। ওটা বইয়ের নাম নয়, লেখকের নাম। আমরাও ছোটবেলায় ঐ বইটাই পড়েছি। নেসফিল্ডের গ্রামার—নেসফিল্ড। যাও নিয়ে এসো। এখন আর বাইরে যাবে না। আমার কাছে আজ ঘণ্টা দুয়েক থাকতে হবে। যাও, নিয়ে এসো।

কী আর করি, অগত্যা ওপরে গিয়ে খুঁজে পেতে বইটা নিয়ে এলাম। হাতে নিয়ে খুব যত্ন করে তিনি বারকতক মুছলেন, ফুঁ দিয়ে ধুলোটুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাড়লেন, তারপর কিছু পাতা ওল্টালেন। শেষে একপাশে বইটা সরিয়ে রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এ তো দেখছি কেনার পর পাতাও ওল্টানো হয়নি। থাক, এ বই তোমাকে পড়তে হবে না, পড়ে কোনো লাভও হবে না, কিছুই বুঝবে না। এ বই যাতে বুঝতে পারো, সেজন্যে তোমাকে এখন তৈরি হতে হবে।

তোমাকে কিছু কথা বলছি, শোনো। এই যে কথাগুলো বলছি তা তোমাকে চিরকাল মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে তুমি বাধ্য। কারণ এগুলো তোমার অভ্যেসে চলে যাবে। বাংলা যেমন কবে শিখেছো মনে নেই, মনে রাখার দরকারও নেই অথচ বাংলাটা তোমার-আমার কাছে ডালভাত হয়ে গিয়েছে। ইংরেজিও তোমার কাছে তেমনি ডালভাত করে ফেলতে হবে।

তারপর তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। অনেক দিন পরে আমার মনে হয়েছিল, এখন তো মনে হয়ই, সেদিন তিনি আমার মধ্যে, আমার বোঝার ক্ষমতার মধ্যে একটা বোমা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হলো। শুরুটা আস্তে আস্তে। মগজ নড়ে উঠল, এখানকার জিনিশ সরে ওখানে গেল। বুদ্ধিও তাই, প্রথমে কাঁপতে শুরু করল, তারপর দুলতে, তারপর জোর ঝড়-বৃষ্টিতে সব ওলটপালট হয়ে গেল। প্রথমেই বোঝা গেল অক্ষর যখন চেনা হয়ে গিয়েছে, তখন অক্ষর দিয়েই শব্দ তৈরি হয় এ কথাটা আর বলার দরকার নেই। একটিমাত্র অক্ষর দিয়ে শব্দ কিংবা অনেক অক্ষর দিয়ে হতেই পারে কিন্তু অক্ষরের পর অক্ষর থাকলেই শব্দ হয় না। একটা জিনিশ লাগবে—একটা মানে বা অর্থ। অর্থ ছাড়া শব্দ হয় না। এবার বলা যাক, শব্দের সীমাসংখ্যা নেই। একটা ভাষার সমস্ত শব্দ কিংবা প্রায় সমস্ত শব্দ পাওয়া যায় সেই ভাষার ডিকশনারিতে। ইংরেজি ভাষার অনেক চমৎকার চমৎকার ডিকশনারি আছে। প্রতিদিন আমরা যে কথাবার্তা লিখি বা বলি তাতে ডিকশনারির মোট শব্দের সামান্যই লাগে। ধরা যাক দশ ভাগের এক ভাগ। এগুলো হলো প্রত্যেক দিনের দরকারি শব্দ। এছাড়া বিশেষ কাজকর্ম, কথাবার্তা, লেখার জন্য আরো অনেক শব্দ লাগে—সেসবের বিশেষ কারণ ছাড়া ব্যবহার নেই। এইজন্যে, দরকারে-বেদরকারে অনেক শব্দ খুব কাজের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রকম করে শেষ পর্যন্ত ডিকশনারির অতি সামান্য কিছু শব্দ হয়তো কাজেই আসে না তবে থাকে সবই। খুব ভালো একটা ডিকশনারি কিনতে হবে, সব সময় কাছে রাখতে হবে। ডিকশনারি নাটক নভেল ইতিহাস ভূগোল নয়—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত টানা কেউ পড়ে না। একমাত্র দরকারেই (মানে, বানান, উচ্চারণ জানার জন্যে) খুলে দেখে নিয়ে আবার রেখে দেয়।

কথাগুলো গিলছিলাম তবে এসব কথা আমি মোটামুটি জানি। এখন আর একটু পরিষ্কার হলো। এখন কথা হচ্ছে, শব্দ দিয়েই যেহেতু কথা বা বাক্য হচ্ছে, অন্য উপায় যখন আর কিছু নেই, তখন শব্দ কতরকম হতে পারে তা একটু জানতে হবে বৈকি! শব্দগুলোকে ভাগ ভাগ করে ফেলতে হবে। এই কথাগুলিই গ্রামারের প্রথম দিকে থাকে। গড়পড়তায় ইংরেজি ভাষার শব্দের সাত রকম ভাগ। তাদের সব গালভরা নাম—নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেকটিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন—এই রকম মুখস্থ করার ব্যাপার নয়, একটু বুঝে নিতে হবে। যেমন একটা বস্তু, প্রাণী বা গুণের নাম বোঝালেই সেই শব্দটা হচ্ছে নাউন—যেমন কলকাতা, মানুষ, মাটি, দয়া—এগুলো সব নাউন। 'কলকাতা' একটা শহরের নাম যেটা আর কোথাও নেই। 'মানুষ'-ও একটা বিশেষ প্রাণীর নাম, পৃথিবীতে কোটি কোটি আছে, 'মাটি'—প্রাণীর থেকে আলাদা কিন্তু পৃথিবীতে প্রচুর আছে, 'দয়া' একটা বিশেষ গুণের নাম—ধরাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না। নাউনের এরকম ভাগ নিয়ে এখন ভাবার দরকার নেই— মোটামুটি কথাগুলোকে একটু মনে রাখলেই চলবে।

এই কথাগুলো বলতে তিনি সময় একটু বেশি নিলেন বটে! সরু, মিষ্টি, কমজোরি গলায় কথা বলেন দুলাভাই। প্রত্যেকটি কথা কেমন যেন মনের মধ্যে বসে যায়, নরুণ দিয়ে দাগ কাটার মতো। যত সরুই হোক কোনোদিন মুছবে না। এই কথাগুলো বলে আবার তিনি শুরু করলেন, হলো নাউনের কথা, এবার প্রোনাউন। প্রোনাউন হলো ঠিক নাউনের মতোই, শুধু নাউনের বদলে বসে—কাজ একটু আলাদা। ধরো, তোমার নাম হলো 'কালো'। এখন যদি বলি, 'কালো' বেলা দশটায় স্কুলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কালো' টিফিনে বাড়ি আসে ভাত খেতে। 'কালো' টিফিনে আধঘণ্টা সময় পায়। 'কালো' যদি দেখে তখনো ভাত হয়নি, 'কালো' খুব রাগ করে। এতবার 'কালো' 'কালো' শুনতে ভালো লাগছে? 'কালো' প্রথমবার বলে তারপর যদি বলি, সে টিফিনে বাড়ি আসে—তাহলে সে বলতে কাকে বোঝাবে? কালোকেই বোঝাবে। 'কালো'র বদলে 'সে'। এই 'সে'টা প্রোনাউন। নাউনের বদলে বসে, সেইজন্যে প্রোনাউন—'প্রো' মানে 'মতো'—'প্রায় একই'। 'প্রোনাউন' বুঝলে তো? এবার 'অ্যাডজেকটিভ'। অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে নাউনের গুণ প্রকাশ। যেমন 'মাঠ' কথাটার আগে বললাম 'ভালো' মাঠ বা 'এবড়ো-খেবড়ো' মাঠ বা 'সবুজ মাঠ'—এগুলো তাহলে নাউনের গুণবাচক, ভালো গুণ মন্দ গুণ যাই হোক না। তারপর 'অ্যাডভার্ব' গুণের গুণবাচক। কী রকম? 'খুব' ভালো মাঠ, 'খুব সবুজ' মাঠ, 'যা-তা' এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। 'খুব', 'খুব,' 'যা-তা' এগুলো হলো অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্বের আরো বহু ব্যবহার আছে। সেসব পরে হবে। 'অ্যাডভার্ব' 'ভার্ব'-এরও গুণ প্রকাশ করে। এরপর আর দুটো কথা বলব। 'ভার্ব' সম্বন্ধে একটা কথা আর 'প্রিপজিশন' নিয়ে। 'ভার্ব' হলো ক্রিয়া, কাজ—মানে 'করা', 'বলা', 'হাঁটা', 'হওয়া'—এইসব। শেষ কথা, 'প্রিপজিশন' মানে অবস্থান—'ভিতরে', 'বাইরে', 'উপরে', 'নিচে', 'পাশে', 'সময়' এরকম। আর দু-একরকম শব্দ আছে, সে পরে বলা যাবে বা বলার দরকার হবে না, তুমি নিজেই বুঝবে। আসলে খুব ভালো করে বুঝতে হবে 'ভার্ব' নিয়ে। একটিই কথা এখন বলে রাখি, এই কথাটা মাথায় পেরেক মেরে ঢুকিয়ে রাখো। কথাটা হলো, 'ভার্ব' ছাড়া কোনো বাক্যই হবে না। ব্যস, আজ আর কোনো কথা নয়। তুমি বাইরে যাবে তো যাও। আবার কাল ঠিক এই সময়। শুধু 'ভার্ব' নিয়েই তিন-চার দিন কথা বলতে হবে।

মোটামুটি ভালোই বোঝা গেল কথাগুলো। মূল কথাগুলো মগজে গেঁথে গেল। বাকি টুকটাক, ভাগ-টাগ পড়তে পড়তেই শিখে ফেলব। কিন্তু কে জানত ভার্ব নিয়ে এত কথা? পরের তিন-চার দিন ভার্ব নিয়েই কেটে গেল। বুঝতে পারলাম এই তিন-চার দিনে যত কথা দুলাভাই তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরু মিষ্টি কমজোরি গলায় বললেন, সেগুলো পুরোপুরি না বুঝলে বা কাজে লাগাতে না পারলে ইংরেজি শেখাই হবে না। উঃ, এত কথা ভার্ব নিয়ে? শুরু করার আগে দুলাভাই ইংরেজি শব্দের যেসব ভাগের কথা বলেছিলেন, তার বাংলা শব্দের ভাগগুলোর নাম একবার বলে দিলেন আর এই দুই ভাষার ব্যাকরণ নিয়েও দু-এক কথা বললেন। 'নাউন'—বিশেষ্য, 'প্রোনাউন'—সর্বনাম, 'ভার্ব'—ক্রিয়া, 'অ্যাডজেকটিভ'—বিশেষণ, 'অ্যাডভার্ব'—বিশেষণের বিশেষণ, আর খুব দরকারি 'ক্রিয়ার বিশেষণ', অব্যয়-টব্যয় যা যা ছিল।

এখন ক্রিয়া তো বুঝলাম যে কাজ করা, ক্রিয়া করা, বলা, লেখা—ইত্যাদি। এটা ব্যবহার না করলে বাক্য বা কথাই হবে না। বাক্যের অর্থ খুঁজতে গেলে ভার্ব-কে খুঁজে বের করতেই হবে। তা না হয় হলো, এখন ক্রিয়াটা বা কাজটা হচ্ছে কখন? এখন 'হচ্ছে', না 'হয়েছিল', কিংবা 'পরে হবে'? এটা ঠিক করা দরকার প্রথমে। ক্রিয়ার কালটা বা সময়টা কখন। এই 'কাল' যেন আমার পক্ষে মহাকাল হয়ে উঠল। ইংরেজিতে এর নাম টেনস। ভার্বের টেনস ঠিক করতেই টেনস-কে প্রথমে তিন ভাগ করতে হবে—প্রেজেন্ট টেনস'-বর্তমান কাল, 'পাস্ট টেনস'-অতীত কাল, আর 'ফিউচার টেনস'-ভবিষ্যৎ কাল। ভার্ব হলেই তাকে এই তিন ভাগের একভাগে ফেলতেই হবে। কাজটা হচ্ছে, হয়েছিল, হবে— পষ্ট তিনটে আলাদা সময় বা কাল বোঝাচ্ছে। এর পরও কথা আছে, জটিল কথা, ভালো করে বোঝো, না বুঝলে ইংরেজি শেখা অসম্ভব। এই তিন ভাগের প্রত্যেকটিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বর্তমান কালের চার ভাগ, অতীতকালের চার ভাগ আর ভবিষ্যৎ কালের চার ভাগ। যেমন বর্তমান কালের চার রকম : হয়, হয়ে থাকে, চিরকালই হয়, ওঠে, নামে, খায়, যায় এসব কাজ খাঁটি বর্তমান কাল—তবে একটু ভেবেচিন্তে বার করতে হবে, সামান্য অনিশ্চিত। এর নাম প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। এরপর, ক্রিয়াটা শুরু হয়েছে এবং এখনো চলছে, যেমন হচ্ছে, উঠছে, নামছে, বলছে—এই রকম একটা ক্রিয়া—একে বলে 'প্রেজেন্ট কনটিনিউয়াস টেনস'। তারপর হচ্ছে, হচ্ছিল, এখন হওয়া শেষ—হয়েছে, করেছে, খেয়েছে, বলেছি—এর নাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনস। সব শেষের ভাগ হচ্ছে—অনেক আগে শুরু হয়েছে, এখনো চলছে, হয়তো ভবিষ্যতেও চলবে, যেমন গত চার দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে—এখনো হচ্ছে, আরো কিছুদিন চলতেও পারে—এর নাম হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কনটিনিউয়াস টেনস। বাংলা ব্যাকরণেও এসব আছে বেশি বা কম, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই।

আমি এভাবে সব কথা লিখতে গেলে যাঁরা পড়ছেন তাঁরা বিরক্ত হবেন। আমি তো আর ফোর-ফাইভের ছেলেমেয়েদের জন্যে বই লিখতে বসিনি। আর দু-চারটি কথা বলেই এ কথা শেষ করব। দুলাভাই মোট তিন-চার দিন সময় নিয়েছিলেন এই বিষয়টা আমার মাথায় ঢোকানোর জন্যে। বাকি দুটি টেনস—মানে অতীতকাল আর ভবিষ্যৎ কালেরও চারটে করে ভাগ আছে। পাস্ট ইনডেফিনিট আর পাস্ট কনটিনিউয়াস সহজেই বুঝে ফেলেছি। গ্রামার বইতে দেখেছি গাদা গাদা ক্রিয়াপদের প্রেজেন্ট, পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপলের লম্বা তালিকা দেওয়া আছে। কোনোদিন চেয়েও দেখিনি। সে যে এত জরুরি তা আমার জানা ছিল না। ক্রিয়ার এ তিনটে রূপ জানা ছাড়া তো ইংরেজি ভাষায় ঢুকতেই পারা যাবে না। প্রেজেন্ট টেনসের বেলায় তার চার রূপ সহজেই বুঝে ফেলেছি। পাস্ট আর ফিউচার টেনসের পাস্ট ইনডেফিনিট আর পাস্ট কনটিনিউয়াসও সহজেই বুঝে গেলাম। ফিউচার টেনসেরও ফিউচার ইনডেফিনিট আর ফিউচার কনটিনিউয়াস-ও বোঝা গেল। গোলমালে পড়লাম পাস্ট পারফেক্ট, পারফেক্ট কনটিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট আর ফিউচার পারফেক্ট কনটিনিউয়াস নিয়ে—ঐ দু জায়গাতেই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট প্রেজেন্ট কনটিনিউয়াস আর পাস্ট পার্টিসিপলের ব্যবহার আছে। সেটা একটু খটোমটো। যাই হোক, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম।

সোনার চাবি পেয়ে গিয়েছি—দারুণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পেট পুরে খেতে পেয়েছি। কী ঘটে গেল আমার মধ্যে, আমার ভিতরের সব কলকব্জা একসাথে কাজ শুরু করল। মনের মধ্যে থেকে একটা কথাই বলাবলি শুরু হলো। এইবার আমি পারব। আর দু-চারটে জিনিশ আছে, আর্টিকেলের ব্যবহার—এক কথার সঙ্গে আর এক কথার যোগ বা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্যের দুই আলাদা অংশের যোগাযোগ বা কনজাংশন, অ্যাকটিভ প্যাসিভ, ফ্রেজ ক্লজ পড়তে পড়তেই শিখে নেব—বই থেকে তুলে নেব। অসম্ভব মনে হল দিনরাত্রি, মাঠঘাট, ফসলের মাঠ, ফসল উঠে যাওয়া মাঠ আর কতদূর কতদূর, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী, অজানা, অচেনা এই পৃথিবী। এই হলো মুক্তির স্বাদ, গন্ধ—কোথাও কোনো ওজন নেই, ভার নেই। দুলাভাই জানেনও না মাত্র সাত দিনে তিনি কী দিয়েছেন। এখন পার্সিং-টার্সিং তুচ্ছ। নিজের ইংরেজি নিজেই লিখব।

আজকাল ইংরেজি আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। ইংরেজিতে লেখা কিছু পেলেই পড়ি, বোঝবার চেষ্টা করি। বুঝতে যে পারি তা নয়। লম্বা লম্বা বাক্যের ভিতরের যোগাযোগগুলি খুঁজে বের করতে গিয়ে ঘাম ছুটে যায়। ফাইনাইট ভার্ব, তার টেনস আর টেনসের বারো রকমের কোনটা ব্যবহার হয়েছে, সেটা না পেলে বাক্যটা বোঝাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক শব্দের মানে জানি না, কত আর ডিকশনারি দেখব? অ্যাকটিভ প্যাসিভ ভয়েস ভালো করে আয়ত্ত হয়নি, বড়ো বড়ো ক্লজগুলিকেও তাদের নামসহ ধরতে পারি না। সবটা আবছা আধাখ্যাঁচরা হয়ে যায়। অনেকগুলি শব্দ দিয়ে একটা সাবজেক্ট কিংবা লম্বা প্রেডিকেট আর ফাইনাইট ক্রিয়াটা অন্যান্য ক্রিয়াগুলির সঙ্গে গুলিয়ে যায়। এত প্রিপজিশন মুখস্থ করেও সব সময় ঠিকমতো ধরতে পারি না। তবে ছোট ছোট লক্ষ্মীসোনা বাক্যগুলিকে বেশ বুঝতে পারি, তেমন নিজে নিজে শিখতেও পারি। সব মিলিয়ে আজকাল বাতাসটা অনেক খোলা আর হালকা মনে হয়। মণীন্দ্রবাবুর আর কোনো অত্যাচার নেই। বেতন দিতে হয় না। এখন প্রায় প্রত্যেক দিন স্কুলের লাইব্রেরিতে যাই টিফিন পিরিয়ডে। বারণ করার কেউ নেই।

এদিকে এক নতুন কথা চাউর হয়ে গেল। স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হবে। সেটা আবার কী? কোনোদিন নামই শুনিনি। আশেপাশের কোনো স্কুলে হয় কিনা জানি না। আমরা তো প্রত্যেক বিকেলে স্কুলের মাঠে, বিশেষ করে ষাটতলার বিরাট মাঠে ফুটবল খেলতে যাই। একদিন বাদ পড়লে মাথায় আমার বাজ। বাবাকে সন্ধের ট্রেনে স্টেশন থেকে আনতে হলে হারিকেন আর লাঠি খেলার মাঠেই নিয়ে যাই। সাঁওতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল্ট স্টেশনে ট্রেনের ধোঁয়া দেখলেই ছুট—পনেরো মিনিটে পৌঁছুতেই হবে। হন হন হেঁটে গেলে আধঘণ্টা লাগে। আমি মাঠে বল নিয়ে যেভাবে ছুটি, ঠিক সেই ছোটাটাই নিগণ স্টেশন পর্যন্ত একটানা চালিয়ে যাই। আমার আগে কোনোদিন ট্রেন নিগণে পৌঁছুতে পারে না।

খেলাধুলো তো আমাদের কোনোদিনই বাদ যায় না, তাহলে আবার 'অ্যানুয়াল স্পোর্টস' বলে আলাদা অনুষ্ঠান কেন? তখন শুনতে পাই শহরের বড়ো বড়ো বনেদি স্কুলে অনেকরকম উৎসবই হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে অ্যানুয়াল স্পোর্টস। তাতে শহরের গণ্যমান্য মানুষেরা আসেন, ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা আসেন, ব্যান্ডপার্টি আসে। সে খুব জাঁকজমক করে হয়। শুনে আমার হাত-পা উত্তেজনায় ঘামতে থাকে। একদিনের স্পোর্টস, তিন দিন প্রস্তুতি মানে হিট আর স্পোর্টস-এর পরের দিন স্কুলের ছুটি। হ্যাঁ, বনমালীবাবু একজন হেডমাস্টার বটে! খাঁটি শহুরে মানুষ—মন-মেজাজও সেইরকম। গোটা স্কুলটাকে বাগে এনেছেন—গাঁয়ের চুনোপুঁটি মাতব্বররা এখন আর স্কুলেই ঢুকতে পারে না। কী কাজ আছে বলুন তারপর আমি বিবেচনা করে দেখব এলে কখন আসবেন—সরাসরি হেডমাস্টারের জবাব। আমাদের কাছেও তিনি সাক্ষাৎ যমদূত।

AMARBOI.COM

অ্যানুয়াল স্পোর্টসের প্রস্তুতি শুরু হলো। প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হলো কী কী খেলা হবে। নাম দেওয়া যাবে প্রত্যেকটিতেই কিন্তু পুরস্কার মিলবে সবসুদ্ধু তিনটে। তিনের বেশি খেলায় ফার্স্ট হলেও—দ্বিতীয়কেই ফার্স্ট ধরা হবে প্রথমজন কোন পুরস্কারটা রাখবে জেনে নিয়ে। লিস্টে নাম দেখছি ১০০ গজ, ২০০ গজের দুটো দৌড়, একটা হার্ডল রেস, লং জাম্প, হাই জাম্প, অভিভাবক শিক্ষক আর ছাত্রদের দড়ি টানাটানি, সাইকেল রেস, স্লো সাইকেল রেস ইত্যাদি। বিকেলবেলা অভিভাবক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হবে। তখন ইংরেজি, বাংলা আবৃত্তি, পুরস্কার বিতরণ, গণ্যমান্য মানুষদের ভাষণ, স্কুলের সেক্রেটারির ভাষণ, হেডমাস্টারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তেজনায় উৎসাহে আমি টগবগ করতে থাকি। ইচ্ছে হচ্ছে সব ক-টা খেলাতেই আমি নাম দিই। শেষ পর্যন্ত দু-একটা বাদ দিয়ে নাম দিলাম লংজাম্প, হাইজাম্প, ১০০ গজ দৌড়, ২০০ গজ দৌড়, হার্ডল রেস আর রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার আবৃত্তিতে। দুদিন ধরে হিট হলো ষাটতলার মাঠে। এসব চালাচ্ছেন মণীন্দ্রবাবু। গলায় একটা হুইসেল ঝুলিয়ে আমাদের নিয়ে তিনি মাঠে গেলেন। প্রথমেই লংজাম্প। শেষ পর্যন্ত ক-জন করে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে প্রত্যেকটা খেলায় তাদের বাছাই করতে হবে তো। ক্লাস এইটের কাঁটারি গাঁয়ের কোটালদের ছেলে গোপাল খুব ভালো লংজাম্প দিত। স্কুলের উত্তর পাশের এক চিলতে মাঠেই টিফিনের সময় আমরা নিজেরাই লাফালাফি, দৌড়ঝাঁপ করতাম। লং-জাম্পে ফার্স্ট হতো হয় গোপাল না হয় আমি। স্কুলের কোনো ক্লাসেরই আর কোনো ছেলে আমাদের দুজনকে হারাতে পারত না। কিন্তু এটায় বোধহয় আমার কপালে ফার্স্ট প্রাইজ নেই— কোটালদের গোপালই ফার্স্ট হবে। কুচকুচে কালো লম্বাটে সুন্দর গড়নের গোপাল ভারি ভালোমানুষ। ভালো ছাত্র ও ছিল না—বেশি কথাও বলত না। তবে শক্তি ছিল বটে তার গায়ে। বড়ো মাঠের হিটে সেই-ই ফার্স্ট হলো, আমি সেকেন্ড। হাইজাম্পের হিটে একেবারে ধেড়িয়ে দিলাম। হাই-জাম্পটা দিতেই শিখিনি। দুই-পা একসঙ্গে নিয়ে সরাসরি লাফ দিই। হাইজাম্প দিতে হয় আড়ে আড়ে—প্রথমে এক পায়ে দড়ি পেরিয়ে, পরে দ্বিতীয় পা-টা আরো একটু উঁচু করে দড়ি ডিঙোতে হয়। আমি কোয়ালিফাইই করতে পারলাম না। পরের তিনটে রেসে ১০০ গজ, ২০০ গজ, হার্ডল রেসে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়ে কোয়ালিফাই করতে পারলাম। আবৃত্তিটা সরাসরি করতে হবে। হিট টিট নেই। নাম দিয়েছে মাত্র চার-পাঁচজন।

এবার হেডমাস্টার বি. ব্যানার্জি দেখলাম অন্য মানুষ। মনে হচ্ছে বালক হয়ে গিয়েছেন তিনি। উৎসাহে আবেগে তাঁর ধবধবে ফর্সা রঙ লাল হয়ে এসেছে। মুখভরা হাসি। মণীন্দ্রবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তদারক করে বেড়াচ্ছেন। খুঁটিনাটি সব কাজ মণীন্দ্রবাবুকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মণীন্দ্রবাবুর জীবনেও তো এই প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পোর্টসের দিন সকাল ন-টার আগেই আমরা মাঠে হাজির। সারা গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়েছে। তারাও তো জীবনে এরকম কিছু দেখেনি। ষাটতলার মাঠ মোটামুটি সাজানো হয়েছে—অন্তত স্পোর্টসের জন্যে যা লাগে তার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। মণীন্দ্রবাবু অনেক আগেই এসেছেন, আজ তাঁর রকম-সকমই আলাদা। সাবানে কাচা ধুতি ফুলশার্ট পরনে, জুতোজোড়া নতুন সোল লাগানো আর কালি করা, গলায় রঙিন ফিতে দিয়ে ঝোলানো দামি একটা হুইসেল। বি. ব্যানার্জি এখনো আসেননি—গাঁয়ের লোকজনের বসার দাঁড়ানোর ব্যবস্থা হলো। গোলপোস্টের পাশে উত্তর দিকে খানিকটা সমান ঘেসো জায়গাটার একদিকের মাটি বেশ ভালো করে কোপানো—সেখানে লং-জাম্প, হাই-জাম্পের বন্দোবস্ত।

রোদ মিষ্টি, হাওয়া মিষ্টি; ফাঁকা মাঠ তো, হাওয়া একটু বেশি। জমিগুলোর ধান ফুলিয়ে গিয়েছে, অত সবুজ আর লাগছে না। একটু হলদেটে, বেশ দূরের মাঠও আজ কাছে মনে হচ্ছে। এত মানুষ একসঙ্গে হয়েছে, দূরের মাঠঘাট কাছে চলে এসেছে। এমন হয়। তিন চারটে বড়ো অশথ গাছের সমস্ত পাতা ঝিরঝির করে কাঁপছে। আমরা খেলোয়াড়রা সব তৈরি। বনমালীবাবুকে এবার দেখা গেল, তামিলপুকুরের পাশে নিগণের সড়কের ভাঙাটা পেরিয়ে আসছেন, সঙ্গে একটি দল। এঁদের মধ্যে স্কুলের মাস্টারমশাইরা আছেন, গাঁয়ের গণ্যমান্যরা আছেন, ভিনগাঁয়ের নিমন্ত্রিত অতিথিরাও আছেন। কিছু চেয়ার বেঞ্চি আনা হয়েছে। তাঁরা সবাই ঠিকঠাক বসলে মণীন্দ্রবাবু হুইসেল বাজালেন জোরে। স্পোর্টস শুরু হয়ে গেল। হেডমাস্টার বনমালী ব্যানার্জি বসেছেন সবার সামনে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে। তাঁর অফিসের চেয়ারটাই এখানে আনা হয়েছে। চেয়ার আলো করে আছেন বনমালীবাবু। অত সুন্দর মানুষ আর হয় না। একটু বড়োসড়ো আর একটু মোটা—চেয়ারটা ভরে আছে।

প্রথমেই লং-জাম্প। আমরা মোট পাঁচজন সুযোগ পেয়েছি। হুইসেল পড়ল। চুনের দাগ-দেওয়া লাইনের পেছনে আমরা দাঁড়ালাম। আবার ফুড়ুৎ করে হুইসেল বাজালে প্রথমেই গোপাল খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৌড়ে এসে লাফালো। কোপানো নরম জায়গাটার যেখানে তার দুই গোড়ালির দাগ পড়ল—ফিতে দিয়ে লাফানোর জায়গা থেকে তার দূরত্বটা মাপা হলো এবং লেখা হলো। লাফ দেখেই বনমালীবাবু উত্তেজনায় চেয়ার থেকে উঠে আমাদের জায়গায় চলে এলেন। বড় বড় চোখ আরো বড়ো করে চেয়ে আছেন। তারপর আরো তিনজন লাফালো—গোপালের চেয়ে অনেক কম। সবশেষ আমি। ফিতে দিয়ে দূরত্বটা মেপে বোঝা গেল না কে বেশি দূর লাফিয়েছে। গোড়ালির দাগ প্রায় একই জায়গায়। তা দুজন তো ফার্স্ট হতে পারে না। শেষবার দেখা হবে আমাদের দুজনের মধ্যে কে ফার্স্ট হয়। গোপাল এবার যে লাফটা দিল, সেটা আগেরটার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশি। ইস, তাহলে গোপালই ফার্স্ট হবে। বনমালীবাবুর মুখে গালভরা হাসি। এইবার আমার পালা। চোখ বন্ধ করে একবার দাঁড়িয়ে মনটাকে ঠিক করে নিই, তারপর দৌড়ে এসে লাফটা দিই। কতটা লাফিয়েছি জানি না। ফিতে দিয়ে মাপার পরেই হাততালি আর রই রই চিৎকার। আমি গোপালের চেয়ে দু-ইঞ্চি বেশি লাফিয়েছি। বনমালীবাবু গালভরা হাসিটাকে আরো একটু বাড়িয়ে আমার কাছে এসে কাঁধে দু-তিনবার চাপড় দিয়ে বললেন, এ কি রে, হনুমান নাকি? সাবাশ!

AMARBOI.COM

এরপর একশ গজ দৌড়ে আমরা একদঙ্গল গিয়ে দাঁড়ালাম। কোনো কথা নেই, আমিই ফার্স্ট। নরা দ্বিতীয় আর মনু তৃতীয়। তারপরেই হলো দু-শ গজ দৌড়। আমি সুবিধে করতে পারলাম না— তৃতীয় না চতুর্থ কী যেন ছিলাম। যাই হোক, দুটোতে ফার্স্ট তো হয়েছি!

হার্ডল রেসে মনে হলো গোটা স্কুলের ছেলেরা দৌড়ুবে। দশ, পনেরো জন দাঁড়িয়ে গেলাম। এবার খুব মজা। হার্ডল মানে তো বাধা। দেখা যাক কী কী বাধা সামনে পড়ে। মণীন্দ্রবাবু বাঁশি দিলে রেস শুরু হলো। লাইন থেকে সব একসঙ্গেই বেরুলাম, কিন্তু একটু পরেই সামনে পিছনে হয়ে সব কেমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আগে পিছে সব ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক কে কে আমার সামনে পড়েছে, দেখতে পেলাম না বটে, তবে মনে হচ্ছে আমিই সবার সামনে আছি। এর পরেই একটা হার্ডল এল, পাঁচ-সাতটা চেয়ার উল্টে রাখা আছে, লাফিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা পার হয়ে একবার পিছনে চেয়ে দেখি আমিই সবার সামনে আছি। চারদিকের দর্শক দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। জোরে জোরে। দু-তিনটি নাম শুনতে পাচ্ছি। মনে হলো আমার নামটাই বেশি বলছে গাঁয়ের হিন্দু-মোসলমান সবাই। সামনে আবার একটা বাধা— উঁচু করে একটা মোটা রশি টানা আছে—লাফিয়ে সেটা পেরিয়ে পিছনে চেয়ে দেখি সব শুনসান—আমিই সবার আগে, তারপর যেন আর কেউ নেই। দেখতে পেলাম কেউ কেউ দৌড়ুচ্ছে, কেউ খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সামনে আর একটিমাত্র বাধা। আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না, ফার্স্ট আমি হবোই। দেখছি একটা তেরপল পাতা আছে। ভারি আর মোটা একটা তেরপল। তার নিচে দিয়ে ঢুকে অন্যদিকে বেরিয়ে খানিকটা সামনে গেলেই দৌড় শেষ। খুব খুশি মনে আমি তেরপলটা তুললাম—বেশ ভারি চামড়ার মতো। সময় লাগল বৈকি একটু! আঁকুপাঁকু করে একটু তুলেই আমি মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছি, মাঝামাঝি আসতেই দেখছি তেরপলের একটা দিক হাট হয়ে খুলে গেছে, খানিকটা বাতাসও ঢুকল হুশ করে। আমি আর একটু এগিয়েছি—পেছনের দিকটা অনেকটাই উঁচু, সবাই বেশ আরামেই ঢুকছে। আর বেশি বাকি নেই তবে ছেলেরা সব আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কী করে? তারপরেই তেরপলটা দেখলাম আমাকে চেপে ধরেছে। একটুও এগোতে পারছি না যে! দু-পাশ থেকে কারা তেরপলটা এমন চেপে ধরেছে যে, আমি যেন বেরুতেই পারব না। দমবন্ধ হয়ে আসছে, হাঁসফাঁস করছি। আমার আবার চেপে-ধরা কোনো জায়গায় আটকা পড়লে ভীষণ ভয় লাগে। মনে হয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাব। প্রাণপণে হাঁজোর-পাঁজোড় করে বেরিয়ে যখন এলাম তখন সব শেষ। দেখছি, পিছনে কেউ নেই, সবচেয়ে শেষে যে দৌড়ুচ্ছিল সে-ও চুন দিয়ে টানা শেষ লাইনে পৌঁছে গিয়েছে। নরা ফার্স্ট, মনু সেকেন্ড, হেলা থার্ড—আর কে কী হয়েছে জেনে কী করব? মাথা নামিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আমি মাঠের বাইরে গিয়ে এক কোণে বসে থাকলাম। আমার খোঁজ পড়ল না, আরো ঘণ্টা-দেড়েক নানারকম প্রতিযোগিতা হয়ে স্পোর্টস শেষ হলো। সূর্য মাথার উপর উঠেছে, গনগন করে জ্বলছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকেরা গাঁয়ের পথ ধরে বাড়িতে ফিরছে। আমার খোঁজও কেউ নিল না, হেটমুণ্ড হয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

বিকেলে আবার অনুষ্ঠান। আমার মন খারাপটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেল। দুটোতে হারার কষ্ট আর নেই। হেরেছি বটে, তেমনি দুটোতে ফার্স্ট হয়েছি। আর একটাতে হলে তিনটে হতো, হয়তো চ্যাম্পিয়ান হতাম। তা এখনো সুযোগ তো একটা আছে বিকেলে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা বাকি আছে। আমি বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা আবৃত্তির জন্য নাম তো দিয়েছি। একটা কিছু তো হবে। তাছাড়া বড়ো কথা, আজ বিকেলে চারপাশের গ্রাম থেকে বিদ্বান, গণ্যমান্য মানুষরা আসবে, গাঁয়ের মানুষরা আসবে, সভা একেবারে গম গম করবে। উত্তেজনায় দুই হাত আমার ঘামে ভিজে যায়। সবশেষে ভাষণ হবে, গান হবে। আমাদের স্কুলে এরকম দিন আর কখনো আসেনি, আর কোনোদিন আসবে কিনা জানি না। স্কুলে মজা বলতে তো হয়, একজন হরবোলা এলো কিংবা কেউ জাদু দেখাতে এলো—বছরে একবার সরস্বতী পুজো। স্বাধীনতা দিবসেও তেমন কোনো অনুষ্ঠান নেই, কারো জন্মদিন পালন নেই। গাঁয়ে পাখমারা দল, বায়োস্কোপওলারা, সাপুড়েরা, বাঁদর বা ভালুক খেলানোর জন্যে কেউ কেউ এল তো কিছু দেখা হলো বা স্কুল থেকে ডেকে এনে ছাত্রদের দেখানো হলো। আনন্দ-ফুর্তি বলতে তো এই!

বিকেল একটু গড়িয়ে এলে ফিটফাট হয়ে স্কুলে গেলাম। ক্ষারে কাচা হাফপ্যান্ট আর হাফশার্ট পরনে। চবচবে করে মাথায় শর্ষের তেল মেখে চান করে লম্বা একটা সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ে স্কুলে গেলাম। স্কুলটা আজ একটু সাজানো হয়েছে, তাতে নানা রঙের কাগজ আর অশথ পাতা, দেবদারু পাতা, কিছু পদ্ম আর শাপলা। জল জল ভেজা গন্ধ আসছে। অতিথিরা অনেকেই এসে গেছেন, এখনো আসছেন। নানা গাঁয়ের বিশিষ্ট সব মানুষ, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, স্কুলের সেক্রেটারি, ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট আমার বাবা, বোর্ডের কেরানিরা, কলকাতায় চাকরি-করা মানুষ সব এসেছেন বা আসছেন। স্কুলের ছোট মাঠটা আস্তে আস্তে ভরে এল। এই মাঠটা শুধুই কাঁকর আর ইটের টুকরো দিয়ে ভর্তি। মাটি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজন্যে ঘাসও নেই। বিকেল গড়িয়ে এসেছে, রোদে তাপ নেই—একটু একটু বাতাস বইছে। সকলের পরনেই ক্ষারে কাচা জামাকাপড়—যে যেমন পেরেছে। চেয়ারেই বেশির ভাগ মানুষ বসেছে। গাঁয়ের সাধারণ মানুষরা বেঞ্চিতে বসে আছে—তাদের প্রায় সবাই মোটা ধুতি আর গেঞ্জি পরে আছে। কারো কারো খালি গা—তবে তার ধুতিটাও কাচা। হেডমাস্টার মশাইয়ের পাশের চেয়ারেই স্কুলের সেক্রেটারি চাটুজ্জেমশাই বসে রয়েছেন। তাঁরা পাশের গ্রাম গোবর্ধনপুরের পুরনো জমিদার বংশ।

বনমালীবাবু ইশারা করতেই মণীন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে (তখন গ্রাম-গঞ্জেও বিশেষ জমায়েতে মাইকের চলন হয়েছে) বললেন, সকলকে নমস্কার, আপনারা সবাই এই স্কুলে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। এজন্য আমরা ধন্য। এই স্কুল আপনাদেরই—আপনারা অভিভাবকদের আর ছেলেদের। এই স্কুলে এতদিন সামান্য এক কেরানি ও মাস্টারির চাকরি করছি— আজকের মতো এরকম কখনো কিছু দেখিনি। শিক্ষকরাও দেখেননি, আপনারাও দেখেননি। এই অনুষ্ঠানের ধারণা আর সব আয়োজনের কৃতিত্ব একান্তই আমাদের মহামান্য জ্ঞানী ও বিদ্বান নতুন হেডমাস্টারমশাই শ্রীবনমালী ব্যানার্জি মহাশয়ের প্রাপ্য। আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী। বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব এই স্কুলে এই প্রথম হচ্ছে। আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ঘোষণা করছি—এইটুকু বলে তিনি একবার বনমালীবাবুর দিকে তাকালেন। মনে হলো তিনি আবার ঘাড় নাড়ালেন। মণীন্দ্রবাবু শুরু করলেন, আজ সকালে স্পোর্টস হয়ে গিয়েছে, আপনারা দেখেছেন। দু-একটি প্রতিযোগিতা বাকি ছিল। এখন প্রথমেই সেই প্রতিযোগিতাগুলি হয়ে যাবে আপনাদের সামনেই। ইংরেজি আর বাংলা কবিতা আবৃত্তি এখন শুরু হবে। বিচারক থাকবেন স্কুলের সেক্রেটারি মহামান্য চাটুজ্জেমশাই—তাঁর সঙ্গে থাকবেন আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, গাঁয়ের তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তি—মোট পাঁচজন। এখন আমি একে একে ইংরেজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করব। তারা হেডমাস্টারমশাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের দিকে মুখ করে আবৃত্তি করবে। প্রথম শ্রীনরোত্তম দাঁ আবৃত্তি শুরু করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততক্ষণে আমি উত্তেজনার চোটে ঘেমে ভিজে গিয়েছি। গড় গড় করে ঘাম ঝরছে দু-হাতের তালু বেয়ে। পা-দুটো ঘামে জবজবে। কীরকম যে লাগছে বলতে পারব না—ভয় নয়, একটুও ভয় নয়, যদিও পা কাঁপছে। এ একরকম উৎসাহ উত্তেজনা উৎকণ্ঠা মিলিয়ে এক্ষুনি কাজটা করার জন্যে আগ্রহে হাত নিশপিশ করছে। আর যেন অপেক্ষা করতে পারছি না। ঘোড়া যেমন দৌড়ুবার জন্যে লাগাম পরে, জিন পরে, বুকে বেল্ট লাগিয়ে ঘাড়টা একটু এগিয়ে দিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার ক্ষমতাটা জমায়, তেমনি আমি এখন তৈরি আর শেকলে বাঁধা আগুনের মতো টগবগে। 'ভারততীর্থ' কবিতাটা একবারে মুখস্থ, ঝরঝর করে বলে যেতে তো পারবই। তবে আবৃত্তি কাকে বলে, কেমন করে করতে হয় কিছু জানি না। কদিন আগে হাত-টাত কচলে বাবাকে বলতে তিনি বললেন, ওসব আমার দ্বারা হবে না। তুই বরং একবার ননুর কাছে যা। আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম সারা গাঁয়ে ঐ একজন মানুষই আছেন যিনি এসব নিয়ে বেশ আগ্রহী, আর কেউ নেই। এঁদের কুটুম হেরম্ববাবু আছেন বটে, তিনি শিক্ষিত লোক, কিন্তু কবিতা সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে একটুও মাথা ঘামান না। তখন সকাল ন-টা সাড়ে ন-টা বাজে—এখুনি বরং যাই। প্রথমে একটা দিঘি, তার একদিকে একটা গুলঞ্চ গাছ, ভারি মিষ্টি তার ফুলের গন্ধটা, তারপর ঘাটের দু-পাশে দুটো বিরাট অশথ গাছ। অজগর সাপের মতো মোটা বড়ো শিকড়গুলো দিঘির পাড়ে এখানটায় সাজানো—ঠিক বাঁদিকে একটা অচেনা গাছ—কেউ তার নাম বলতে পারে না—কীরকম একটা বেগুনি ভীষণ মনটানা রঙ। সারা গাঁয়ে ঐ একটিই গাছ, বলতে কী আজও কোথাও আমি এই বুনো ফুলগাছটি দেখিনি। অথচ সেই ফুলটাকে ভুলতে পারিনি। সিঁড়ির ধাপের মতো শিকড়গুলি পেরিয়ে দিঘির পাড়— কদ্‌বেল গাছ, তেঁতুল গাছ দু-একটা আছে—এই একই পাড়ের পাশে আর একটা দিঘি, পাশাপাশি দুই বোনের মতো। বাঁদিকে ননু-কাকাদের বিরাট বাঁশঝাড়, তার পরেই ননু কাকাদের বাড়ি। গেলেই দিদিমা আলতো করে দুটি নারকোলের নাড়ু আমার বাড়ানো হাতে ফেলে দেবেন। এ হবেই। বাড়ির একমাত্র ছেলে আমার বয়সী মনু। যতই হোক ননু কাকারা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয় তো। বনেদি বাড়ি। ননুকাকার আপন ভাগ্নে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন।

আমি এখুনি এক দৌড়ে ননুকাকাদের বাড়ি যাব বলে মুখ ফিরিয়েছি, দেখি উঁচু গলায় 'বন্‌দা' (বন্ধুদাদা) হাঁক দিয়ে আমাদের খামারবাড়ির মাঠে ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, এসো ননু, ছেলেটা এখুনি যাচ্ছিল তোমার কাছে—কী যেন কবিতা মুখস্থ বলবে স্কুলে আজ বিকেলে, একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দাও দিকি।

ব্যস শুরু হয়ে গেল ননু কাকার আবৃত্তি শেখানো। সে তো আবৃত্তি শেখা নয়, যেন আমাকে দিয়ে ড্রিল করাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' যে ভঙ্গিতে পড়তে শুরু করলেন, হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে—না, কবিতা আবৃত্তি আমার দ্বারা হবে না। এইরকম হাত-নাড়ানো, বুক ফুলিয়ে চিত হয়ে দাঁড়িয়ে, এদিকে ঘুরে, ওদিকে ঘুরে, ঘাড় বেঁকিয়ে, ঘাড় খাড়া রেখে কবিতা আবৃত্তি আমি কিছুতেই করতে পারব না।

এখন মণীন্দ্রবাবুর ডাকে কাঁপা কাঁপা পায়ে, দু হাতের তালু থেকে ঘাম ঝরাতে ঝরাতে হেডমাস্টার আর সেক্রেটারিবাবুর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম ননু কাকা যা শিখিয়েছিলেন তার সবটা ভুলে যেতে। আমার দ্বারা ওরকম হাত নাড়ানো, বুক ফোলানো, ঘাড় বাঁকানো সম্ভব হবে না। তাহলে সব গুবলেট পাকিয়ে ফেলব—সর্বনাশ হয়ে যাবে। তার চেয়ে কোনোরকমে একটু মন ঠিক করে নিয়ে আমার দুর্বল সরু গলায় মুখস্থ বলতে লাগলাম, ভারততীর্থ, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। সবাই শুনছিল, কোথাও গোলমাল হলো না—অ্যাঁ অ্যাঁ করিনি, ভুলভালও কিছু হয়নি। পড়া হয়ে গেলে কাঁপা কাঁপা পায়ে আবার ফিরে এলাম। আমার পরে হেডমাস্টারের ভাইপো ক্লাস টেনের ছাত্র আনন্দদা, আনন্দমোহন ব্যানার্জি আবৃত্তি করলেন। সুন্দর চেহারা, লম্বা ছিপছিপে, গায়ের রঙ ফর্সা টকটকে। তার পড়ার ভঙ্গিই অন্যরকম। এক লাইন পড়া হতেই আমি বুঝলাম, আমি কোথায় আর তিনি কোথায়। নির্ঘাৎ ফার্স্ট হবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আনন্দদার পরে আরো তিন-চারজন, মনু, বিশে আর মানিক। এর পরেই ইংরেজি কবিতা। তাতে বেশি ছেলে নাম দিতে সাহস করেনি। মাত্র তিনজন—মন্টুদা, ধমাদা আর তারিণী চাটুজ্জে। শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগল না। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা শেষ হবার সাথে সাথে মণীন্দ্রবাবু বললেন, একটু পরেই বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে, তারপর ভাষণ, পুরস্কার প্রদান আর শেষে সামান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।

তারপরই দেখলাম হেডমাস্টার বনমালীবাবু চেয়ার থেকে উঠে আমাদের দিকে আসছেন, তার আগে নিচু গলায় তিন-চারজনের সঙ্গে কিছু বললেন, একটু ভেবে নিলেন। তারপর সোজা আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুখে মিষ্টি একটা হাসি। এমন মেজাজে কখনো তাঁকে দেখিনি। আমার কাছে এসে দাঁড়াতে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আমার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মাথাটা নিচু করে কানে কানে বললেন, এই, তুই আমার সঙ্গে একটু আয় তো। সাথে সাথে আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। একটু আড়ালে আমাকে নিয়ে গিয়ে খুব নরম নিচু গলায় বললেন, দ্যাখ তোর সঙ্গে আর একজন ব্রাকেটে ফার্স্ট হয়েছে। তুই তো তিনটে আইটেমে ফার্স্ট হয়েছিস—তুই-ই চ্যাম্পিয়ন। আজ ব্রাকেটে আর একজন যে ফার্স্ট হয়েছে তাকে আজকের পুরস্কারটা যদি ছেড়ে দিস, তাহলে সে একটা পুরস্কার পায়। সে আর কিছুতে নাম দেয়নি। তুই এটা ছেড়ে দিলেও চ্যাম্পিয়নই হবি, আর কারো স্কোর তোর সমান নেই। আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। এত নরম মনের মানুষ তিনি, এমন মিষ্টি করে কথা বলতে পারেন! আমি সাথে সাথে মাথা হেলিয়ে বললাম, হ্যাঁ, মাস্টারমশাই, আমার কোনো আপত্তি নেই। তেমন হলে আমি খুবই খুশি হব। বনমালীবাবু আস্তে করে আমার কাঁধ চাপড়ে ফিরে গেলেন। মণীন্দ্রবাবুকে কিছু একটা বলতেই তিনি মাইকে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করলেন। প্রথম : আনন্দমোহন ব্যানার্জি, দ্বিতীয় আজিজুল হক, তৃতীয় মনোজ পাল। এরপর ভাষণ, তারপর পুরস্কার বিতরণী আর শেষে ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। শুরু হলো ভাষণপর্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষণ অনেক শুনেছি। মাস্টারমশাইদের লম্বা লম্বা ক্লাসগুলো তো ভাষণই। ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টির অনেক বক্তার ভাষণ শুনেছি। কারো কারো ভাষণ কথার মতো, সে শুনতে ভালোই লাগে। তবে চিৎকার করে সাজানো গোছানো বক্তৃতা শুনতে মোটেই ভালো লাগে না। এখানে সবার ভাষণই ছোট ছোট। ভালোই লাগুক আর মন্দই লাগুক তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে বললেন ননু কাকা। কায়দা করে কথা বলেন, শুনতে ভালোই লাগল। স্কুলে এই প্রথম বার্ষিক স্পোর্টস, এর আগে কোনোদিন হয়নি। এজন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয়ের। তিনি কঠোর হাতে স্কুল চালাচ্ছেন—স্কুলের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ফিরে এসেছে। গ্রামের মানুষের পক্ষ থেকে বলছি, আমরা খুব খুশি। এরপর যা-তা কিছু কথা বললেন শ্রীধর চক্কোত্তি। কিছু জানে না, ফানে না—চিৎকার করে যাত্রাদলের রাজার মতো দু চারটে কথা বলবেই। এই হচ্চে কথা—বলে শেষ করলেন। এরপরেই বললেন নিগণের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার আর একই সঙ্গে নিগণের পোস্টমাস্টার। ইনি আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় বিনয়ের খুব ভক্তির মানুষ। খুব বলবান ব্যক্তি তিনি। একবার একটা মোষের দুটো শিং ধরে তাকে উল্টে ফেলে দিয়েছিলেন। খুব সৎ আর স্পষ্ট কথার মানুষ। তিনি ছাত্রদের শরীরচর্চা আর খেলাধুলোর পরামর্শ দিলেন, বললেন সুস্থ শরীর না থাকলে সুস্থ মনও থাকে না। মনের সুস্থতা যদি কেউ চায়, তাহলে শরীরের সুস্থতা আগে দরকার। এরকম মানুষের জাতি তৈরি করলে দেশের উন্নতি আপনা-আপনি ঘটবেই। তাঁর বলা হয়ে গেলে ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট আমার বাবা নিচু গলায় আস্তে আস্তে কটি কথা বললেন। মৃদু গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি কয়েকটি কথা বলেই থামলেন।

স্কুলের সেক্রেটারি চাটুজ্জে মশাইকে তো অনেক কথা বলতেই হবে। স্কুলের সুবিধে-অসুবিধে, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি নিয়ে নেহাৎ কতকগুলি কেজো কথা।

একটা কথা আগে বলতে ভুলেছি। সেক্রেটারি মশাইয়ের আগে স্কুলের সব থেকে পুরনো শিক্ষক গোপীপদ পাঁজা—একমাত্র বি.এ. পাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহকারী শিক্ষক, যিনি বগলে ইংরেজি স্টেটসম্যান কাগজ নিয়ে আসেন প্রত্যেক দিন, দারুণ ইংরেজি-জানা মানুষ। তিনি কিছু বললেন। তবে কথা তাঁর মুখে জোগায় না। এক-দুই মিনিটেই শেষ হয়ে গেল। তারপর আধঘণ্টা ধরে চলল সেক্রেটারি মশাইয়ের ঘ্যানর ঘ্যানর। সব শেষে এল হেডমাস্টার বি. ব্যানার্জির সভাপতির কথা : ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও ভাষণ পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা।

আবার ঘামতে শুরু করেছি। এবার যে পুরস্কার প্রদান! খুশি আনন্দ আর উত্তেজনা মেশানো গরমে বার বার ঘেমে উঠছি। বনমালীবাবুর কথা শেষ হলে মণীন্দ্রবাবু উঠে এসে বললেন, এবার পুরস্কার প্রদান। আমি এক একটা খেলার নাম বলব তারপর বিজয়ীদের নাম বললে তারা একে একে এসে হেডমাস্টারমশাই বা সেক্রেটারিবাবুর কাছ থেকে প্রাইজ নিয়ে যাবে : লং-জাম্প—প্রথম আজিজুল হক। আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে জীবনের এই প্রথম পুরস্কার নিতে গেলাম। পাতলা লাল বা নীল কিংবা হলুদ কাগজে মোড়া লাল ফিতে-বাঁধা দু-তিনটে বই। সব পুরস্কারই এই রকম বইয়ের পুরস্কার। আমি প্যাকেটটা বনমালীবাবুর হাত থেকে নিলাম, আমার দিকে হাসি মুখে চেয়ে তিনি প্রথম পুরস্কারটা আমার হাতে দিলেন। আমি হেডমাস্টার আর সেক্রেটারিবাবুকে প্রণাম করে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলাম।

আর কিছু বলার দরকার নেই। সব পুরস্কার এইভাবে দেওয়া হয়ে গেলে মণীন্দ্রবাবু আবার উঠে ঘোষণা করলেন : এবার এই স্পোর্টসে যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তার নাম বলছি: আজিজুল হক। তাকে এখানে আসতে ডাকছি। হাততালিতে ফেটে পড়ল সবাই। এবার বই পুরস্কারের সঙ্গে মেডেলও জুটল। পুরস্কার দিলেন হেডমাস্টার মশাই, মেডেলটা গলায় পরিয়ে দিলেন সেক্রেটারিবাবু। আমি আবার দুজনকে প্রণাম করে বুক ফুলিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম। খুব হাততালি আর চিৎকার। একবার বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, শান্ত হয়ে চুপ করে বসে আছেন। মুখের চেহারাটা একটুও অদল-বদল হলো না, এখানে যেন তিনি একাই বসে আছেন, কাছে কেউ নেই। আমি এত বই পেয়েছি যে কোলে ধরে রাখতে পারছি না। তর সইছে না কখন সব খুলব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠান শেষ হতে আর বেশি সময় লাগল না। গান গাইবার মানুষ তেমন ছিল না। গোবর্ধনপুরের চাটুজ্জে মশাইয়ের আত্মীয় সেই ভদ্রলোক, পুইনি বা পলাশির বেণীবাঁধা একটি অল্পবয়েসী মেয়ে আর ক্ষীরগ্রামের একজন। তাঁরা তিনজনে মিলে প্রথমে গাইলেন ধনধান্যে পুষ্পে-ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মধ্যে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। তারপর পুষ্পরানী নামের মেয়েটি গাইল একটা নজরুলের গান, তারপর নজরুলেরই একটা শ্যামাসঙ্গীত, সব শেষে একটা রামপ্রসাদী। এদের গাওয়া শেষ হলে শেষ শিল্পী গোবর্ধনপুরের সেই ফর্শা লম্বামতো মানুষটা এসে টেবিলে রাখা হারমোনিয়ামের রিড টিপে খানিকটা বাজিয়ে ধরলেন একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত—'অন্তর মম বিকশিত করো'। তারপর আর একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত—'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি'—সব শেষে একটি আশ্চর্য গান, কার গান, কার সুর কিছুই বুঝতে পারলাম না। 'মাটির মাঝে বন্দী যে জল লুকিয়ে থাকে, মাটি পায় না তাকে।' খুব ভালো লাগল শুনতে কিন্তু তার মানে কিছু বুঝতে পারা গেল না। অনেক পরে জেনেছি, ঐ গানটিও রবীন্দ্রসঙ্গীত।

কয়েক দিনের মধ্যেই পুরস্কার পাওয়া বইগুলো সমস্ত পড়ে ফেললাম। নানারকম বই—রোমাঞ্চ কাহিনী, গোয়েন্দা গল্প, শিকারকাহিনী, রূপকথা আর একটা জীবনী। 'পৃথিবীর বড়ো মানুষ' নামের এই বইটার লেখক ছিলেন গোপাল ভৌমিক। এই বইটা পড়ে আমার চোখ খুলে গেল, পৃথিবীটা আলোয় ভরে উঠল। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম ইত্যাদি তো ছিলই, সক্রেটিস, হিটলার, নেপোলিয়ন ইত্যাদিও ছিল। সক্রেটিস পড়তে গিয়ে 'দর্শন' আর 'দার্শনিক' শব্দ দুটো একদম নতুন শেখা হলো। এমন গভীরভাবে মনে দাগ কাটল যে তখুনি ঠিক করে নিলাম, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি 'দর্শন' পড়ব। খাঁদা বোঁচা মোটা বেঁটে একটা মানুষকে চিরকালের মতো ভালোবেসে ফেললাম। এবার আর জানুকে আগে কোনো বই-ই পড়তে দিইনি। আমার পরে তার পড়া। সে-ও গোগ্রাসে বইগুলো পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠেছি। ফার্স্ট সেকেন্ড না থার্ড হয়েছিলাম সে এখন মনে নেই। বার্ষিক পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়নি। তবে বলার কথাটা হচ্ছে এই—কাকে বলি কাকে বলি বলে ছটফট করছি। কিন্তু বলব কাকে আর বলেই বা কী হবে? ইংরেজিতে এবারে, এই এতকাল পরে, এই আমি প্রথম মোটামুটি ভালো করলাম। প্রথম দু-তিনজনের মধ্যেই আমার নম্বর। অঙ্কে এতকাল যা হয়ে আসছে, এবারও তাই ঘটল। উনিশ বা একুশ পেয়ে ফেল করলাম। মোট নম্বর আমার সকলের চেয়ে বেশি—সেদিক থেকে আমিই ফার্স্ট। কিন্তু প্রমোশনের তালিকায় আমার নাম থাকল সব শেষে। তার উপর লেখা 'বিশেষ বিবেচনায়'। আমি কিন্তু একটুও মন খারাপ করলাম না। বিনয়, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথম দ্বিতীয়—তারাই ফার্স্ট বেঞ্চিতে প্রথম আর দ্বিতীয় জায়গায় বসল, আমি কিংবা মদন তিন নম্বরে বসেছি। তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি কেউই আমার জায়গায় বসতে সাহস করল না। তারা জানে ফার্স্ট বেঞ্চিতে যারা বসে, তাদেরকেই মাস্টারমশাই সব চেয়ে বেশি প্রশ্ন করেন। কে বাবা আবার মাস্টারের চোখের সামনে বসে নাস্তানাবুদ হবে—সে খুব ঝকমারি, আইজুলই তাড়াতাড়ি জবাব-টবাব দেয়। ঐ-ই বরং ওখানে বসুক।

হেডমাস্টার বি. ব্যানার্জি নাইন আর টেনে ইংরেজি পড়াতেন। আর কোনো ক্লাস নিতেন না। যমের বাবা মানুষটা ঘরে ঢুকলেই আমরা ভয়ে তটস্থ। তবে তাঁর পড়ানোর ধরনটাই আলাদা। রোলকল করতেন না। চেয়ারে বসেই ফার্স্ট বয় বিনয়কে বলতেন, আজকের পড়াটা রিডিং পড়। বিনয় উঠে দাঁড়িয়েই পড়ার জায়গাটা পড়তে শুরু করে। একটা, দুটো, বড়জোর তিনটে বাক্য পড়া হয়ে গেলেই থামিয়ে দিতেন, বোস। পরের জনকে বলতেন তুই দ্বিতীয় প্যারা থেকে পড়। একটা দুটো লাইন পড়ার পরেই পরেই বোস—এইবার পরের জনকে বলতেন, পড়। এরপরে তিনি ক্লাসের সবার দিকে একবার দেখে নিতেন তারপর যাকে-ইচ্ছে-তাকে পড়তে বলতেন। ফার্স্ট বেঞ্চি লাস্ট বেঞ্চির যাকে খুশি বলা হতো—এই তুই পড়। সে শুরু করলেই বুঝে নিতেন—দাঁড়িয়ে থাক। এই রকম চার-পাঁচজনকে ঠিকমতো পড়া পড়ে না আসার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। এর পরে বাংলা মানে আর ইংরেজি উচ্চারণ শুনতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইতেন। শেষ বাক্যের মানে বল—ক্লাসে সেকেন্ড বয়কে, আর একজনকে তৃতীয় বাক্যের মানে বল—এই একই কায়দায় মানে বলা শুনতেন। দাঁড়িয়ে থাকা কেউ মানে বলতে না পারলে, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক। বানান আর শব্দের মানে নিয়েও ঐ একই কথা। শুধু উচ্চারণ ভুল হলে শুধরে দিতেন। আশ্চর্য কথা এই, যারা পারবে তাদের অনেককেই কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। কেমন করে অগামার্কা ছাত্রদের ঠিক চিনে যেতেন কে জানে! যারা পড়তে পারত না, তাদের ব্যবস্থা কান ধরে দাঁড়ানো, যারা পড়তে পারত না মানেও বলতে পারত না তাঁদের কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। আর যারা কোনোটাই পারত না—বানান, শব্দের মানে, উচ্চারণ কিছুই বলতে পারত না, তাদের বলতেন, এদিকে আয়। সে যখন পায়ে পায়ে তাঁর সামনে দাঁড়াত, তিনি চটাৎ করে তার গাল কান জুড়ে এমন জোরে একটা চড় মারতেন, সে ত্রিভুবন দেখতে পেত, শর্ষের ফুল দেখত চোখে, বনবন করে মাথা ঘুরত তার। জ্ঞান না হারালেও ধপ করে মেঝেতে বসে পড়তেও দেখেছি অনেকবার। নরম তুলতুলে হাত তাঁর, ঐ হাতের চড় যে এত জোরালো আর সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে তা ধারণা করা কঠিন। তবে ঐ একটিমাত্র চড়—আর কিছুই না। একটা ক্লাস পুরো নিতেন না তিনি। পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই বা মাঝামাঝি তিনি চলে যেতেন। শুধু বলে যেতেন যারা যারা শাস্তি পেয়েছে, তারা এইভাবেই থাকবে—পরের ক্লাস-টিচার ঢুকলে অন্য সকলের সঙ্গে তারাও বসবে।

এখন আমাকে স্কুলের বেতন দিতে হয় না, মণীন্দ্রবাবুর চোখ রাঙানিও সইতে হয় না। ক্লাস নাইনে উঠে সব নতুন বইপত্র কিনতে খুব বেশি তাগাদা দিতে হয়নি বাবাকে। এবার বুক লিস্টে বেশি বইয়ের নাম নেই। ম্যাট্রিকুলেশন উঠে গিয়ে আমাদের সময় থেকেই 'স্কুল ফাইনাল একজামিনেশন'—আমরা প্রথম ব্যাচ। ম্যাট্রিকুলেশনের বদলে পরীক্ষার নাম হলো 'স্কুল ফাইন্যাল একজামিনেশন'। বুক লিস্টে বইয়ের নাম নেই—শুধু লেখা : ইংলিশ কালেকশন, বাংলা সংকলন, সংস্কৃত আর প্রত্যেকটার পাশে লেখা আছে : অ্যাজ প্রেসক্রাইবড বাই দি বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীজগণিত, জ্যামিতি আগের বইগুলিই প্রায় রয়েছে। এই বইগুলির সবই আলম ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া। একটু অসুবিধে হলো, এই বইগুলি সব চার পাঁচ বছরের পুরনো সংস্করণ। ইতিহাসের বইটা রমেশচন্দ্র মজুমদারের। তার সংস্করণ নেই, শুধু পুনর্মুদ্রণ। কিন্তু ভূগোলের বইটা পাঁচ বছরের পুরনো দেখে একদিন গোপীবাবু বললেন, এই অচল বইটা রেখেছিস! গত পাঁচ বছরে পৃথিবী কি একই রকম আছে? কত কী বদলে গিয়েছে রে, নতুন সংস্করণ না থাকলে পড়বি কি? বই আর বদলাতে পারিনি। টাকা কই বাবার? বলিই নি তাঁকে। অন্যদের নতুন সংস্করণ দেখে বুঝতে পারলাম সত্যিই অনেক রকম পরিবর্তন হয়েছে, ইংল্যান্ডের ইতিহাসের বেলাতেও তাই। একমাত্র রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ তেমন যোগবিয়োগ কোথাও হয়নি।

এবার ভারি আনন্দের কথা, নতুন বই কেনার জন্যে বাবার কাছে বেশি হেঁই হেঁই করতে হয়নি। একদিনই তাঁর কাছে নতুন লিস্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম। বাবা আজকাল অনেক সহজ হয়েছেন। বকাবকি করা, মারধর করা ছেড়ে দিয়েছেন। নরম গলাতেই কথা বলেন। লিস্টটা নিয়ে তিনি কাছে রাখলেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই তো বর্ধমান কাটোয়া যান—আর আমি দিনের সবচেয়ে আনন্দে উত্তেজনায় কাটানোর সময়টায়—তার মানে ফুটবল খেলার চেয়ে আমি অন্য কিছুকেই দামি ভাবি না—কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিন প্রাণপ্রিয় খেলার শেষটুকু বাদ দিয়ে বাবাকে নিগণ থেকে আনতে হাতে হারিকেন লাঠি নিয়ে ষাটতলার মাঠের খেলা ছেড়ে স্টেশন বরাবর মাঠের কোনাকুনি দৌড়াতে থাকি। কৈচর বা সাঁওতায় ট্রেনের ধোঁয়া দেখলেই দৌড়ুতে শুরু করি। একদিনও দেরি হয় না। তখন সন্ধে হয় হয়, শীতকালের দিন হলে সন্ধে পেরিয়ে রাতই হয়ে যায়। আল ধরে দৌড়ুচ্ছি, যেখানে সেখানে ভাঙা জায়গাগুলো লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি—খোলা জমি ধরে কোনাকুনি দৌড়ুচ্ছি, জল কাদা ডিঙিয়ে যাচ্ছি। জায়গায় জায়গায় বনকুল শেয়াকুল বঁইচি এই সবের ঝোপজঙ্গল পার হবার সময় বড়ো চন্দ্রবোড়া কিংবা কেলে গোখরো সাপ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখন কে ওসব খেয়াল করে? একদিন শরৎকালে—তখন ধানের জমিতে পরিষ্কার পানি, দু-এক জায়গায় আল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে কুল কুল শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে—ছোট ছোট পুঁটি, মৌরলা, ছানাপোনা নিয়ে মা শোল এসব দেখতে পাই। সেদিন আলের ছোট্ট একটা ভাঙা লাফিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি, পায়ের তলায় খুট করে কী একটা লাগল। ফিরে হারিকেনটা নিয়ে গিয়ে দেখি বিরাট একটা কাঁকড়াবিছে তার লম্বা লেজের ডগার হুলটা উঁচিয়ে আছে। ওটা একটা ভয়ংকর কাঁকড়া বিছে, আমি দেখতে পেলাম ক্রূর রক্তমাখা বাঁকা চোখ দিয়ে হাতে একটা বলিদানের খাঁড়া নিয়ে একদৃষ্টে আমাকে দেখছে। কাঁকড়াবিছে আমি চিনি, কেউটে গোখরোর কামড় খেয়েও মানুষ বেঁচে যেতে পারে, কাঁকড়া বিছের কামড়ে মানুষ অনেক সময় মারাও যায়, তা না হলে এই জীবনেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আজ ভাগ্যক্রমে এর হুল থেকে বেঁচে গিয়েছি, তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে বলছে, যা, খুব বাঁচা বেঁচে গেলি। আজ অন্ধকারে একা পথ হাতড়ে হাতড়ে বাবা হয়তো এখানে এসে দেখতে পেতেন, তাঁর ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, লাঠি হারিকেন ছত্রখান। আমি একটুও দেরি করি না, লাঠির বাড়িতে ওটাকে ভর্তা করে দিয়ে আবার দৌড়ুই।

এর মধ্যে একদিন বাবাকে নিয়ে ফেরার সময় সড়কে উঠে দেখি একটা জাল জাল থলের মধ্যে বেশ কিছু জিনিশ আছে। প্রত্যেক দিনই আমি আন্দাজ করার চেষ্টা করি আজ বাবা কী এনেছেন। আর একটু ছোটবেলায় হয়তো দেখতে পেতাম শরতের আকাশের মতো—ধবধবে শাদা মেঘ আর নীল আকাশওয়ালা একটা রাবারের বল আনা হয়েছে। আজ জালের ফাঁক দিয়ে দেখছি একটা জিনিশ চকচক করছে। অনেক চেষ্টা করে বুঝলাম, ওটা একটা জ্যামিতি-বাক্স। তাহলে কাগজে মোড়ানো ওগুলো নিশ্চয়ই এবারের নাইন-টেনের বই। উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপতে লাগল—হাতের তালু দুটো ঘেমে গেল।

সেদিন রাতের আকাশ একেবারে অন্ধকার—তারাগুলো জুঁই বেলির মতো ফুটে আছে আর তাদের আলোয় এই অন্ধকার রাতটা ভুলে-ভরা মোহময় হয়ে উঠেছে। এরকম হয় এখানকার উদম অন্ধকার মাঠে—প্রায়ই হয় অনেকের—একে বলে 'ভুলো-ভূত'। ভূত নাকি চেনা রাস্তা ভুলিয়ে দেয়। এই কাঁচা সড়কটা শুধু আঁকাবাঁকা হলে সে একরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো—এ কেবলই সোজা 'দ' আর উল্টো 'দ'-দিয়ে ভরা। ক-টা 'দ' যে পেরিয়ে এলাম খেয়াল হয়নি আমার, বাবারও না। তিনি কথা বলছিলেন, শুনতে খুব ভালো লাগছিল। হঠাৎ তিনি বললেন, কোন বাঁকটা পেরিয়ে এলাম রে, আদুর জমির জায়গাটা? তাহলে তো চাঁড়ালগড়ের অশথ গাছটা দেখা যাবে। দাঁড়িয়ে গিয়ে উনি ঠাহর করার চেষ্টা করলেন, আমিও উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম দিকগুলো বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। বাবা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি রাঢ়ের খোলা মাঠে অন্ধকার-ভরা, তারা-জ্বলা আকাশের দিকে! কী বিশাল রহস্যে ভরা, তারাদের কী যে মিটিমিটি হাসি—রহস্যে ভরে উঠেছে পৃথিবী। আমার গা ছম ছম করতে লাগল। কে আমাদের এমন করে গিলে ফেলেছে? অনেকক্ষণ দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর এটাই ঠিক পথ হবে মনে করে খানিকটা এগোতেই দেখি সড়ক থেকে নেমে ধানের জমি ধরে হাঁটছি। এ তো হতেই পারে না—সড়ক তো ছাড়তে হবে না। বাবা দু-চারবার এদিক-ওদিক এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, যাঃ, আজ আর বাড়ি ফেরা হবে না। এই মাঠেই মারা পড়তে হবে রে। এই, তুই কি গাধা—এত চেনা পথ হারিয়ে ফেললি? সেটা যে তিনিও, তিনি চিনতে পারলেন না কেন? সে কথা তাঁকে বলে কে? তাঁর পুরনো মেজাজ ফিরে এল, অস্থির, খিটখিটে, কাউকে কোনো কথা বলতে দেবেন না। আমাদের অতি নিরীহ বড়ো চাচাও এইরকম। হায় হায়, বাড়ি ফেরা আর হলো না। সারারাত এখানেই থাকতে হবে। হাতে হারিকেন আছে তা-ও পথ হারিয়ে ফেললি! আমি তখন বাবার কথা শুনে মনে মনে হাসছি। মনের মধ্যে অবশ্য ভয়ও ঢুকেছে আমার। কোনোদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত মোটামুটি দিকটা আন্দাজ করে আমি সড়ক ধরেই হাঁটতে শুরু করলাম। বাবাও কোনো কথা না বলে পিছু পিছু হাঁটছেন। মিনিট দশেক পরেই দেখা গেল নিগণ স্টেশনের আলো; খানিকটা দূরে ট্রেনের সিগন্যালের লাল বাতি। ঠিক উল্টোপথে হাঁটছি বাপজান। ঐ দ্যাখো সামনে নিগণ। বলেই আমি সড়ক ধরে উল্টোমুখে হাঁটতে লাগলাম। বাবা গজগজ করছেন, হ্যাঁ, এবার মাঠের মধ্যে ঢুকে চর্কিপাক খাই। হয় গোবর্ধনপুর, নাহয় ক্ষীরগাঁ, না হয় সাঁওতা গিয়ে পৌঁছুই, না হয় মাঠের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে মরি। আমি শুধু বললাম, তুমি কোন বাঁক পেরুলাম তার হিশাব করো না—শুধু খেয়াল রেখো আমরা যেন কিছুতেই সড়ক না ছাড়ি। যখন বললাম নিগণের পুব দিকে সড়ক ধরেই য-গাঁ যেতে হবে, যেতে বাধ্য, এই সড়ক তো আমাদের গাঁয়ে ঢুকেছে। সড়ক ধরে টানা হাঁটলে যবগ্রাম পৌঁছে যাবই, আর কোথাও নয়। বাবা বোধহয় বিবেচনা করে দেখলেন, আমার কথাটা অকাট্য। সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বিরক্ত গলাতেই বললেন, বেশ বাপু, তাই চল্। পনেরো মিনিট এইভাবে হাঁটতেই চাঁড়ালগড়ের মেঠো পুকুরের পাড়ের অশথ গাছটা পাওয়া গেল। তারপর সব চেনা—ভয়ংকর অন্ধকারটা এতক্ষণে চোখে সইয়ে এসেছে। ঐ যে ঠাকুরদিঘির কালো শেওড়া গাছগুলি দেখা যাচ্ছে—পশ্চিমপাড়ে তালগাছের সারি। বেশি বড়ো হয়নি এখনো তালগাছগুলি। ঐ যে হাঁসপুকুরের আমগাছগুলোর বাগান দেখা যাচ্ছে—পুকুরের দুই কোণে দুই বিশাল তেঁতুলগাছ। রাতে ঘুমনো গাঁ-টাকে ঘোমটা-টানা বউমানুষের মতোই লাগছে। খুব মিষ্টি।

ঘরে মা চুপ করে বসে। কখন ঢুকে গিয়েছে, এত দেরি হচে ক্যানে?

আর বলো না, চাঁড়ালগড়ের কাছে ভুলো লেগে গেল। দিক ঠিক করে হাঁটতে গিয়ে আবার নিগণ গিয়ে হাজির। দেরি হবে না?

মায়ের গালে হাত, ওমা তাই নাকি? আমি ভয়ে মরছেলম।

বাবার অভ্যেস হচ্ছে হাত-মুখ ধুয়েই এসে বসতেন একটা চাটাইয়ের উপর। তারপর সারা দিনের খুঁটিনাটি গল্প করা। এই লোভেই আমি বসে থাকি। তাঁর শান্ত গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে এই বলাটা হয়ে যেত যেন রূপকথার গল্প। সে কথা যত সাধারণ কথাই হোক না, বাবার বলার গুণেই তা চমৎকার শোনাত। মা মাটির মেঝেয় থাবড়া গেড়ে বসে ডান হাতে মেঝেতে ভর দিয়ে বড়ো বড়ো চোখ মেলে শুনছে। গভীর শান্ত দৃষ্টি—অল্প বাতাসে পুকুরের জলে যেমন ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, ঠিক তেমনি মায়ের মুখে খুশি আনন্দ মৃদু বিষণ্ণতার ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। মা ভুল করে কিছু বললে বাবা বিরক্ত হয়ে বলতেন, শুনছো কি তবে? হামিদ আর কড়ের মধ্যে কত ফারাক জানো না। একজন কঞ্জুষ আর একজন হাতখোলা। আসলে শহরে কেউ তাঁকে কিছু খাওয়ালে তিনি খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি হতেন। বেলা সাড়ে ন-টার দিকে বর্ধমানে পৌঁছে তেষ্টা পাওয়া, স্টেশনের টিপকল খুললেই এমন তোড়ে পানি পড়তে শুরু হয় যে জামা-কাপড় ভিজে যায়। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজের উপরে ওঠা—'ও বাবা অন্ধের হাতে একটা পয়সা' বলে ভয়ংকর গান শোনা এক ভিখারির গলায়, নিচে অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, নেতাজি মিষ্টির দোকান, শিখদের ধাপা, কর্জনা গেট, কোর্ট—এই সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা। আমার অপেক্ষা কখন তিনি বাজারে ঢুকছেন, পাউরুটি কিনেছেন কিনা, 'এস' বিস্কুট দু-চারটে আনা হয়েছে কিনা আর সবচেয়ে জরুরি কথা বইয়ের দোকানে কখন গিয়েছিলেন—কী কী বই কিনেছেন। কারণ এই সব কথা যখন বলবেন তখন জিনিশগুলোও এক এক করে বের করবেন।

শেষ পর্যন্ত বাজারের কথা উঠল। তিনি পাশে রাখা থলেটার ভিতর থেকে প্রথম বের করলেন একটা বড়ো পাউরুটি, তারপর গোটা চার-পাঁচ 'এস' বিস্কুট। এরপর বেরুলো জ্যামিতি-বাক্সটা—বাজারের এটাই তোদের সবচেয়ে ভালো জ্যামিতি বাকসো। অনেক দিন থাকবে। আমার কিছুতেই আর তর সইছে না। বইগুলি বের করবেন কখন? বইয়ের প্যাকেটে হাত দেবার আগে বললেন, ওদের এবার নাইন-টেনের নতুন বই লাগবে। এ বছর থেকেই এই বইগুলি চালু করল গভমেন্ট। কাজেই এবার আর পুরনো বই পাওয়া যাবে না। কিনতে তো হবেই, নাহলে স্কুলে পড়াই বন্ধ হয়ে যাবে। দৈবাৎ এবার পকেটে কিছু টাকা ছিল। আরো দরকারি কাজ কিছু ছিল। কী মনে করে আজ ওর বইগুলোই কিনলাম। এখন যা হবার হোক—বলে তিনি কাগজে মোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা দুটি প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিলেন। হাতে যেন স্বর্গ তুলে দিলেন। দড়ি কেটে মোড়ক খুলে বের করলাম বইগুলো— ইংরেজি সংকলন—তাতে গদ্য-পদ্য দুই-ই, বেশ বড়ো একটা বাংলা সংকলন, তাতেও গদ্য-পদ্য দুই-ই আছে। ঘিয়ে রঙের শক্ত কাগজের উপর লাল হরফে লেখা—ইংলিশ কলেকশন অব প্রোজ অ্যান্ড পোয়েট্রি, তেমনি বাংলা সংকলন—গদ্য পদ্য। উঃ, কোনো জিনিশ এত সুন্দর হয়? এসবই আমার? সংস্কৃত সংকলনটাও রয়েছে। র‍্যাপিড রিডিং-এর জন্যে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' রয়েছে আর আছে নতুন সংস্করণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ইংল্যান্ডের ইতিহাস। নোট একটাও কেনা হয়নি। তাতে এক্ষুনি আমার কোনো দুঃখও নেই।

বইগুলো হাতে পেয়ে ওখান থেকে পালিয়ে একা হবার জন্যে একছুটে আমি ফুফুর উত্তরদুয়োরি ঘরে চলে এলাম। ঘরে একটা লম্ফ দপ দপ করে লাফিয়ে লাফিয়ে জ্বলছে, ঘরে ছায়া কাঁপছে, জানুর বিরাট বড়ো ছায়া ঘরের প্রায় চালে উঠে গিয়েছে। সে কী একটা পড়ছে খুব মন দিয়ে। আমি বইগুলো তার পাশে চ্যাটাইয়ে রেখে নিজেও বসে পড়লাম। জানু একবার তাকিয়ে দেখেই হাতের বইটা বন্ধ করে দিয়ে সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠে একটা কথাই বলল—এনেছে?

হ্যাঁ, এনেছে, এই দ্যাখ। দুজনে বই দেখাদেখি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি মলাটে হাত বোলাই, মুগ্ধ চোখে বইয়ের নামের অক্ষরগুলো দেখতে থাকি। জানু কেড়ে নেয় বইটা আমার হাত থেকে—দেখি, বলে শুধু শুধু ধুলো ঝাড়ে। তারপর ভিতরের পাতাগুলো দেখতে থাকে। ধবধবে শাদা মোটা কাগজে ছাপা—পাতার চারপাশে অনেকটা করে শাদা। ভিতরে ঝকঝকে ছাপা, অক্ষরগুলো বড়ো বড়ো, নতুন। সে সূচিপত্র দেখতে যায়, আমি কেড়ে নিই।

ইংরেজি বাংলা নোটদুটিও বেশ তাড়াতাড়ি কেনা হলো। স্কুলে গিয়ে দেখেছি সবাই এম. ঘোষের ইংরেজি নোট কিনেছে। মাত্র দু-একজনই এস. ব্যানার্জির নোট কিনেছে। এম. ঘোষের নোট নাকি খুব সোজা, ব্যানার্জির নোট ভারি কঠিন। দুটি নোটই আমি একটু একটু দেখলাম। এ পর্যন্ত যেটুকু ইংরেজি শিখেছি দুলাভাইয়ের কাছে, আর তারপর যেটুকু চর্চা করেছি তাতে আমার মনে হলো এম. ঘোষের ইংরেজিটা পানসে—এত সোজা যে মনে হয় বড্ডো আলগা আর এস. ব্যানার্জির (বিখ্যাত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) ইংরেজিটা বেশ আঁটোসাঁটো—একটু কঠিন বটে, তবে তার বাঁধনটা বেশ মজবুত। আমি এস. ব্যানার্জির নোটই আনতে বলেছিলাম বাবাকে। বাংলা নোট নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি—একটা হলেই হলো। আমার কাছে যে নোটটা ছিল তাতে আবার এক একটা গদ্য পদ্যর শেষে খুব উন্নত সমালোচনার নমুনা হিশেবে মোহিতলাল মজুমদারের লেখা থাকত। সেই বয়স থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজুমদারকে আমার একটুও ভালো লাগত না। খুব সবজান্তা ভাব। হ্যাঁ, এইবার পড়ার মতো পড়া শুরু করতে হবে। ডন-বৈঠক করে লাগতে হবে। অঙ্কটা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে না, যা হবার হোক। গণিতটা একেবারেই পারতাম না—জ্যামিতির উপপাদ্য-টুপপাদ্য বেশ বুঝতাম—এক্সট্রা একটুও না—বীজগণিতের দু-চারটে সূত্র মুখস্থ ছিল কিন্তু তাদের ব্যবহার করার সাধ্য ছিল না। প্রথম ব্রাকেট, দ্বিতীয় ব্রাকেট, থার্ড ব্রাকেটের রহস্য কোনোদিন বুঝতে পারলাম না। যা হয় হবে, পরে দেখা যাবে—এই রকম ভাব করে আমি খুবই উৎসাহে ক্লাস নাইনের পড়া আরম্ভ করলাম। দুর্গাশঙ্করবাবু, কালীকিঙ্করবাবু, সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই ঠিকই আছেন, যোগ হয়েছেন হেডমাস্টার বনমালীবাবু আর গোপীপদ পাঁজা। প্রতিদিন এখন আর মার খেতে হয় না শান্তিরামবাবুর। শিবরামবাবুর জন্য মন আকুলি-বিকুলি করত। কিন্তু তাঁকে ক্লাস নাইনে কী করে পাবো?

১৯৫০ সালে আমাদের স্কুল থেকে একটাও ম্যাট্রিকুলেশন পাস করল না। বদনাম হয়ে গেল স্কুলের। আমার নাইনে ওঠার সময় ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে টেস্টে 'এলাউ' হয়েছিল মাত্র চারজন। তাদের ক্লাসে যেতে হতো না। বাড়ি যাওয়াও বন্ধ। স্কুলের মাটির ঘরের বোর্ডিংয়ে থাকতে হবে। বনমালীবাবু তাদের পেছনে ফিঙের মতো লেগে আছেন। তাঁর ঘরের সামনে বালি-কাঁকর ভর্তি যে উঁচু জায়গাটা আছে, সবাইকে সেখানে বসিয়ে পড়াতেন। চানটান করে দুপুরে খেয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিয়েই ছেলেরা আবার তাঁর কাছে বিকেলে বাইরের ঐ জায়গায়। পড়ন্ত বিকেলে ফুটবল খেলার সময় ছুটি। এই রুটিনে একদিন ফাঁকি চলত না। চণ্ডালের রাগ বনমালীবাবুর। ক্লাস টেনের ছাত্র হলে কী হয়! এই ছাত্রদের তিনজনই নিগণের। গোপীপদ বাবুর ছেলে মনটুদা, কুরুম্বর সুকান্তদা, অমিয়দা আর অন্য একজন ধুরন্ধর থাকহরিদা। এদের মধ্যে থাকহরিদার বয়স একটু বেশি। বেশ বাবু হয়ে থাকতেন। ইস্তিরি করা ধুতি জামা, চুলে গন্ধতেল। সেদিন সকালে আমি দাঁতন করব বলে নিমের ডাল ভাঙতে গিয়েছিলাম বোর্ডিং ঘরের পিছনের তেড়াব্যাঁকা নিমগাছটা থেকে। শীতের সকালের রোদ্দুর একটু তেতে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনমালীবাবু পড়াচ্ছেন তিনজনকে নিয়ে, একজন, থাকহরিদা নেই। আমি দেখছিলাম গাবাকাটাদের বাঁশঝাড় থেকে। মস মস শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি মোজাপরা চকচকে পাম স্যু, পাটভাঙা মিহি ধুতি আর ফিনফিনে পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, সোনার চেইন-ওয়ালা সোনার ঘড়ি, চার-পাঁচটা আংটি—এই সব দিয়ে একেবারে ফুলবাবুটি সেজে হেডমাস্টারের ঘরের দিকে থাকহরিদা যাচ্ছেন। চলে যাবার সময় সেন্টের ভুর ভুর গন্ধ ছড়িয়ে গেল। আমি ব্যাপার দেখার জন্যে আর একটু এগিয়ে গেলাম। ঢালুটা প্রায় পার হয়ে বনমালীবাবুর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে থাকহরিদা, তিনি তার দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই চোখ নামিয়েছেন। তারপর বনমালীবাবুর গলা শুনতে পেলাম, কাল পরশু কোথায় ছিলি? মাথা চুলকে কাঁচুমাচু করে থাকহরিদা বলতে গেলেন, মাস্টারমশাই, হঠাৎ গতকাল আমার বিয়ে হয়ে গেল... কথা তার শেষ হলো না। বসে বসেই বনমালীবাবু থাকহরিদার কোমর বরাবর একটা লাথি মারলেন। হুড়মুড় করে থাকহরিদা তার পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি, মোজাপরা পাম্প স্যু, আংটি, সোনার বোতাম, ঘড়ি সবসুদ্ধু নিয়ে ঢালু বেয়ে গড়িয়ে বালি কাঁকর কাঁটায় একাকার হয়ে একেবারে কলতলার কাছে এসে পড়ে থিতু হলেন। শুধু শুনতে পেলাম বি. ব্যানার্জির গলায়, শয়তান! তারপর যা যা ঘটল ভারি মজার ব্যাপার হলেও থাকহরিদার ঐ চেহারা আর মুখ মনে পড়ছে বলে আর লিখতে গেলাম না।

এর মধ্যে বাড়িতে আমার জন্যে একটা মহা আনন্দের কাজ হয়ে গেল। সেদিন সকালে একটু দেরিতে উঠে দাঁতনের জন্যে নিমের ডাল ভাঙতে বাইরে যাচ্ছি, দেখি দু-তিনজন কাজের মানুষ বাড়িতে ঢুকছে, তাদের হাতে কিছু যন্ত্রপাতির মতো রয়েছে। ওদের পিছনে পিছনে গিয়ে দেখি বাড়ির পুবদিকে, রান্নাঘরের সামনে খোলা জায়গাটার মাঝখানে একটা টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলছে। আয়োজন করা হয়ে গিয়েছে, বাঁশ পুঁতে কপিকলের মতো বানানো হয়েছে, নিচে মেঝেতে বেশ কয়েকটা টিউবওয়েলের পাইপ, দড়িদড়া, দু-চারটে লোহার যন্ত্রপাতি এই সব। দেখতে দেখতে পুরো আয়োজন হয়ে গেল, কপিকলে উঠল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন, নিচে দাঁড়িয়ে চেন বা দড়ি টানার একটা লোক। শেকল-টেকল লাগানো শেষ হবার পর কাজ শুরু হলো। টিউবওয়েল পোঁতা আমি দেখেছি, চার-পাঁচদিন সময় লাগত তখন। কপিকল টানা হচ্ছে আর পাইপের মুখ দিয়ে কাদাপানি উঠছে, কপিকলের উপরের লোকটা পাইপের মুখে হাত দিচ্ছে আর পানিকাদা বেরুনোর সময় হাত তুলে নিচ্ছে। ক-দিন চলবে এই রকম, পানির সঙ্গে কতরকম কাদা যে বেরুবে তার ঠিক নেই—মেটে, কাল, বালি-বালি, এঁটেল পেতল-রঙা শাদা এইসব।

তাহলে বাড়িতেই একটা টিউবওয়েল পোঁতা হচ্ছে! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাকে আর হাঁড়া-কলসি, বালতি নিয়ে তামিলপুকুর বা ঘোলা থেকে জল বইতে হবে না। টিউবওয়েল থেকে খাবার জল আনতে হবে না। সকালে খানিকক্ষণ পড়া ছাড়া কোনো কাজ নেই! এ কি বিশ্বাস করা সম্ভব? টিউবওয়েল পোঁতা হয়ে গেলে একদিন বাবাকে বেশ নরম গলায় বলতে শুনলাম মায়ের কাছে, গতবার মাজেম ছুটিতে এসে একদিন বলল, আব্বা, কালো যে প্রত্যেক দিন এত পানি বয়ে আনে, আমার দেখে কষ্ট হয়, ঐটুকু ছেলে এত পরিশ্রমের কাজ করে কী করে। এ দেখা যায় না, আপনি যত কষ্টই হোক একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিন বাড়িতে। কথাটা মনে একটু ঘা দিল। তাই কষ্ট করেই টিউবওয়েলটা বসালাম।

আমি জানি আমাদের বাড়িতে জামাইয়ের সাত খুন মাপ। খুবই খাতির তার। শ্বশুরবাড়িতে অন্যায্য কিছু বললে বা করলেও কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। আমার এমন মেজাজি খিটখিটে বাবা পর্যন্ত জামাইয়ের কাছে জব্দ। জামাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেই তিনি প্রায় লাজুক বনে যান। যত টানাটানিই থাকুক, জামাইয়ের জন্যে দুধ ছানা ক্ষীর ঘি ইত্যাদির আলাদা ব্যবস্থা হবে।

যাক, তবু ভালো টিউবওয়েলটা জামাইয়ের কথাতেই হয়েছে। বাড়িতে আমার কোনো খাটনির কাজ নেই। গাই গরুটা কচি গেমা খেয়ে মরে গিয়েছে। গোয়াল ফাঁকা। আমার তাহলে সকালে খানিকক্ষণ পড়া, তারপর পুকুরে সাঁতার-টাতার কেটে, পানিফল তুলে, দাঁড়কি মাছ ধরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাদা ছোড়াছুড়ি খেলে বাড়ি ফিরেই স্কুলে যাওয়া, দুপুরে তিন লাফে বাড়ি এসে মায়ের সাথে পীড়াপিড়ি করে, জ্বালাতন করে যেমন করেই হোক দুপুরের ভাতটা খেয়েই আবার স্কুলে যাওয়া। ছুটির পর বাড়ি ঢুকে সন্ধেবেলার হারিকেনটার কাচ মুছে, তেলভরে তার মাথায় একটা দেশলাই বাক্সো রেখে ষাটতলার মাঠে ফুটবল খেলতে দৌড়ানো। বাবার বকুনি একরকম থেমেই গিয়েছে, মারধর নেই। বারণ ছিল দুটো : সন্ধের পরে পরেই বাড়ি ফেরা। কোনোরকমেই রাত করা চলবে না। একদিন ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল বলে বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দিলেন। হবিদের বাড়ির খামারে একটা গরুর গাড়িতে বসে থাকলাম। একটু পরেই ভুলে গেলাম বাড়ি থেকে বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম আকাশে বিরাট সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে, চারদিক নিঃশব্দ, তারাগুলো ফুটে উঠেছে।

পৃথিবীটা বড়ো ভালো। কী আছে দিগন্তের ওপারে? জল মাটি মাঠ নদী সমুদ্র, অচেনা সব দেশ। একবারও মরবার কথা মনে এল না। জীবনটা আমি কী করে কাটাতে চাই? অনন্ত জীবনটা যখন চলতেই থাকবে, কী হলে আমি সবচেয়ে ভালো থাকব? স্কুলে মাস্টার হয়ে ঢুকে শেষ পর্যন্ত হেডমাস্টার হয়ে স্কুল-লাগোয়া বাসায় থাকতে পারলে জীবনটা ধন্য হয়ে যেত। ভয়ে ভয়ে আর একটা স্বপ্ন দেখি কলেজের প্রফেসর হয়েছি। ব্যস, সব ভাবনা শেষ—আর কিছু ভাবার সাহস নেই। এত কথা যে এখন লিখতে পারছি, তার কারণ ঐ সন্ধ্যাটা মনের মধ্যে খোদাই হয়ে আছে চিরকালের জন্যে। এই সময় কানে এল, কে রে এখানে অন্ধকারে বসে আছে? গলা শুনেই বুঝতে পারলাম ল'চাচা। জবাব না পেয়ে তিনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, কী রে কালো এখানে বসে কী করছিস? এতক্ষণে আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম, বাপজান তাড়িয়ে দিয়েছে। শুনে তিনি বললেন, দূর বোকা! তাড়িয়ে দিয়েছে আবার কী কথা। চল আমার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরে দেখলাম অন্ধকার বারান্দায় বাবা বসে আছেন। আলো নেই। বাবার সঙ্গে জোরে কথা বলতে কেউ পারে না। তবু ল'-চাচা বললেন, ছেলেটা আঁধারে একা বসে রয়েছে, বাড়ি ফিরতে পারছে না ভয়ে। এ আবার কী! যা ঘরে যা। বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি কথাও বললেন না, আমি হারিকেন জ্বালিয়ে ওপরের ঘরে উঠে গেলাম। যাই—বলে ল'-চাচা চলে গেলেন।

আর একটা বারণ ছিল, প্রচণ্ড গরমের দিনে দুপুরের খাবার পর ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে বাধ্য করা। তিনিও নাকে কাপড় দিয়ে শুয়ে থাকতেন। সে যে কী উৎপীড়ন! কখন বাইরে যাব, স্কুলে গিয়ে দেখব ফুটবলে পাম্প দেওয়া হচ্ছে কিংবা ব্লাডারের লিক সারিয়ে ঠিকমতো পাম্প করে ব্লাডারের নলটাকে শক্ত করে বেঁধে ফুটবলের মুখে ঢোকানো—তারপর ফিতে বাঁধা। কঠিন কাজ। আচ্ছা, রোদে কী হয়? মানুষ রোদের মধ্যে কাজকর্ম করে না? এইবার যাই, এইবার যাই করতে করতে উঠে বসি, বাবা সঙ্গে সঙ্গে, উঁহু না, এখন না। রোদ পড়ে আসুক।

এই দুটি বারণ ছাড়া বাকি সব বারণ উঠে গিয়েছে। এখন আমি একনলা বন্দুকটা নাড়াচাড়া করতে পারি, সেটাকে ভেঙে তিন টুকরো করে নল পরিষ্কার করে, একটু গান-অয়েল লাগিয়ে আবার জোড়া দিয়ে রেখে দিতে পারি, গ্রামোফোন বাজাতে পারি ইচ্ছেমতো, কাউকে ডেকে এনে শোনাতেও পারি। আগে আমাদের একটা চোঙ লাগানো গ্রমোফোন ছিল, সেটা আমি চোখে দেখিনি। এবারে বাবা কলকাতা থেকে এনেছেন চমৎকার বার্নিশ-করা মেহগনি কাঠের একটা বড়ো বাকসো গ্রামোফোন—তার নাম হিজ মাস্টারস ভয়েস—একটা আদুরে কানঝোলা কুকুর গ্রামোফোনের সামনে বসে গান শুনছে। তার মালিকের গলা যে—শুনবে না? ঢাকনা খুললেই ছবিটা চোখে পড়বে। বাড়িতে রয়েছে তেত্রিশ পাকের অনেক রেকর্ড। হিজ মাস্টারস ভয়েস, মেগাফোন—এইসব কোম্পানির রেকর্ড। আব্বাসউদ্দিনের গাওয়া নজরুলের অনেক ইসলামি গান—সেসব গান আজকাল শুনতে পাওয়াও যায় না। মেগাফোনের 'চন্দ্রগুপ্ত' পালা, হিজ মাস্টারস ভয়েসের 'মীরকাশিমের পালা'। কত সব বড়ো বড়ো শিল্পীর রেকর্ড— পঙ্কজ মল্লিক, জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কমলা ঝরিয়া আর কতসব এখন ভুলে-যাওয়া শিল্পীদের নাম। তাঁদের মতো করে আর কেউ কখনো গাইতে পারলেন না। বেশ কতকগুলি কমিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেকর্ড, কাজী নজরুল ইসলামের গান, সন্তোষ সেনগুপ্তের গাওয়া নজরুলের গান, শচীন বর্মণের 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে', 'পদ্মার ঢেউ রে' ইত্যাদি। আর 'চন্দ্রগুপ্ত' প্লের শিল্পী শিশির ভাদুড়ি, ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ সেনগুপ্ত, রানীবালা, 'মীরকাশিম' প্লের নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, রানীবালা। মেগাফোন রেকর্ডের কভারে থাকত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, বেগম আখতার, রবীন মজুমদার, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের ছবি। একেবারে রূপকথার জগৎ। বাইরে থেকে এসে বাজাতে শুনলেও বাবা কিছু বলতেন না। তাঁর আদেশ ছিল প্রতিটি জিনিসের যত্ন করা। যত সামান্য জিনিশই হোক যত্ন করতে হবে, যেখানকার জিনিশ ঠিক সেখানে রাখতে হবে, কোনো জিনিশ 'এই তো ছিল' বলে খোঁজাখুঁজি করা চলবে না। সাইকেলটাও হাতে এসে গেল। ভালো করে চড়তে শেখার পর থেকেই সাইকেল নিয়ে বেরুতে পারি, যেখানে খুশি যেতে পারি, আর বিপদের মধ্যে কোনো কিছু করতে চাইলে তো কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে মত দিয়ে দেবেন। একবার আমি সাইকেল নিয়ে কুড়ি মাইল দূরে কচি-আলম ভাইদের গ্রাম উক্তায় যেতে চাইলাম সাইকেল নিয়ে। ওখানে যেতে হতো দু মাইল হেঁটে নিগণ, তারপর সেখান থেকে ছোটলাইনের ট্রেনে বলগনা স্টেশন, সেখান থেকে পিচঢালা ভাঙাচোরা পথে বাসে করে যেতে হতো গুস্‌করা। সেখান থেকে কুনুর নদী পেরিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটে বা গরুর গাড়ি করে উক্তা গ্রামে। বাবা অবলীলায় বললেন, যাও। আমি একদিন সকালে সাইকেল নিয়ে বেরুলাম। নিগণ পৌঁছে সেখান থেকে রেললাইনের দু পাশের একদিকের সরু রাস্তায় উঠলাম। আগাগোড়া ছোট ছোট শাদা গোলাপি পাথর বিছানো, কোনো কোনো জায়গায় ছোট ছোট কুচি কুচি ঐ একই পাথর। সেই রেলপথের দু পাশে জঙ্গল—বনকুল, আগাছা, আকন্দ, বাবলাগাছ ধরে লতানো কুঁচ গাছ—ঐ টানা জঙ্গলের দুপাশে খাল ডোবায় শাপলা পদ্ম। রাস্তায় মাটির জন্যে যে খানাখন্দ তৈরি হয়ে যায়, সেগুলোই। তারপরেই বিশাল বিশাল খোলা মাঠ, ফসল ভরা বা শূন্য আর কখনো-সখনো বিশাল এক একটা বটপাকুড় এই সব গাছ আর গাছে ঘেরা মেঠো পুকুর। কাছে দূরে গ্রাম। কোনো গ্রামের গা ঘেঁষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছি, কোনো গ্রাম এত দূরে যে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। মাঠের মধ্যে কিলবিল করছে বিধবার সিঁথির মতো শাদা আলপথ, এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে যাবার জন্যে।

বলগনা পৌঁছে পেয়ে গেলাম পাকা সড়ক। এখান থেকে দিনে তিনটে বাস যায় গুসকরা আর তিনটে যায় নতুন হাট বা মঙ্গলকোট। অজয় নদীর ধারে। সেকালের সব ভাঙাচোরা, হ্যান্ডেল ঘোরানো, রাবারের ভেঁপুওয়ালা বাস—আর্তনাদ করতে করতে যায়। পথের দু-পাশের গাঁগুলো একেবারে কাছে, তিন মাইল দূরে আমার মামার বাড়ি মুরাতিপুরের মাঝখান দিয়ে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি পাকা রাস্তা। মুরাতিপুরের পরে এড়ুয়ার, তারপর গুসকরার কাছাকাছি একটা এরোড্রম।

গুসকরা থেকে আর রাস্তা নেই। কুনুর পেরিয়ে গরুর গাড়ির রাস্তা ধরে যাবার উপায় নেই। অগত্যা ঐ রেললাইনের পাশের কঠিন রাস্তা ধরেই যেতে হবে। এটা বড়ো লাইন, কালো কালো বড়ো বড়ো ধারালো পাথর ঢালা। সেই পাথরের ওপর দিয়ে সাইকেল চালানো যায় না। রাস্তা দু পাশ মাঠের চেয়ে অনেক উঁচুতে। সাইকেলসুদ্ধু পড়ে গেলে বিপদ! তবু সেই পথই ধরলাম।

পথ ছাড়া আর কোনোদিকে মন দেবার উপায় নেই। দু চারটে পাথরের উপর দিয়েই সাইকেল চালাতে হচ্ছে। এই সময় দেখি উল্টোদিক থেকে একটা সাইকেল আসছে। এইবার কী হবে? আমি যতদূর পারি আমার ডান দিকটা ছেড়ে দেব, আমাকে বাঁয়ে রেললাইনের দিকে সরে যেতে হবে—যত পাথরই থাকুক সেখানে। আমি পণ করলাম সাইকেল থেকে নামব না কিছুতেই। নামতে হলে ওকেই নামতে হবে। পড়লে আমি লাইনের ওপর পড়ব আর ও পড়বে ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে ঢাল বেয়ে মাঠে পুকুরে বা গাছতলায়। পরস্পরকে পেরুচ্ছি ও বেশ সহজেই ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি সরতে সরতে রেললাইনের গায়ে বড়ো বড়ো পাথরের ওপর সাইকেল তুলতে বাধ্য হলাম। টাল সামলাতে না পেরে পড়েই যাচ্ছিলাম—বাঁ পা বাড়িয়ে লাইনের ওপরে রাখতেই কাত হয়ে-যাওয়া সাইকেল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে আর গেলাম না। ও জেতে নাই, হারেও নাই। আমিও জিতি নাই, হারিও নাই।

দুপুর গড়িয়ে গেল উক্তা পৌঁছুতে। গুসকরার পরের স্টেশন ভেদিয়া পেরিয়েই বোলপুর। কাটোয়ার অজয়কে ভেদিয়ার আগে পার হতে হয়। উক্তা থেকে শান্তিনিকেতন চার পাঁচ মাইলের বেশি হবে না। ট্রেন লাইন ছেড়ে গাঁয়ে ঢোকার পথটুকু খুব খারাপ। একটা বড়ো পুকুরকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল পাড়া। ছোটোখাটো একটা গ্রামই বলা যায়।

যাক, শেষ পর্যন্ত পারা গেল। সবটা পথ সাইকেল চালিয়ে এসেছি দেখে কচিভাইরা খুব খুশি। মাত্র একটা দিন ছিলাম। একদিন পরেই সকাল সকাল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। সব সময়েই ফেরার পথটা কম মনে হয়। গুসকরার পাকা রাস্তায় উঠতে পারলেই শান্তি। রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। দু-চারটে গরুর গাড়ি আর একবার বলগনা-গুসকরার লক্কর ঝক্কর বাসটার পাশ কাটিয়ে বাতাসের বেগে চালাচ্ছি। এত ভালো লাগছে কেন? রাঢ়ের খোলা মাঠ শরৎকালের বেলা দশটার রোদে ঝলমল করছে। দুপাশের জাম গাছগুলিতে এখনো কিছু জাম রয়েছে, গাছের তলা ঝরেপড়া জামে ভর্তি।

আমার ভালো লাগছে বলতে গিয়ে এসব কথা বলছি কেন? আকাশ রোদ বাতাসের সঙ্গে আমার ভালো লাগার সম্পর্ক কী! সেটাই তো জানি না। কেউ জানলে আমাকে জানাবেন। শুধু মনে হচ্ছে এমন ছাড়া আমি জীবনে পাইনি। কোথাও আটকে ধরার, পিষে ধরার বাঁধন নেই। কখন, কত তাড়াতাড়ি যে এরুয়ার এসে পৌঁছে গেলাম! এরুয়ার গ্রামে কালীপুজো উপলক্ষে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো একটা মেলা হয়। মামার সঙ্গে দু-একবার এসেছি এখানে। গ্রামটাকে দেখতে যে কেমন মানুষের ভিড়ে তা বুঝতেই পারিনি। মেলায় অঝোর ধারায় বৃষ্টি, কোথাও কোনো ফাঁকা জায়গা নেই—শুধু মানুষ আর মানুষ আর মেলার দোকানপাট। মনে পড়ছে, তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তাড়াতাড়ি সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে—মামার হাত ধরে মানুষের ভিড় ঠেলে ঝাঁকড়া গাছপালায় ঢাকা বড়ো দিঘিটার উঁচু পাড়ে পৌঁছেছিলাম। মানুষের ভিড়ের পাশ দিয়ে কোনোমতে বলির বেদিটা দেখতে পেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলি আর দেখা গেল না। সারা দিনে হাজার হাজার পাঁঠা বলি হয়েছে। রক্তের মাংসের বাসি গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে।

আজ দেখতে পাচ্ছি এরুয়ার গাঁ-টা। রাস্তার পাশে বিখ্যাত স্কুলের মাঠে টিউবওয়েল আছে। বিশাল ফাঁকা মাঠের একপাশে সাইকেলটাকে শুইয়ে রেখে আমি টিউবওয়েলের ঠাণ্ডা জলে হাত-পা মুখ মাথা পুরোপুরি ভিজিয়ে নিলাম। পেট ভরে জল খেলাম। তারপর ঘাসের ওপরেই একটা মেহগনি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লাম। ঘুমানোর জন্যে নয়, শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্যেও নয়, আমার মুক্তি আর আনন্দের স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করার জন্যে। গ্রামটাকেও একবার দেখে নিলাম। পথঘাট নির্জন ফাঁকা—রোদে রাস্তায় বালি চিকচিক করছে। পাকা রাস্তা থেকে গাঁয়ে ঢোকার যে রাস্তাটাকে আগে দেখতেও পাইনি—এখন দেখলাম সেই রাস্তাটা অনেকটা চওড়া, সম্পন্ন গ্রামগুলিতে যেমন হয়। এঁটেল মাটির অঞ্চল নয় এটা, বালি মাটির জায়গা—রাস্তায় কাদা নেই—বালিভরা রাস্তা—সেটা গিয়ে ঠেকেছে এক বড়ো গৃহস্থের আলকাতরা লাগানো বিরাট বাড়ির বৈঠকখানার চওড়া বারান্দায় গিয়ে। সেখান থেকে আবার ডাইনে মোড়।

মনে হয় এরুয়ার থেকে বাড়ি আসতে এক ঘণ্টাও লাগেনি। খামারের দেয়ালে সাইকেলটাকে ঠেসিয়ে রেখে দিলাম। এখন স্থির শান্ত এই গতিশীল যন্ত্রটা। এরকম ভেবেও ভালো লাগল। দুটি চাকায় এমন গতি বাঁধা আছে, যা হাঁটার চেয়ে অন্তত পাঁচ গুণ বেশি আর হাঁটতে দুই পায়ের যে পরিশ্রম হয় তার প্রায় কিছুই লাগে না চাকা দুটো চালাতে, অথচ ব্যবহার করা যায় দুই পায়েরই মতো। ফিলিপস পুরনো সাইকেলটার দিকে চেয়ে একেবারে আপন বন্ধুর মতো লাগে।

এবারের এই শরতের ছুটিতেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর একটা সুযোগ জুটল। দুলাভাই এসেছেন, তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর মহা আমুদে বন্ধু জহরভাই আর এক দম্পতি। এরা হলেন জহরভাইয়ের শ্যালক আর শ্যালকপত্নী। সদ্য বিবাহিত। ঠিক হলো প্রথমে যাব জহরভাইদের গ্রাম ভোঁতা, তারপর যাওয়া হবে পাশের গ্রামে ওঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে, সব শেষে জানুর শ্বশুরবাড়ি মুরশিদাবাদের সাগরদিঘির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণের পাড়ে জগদলে। দিন দশেকের ব্যাপার। আশেপাশের দু-চারটি গ্রাম ছাড়া কোথাও তো তেমন যাওয়া হয় না। কাজে অকাজে যাই বামুনগাঁ, ক্ষীরগ্রাম, ধারসোনা, পুইনি, পলাশী, ইটে আর সব সময়েই নিগণ। আর যাই মামার বাড়ি মুরাতিপুরে, পাটনায়, কৈতনে। নাম জানি আশেপাশের সব গাঁয়ের অথচ যাওয়া হয় না।

এদিকে আমি ঘুরে বেড়াতে চাই বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, দেখে বেড়াতে চাই এক একটা গাঁয়ের চেহারা, গাছপালা, দিঘি পুকুর, মসজিদ মন্দির, বেদে, পাখমারাদের গাঁগুলো। তা আর হচ্ছে কই? বর্ধমান কাটোয়া এতটাই চিনি যে কাজে সেখানে যেতে হলেও বিরক্ত লাগে। আর আমার অদ্ভুত একটা ধারণা ছিল যে, আমাদের এই যবগ্রাম ক্ষীরগ্রাম ছাড়া বাকি সব ধাপধারা গোবিন্দপাড়া, স্কুল-টিস্কুল তেমন নেই। সেসব গাঁয়ে লোকেরা বিশেষ করে মোসলমানরা একেবারেই অশিক্ষিত, মূর্খ। কেন আমার এই ধারণা হয়েছিল? সে কি মনে মনে আমাদের গ্রামের সঙ্গে অন্যান্য গাঁয়ের তুলনা করতে গিয়ে? কোনো কোনো গাঁয়ের নাম শুনলেই মনে হতো এ গাঁয়ে একজনও শিক্ষিত মানুষ নেই। একেবারে কুয়োর ব্যাঙ ছিলাম তো! বামশোর, ভূমশোর, কাফশোর, শিমূলে—এসব গ্রামে ঢুকলেই দেখা যায় রাস্তার যেখানে সেখানে আস্তাকুঁড়, সারগাদা—মুরগি চরে বেড়াচ্ছে—সারগাদাগুলো আঁচড়ে আঁচড়ে যত বোদ-বাদারি সব ফেলছে রাস্তায়। হাঁটা যায় না সেসব রাস্তায়। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলের বাড়িই মাটির তৈরি, খড়ের চাল। মাত্র দু-তিনটি বাড়িতে আছে টিনের চাল। সারা গাঁয়ে একটি, দুটি বা তিনটি। এগুলি সচ্ছল গৃহস্থের বাড়ি। হিন্দুপাড়া মুসলমান পাড়ার চেহারা একই, তবে তফাৎ প্রতিদিনের জীবনের আচার-বিচারে একটু আছে বৈকি। সারকুড়ের অবস্থা হিঁদু পাড়ায় এত বিচ্ছিরি নয়। হিন্দুরা মুরগি পোষে না, দু-চারটে বাড়িতে হয়তো হাঁস পোষে। সেগুলি সারা দিন পুকুরেই। মুসলমানপ্রধান গ্রামগুলি গোরুর মাংস খায়, তার হাড়-হাড্ডি নাড়ি-ভুঁড়ি যেখানে সেখানে পড়ে থাকে। দুর্গন্ধ বের হয় গোটা পাড়া থেকে। মুসলমানরা নিজেরাই বলে আমাদের বাড়ি সব ন্যাতা-জোবড়া, পা রাখা কঠিন বাপু। হিঁদুপাড়ার এই অবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, তারা গোমাংস খায় না। হিঁদুরা বলে মুসলমানদের বাত-কর্মের গন্ধও আমাদের থেকে আলাদা। পরিষ্কার দু-রকম গন্ধ। ওরা মুরগি পোষেও না, খায়ও না। হাঁস পোষে কিন্তু খায় না। মুরগিকে রামপাখি বলে দু-চারজন ঘাড়ত্যারা মানুষ মুসলমান পাড়া থেকে মুরগি কিনে সন্ধেরাতে ফিস্টি করে, সঙ্গে কারণবারি থাকে। যাই হোক, এসব কারণে হিঁদুপাড়াটা একটু ছিমছাম থাকে। উঠোনের এক কোণে গাঁদা, দোলনচাঁপা, সন্ধ্যামণি এই সব ফুলগাছ।

এসবের একটুও খুঁজে পাওয়া যায় না মুসলমান পাড়ায়। তাদের উঠোনগুলোয় ঝাঁটপাট পড়লেও, হিন্দু বাড়ির গোবর-নিকানো উঠোনের মতো তকতকে পরিষ্কার নয়। তবে মুসলমানরা খুব সাহসী, হঠকারী, দুর্ধর্ষ। সারা গাঁয়ে একঘর মুসলমান থাকলেও তার রোখ মরে না। গাঁয়ের সমস্ত হিন্দুদের বিপক্ষে একা দাঁড়াতে ভয় পায় না। যদি মরি একা মরব না, দু-একজনকে সঙ্গে নিয়েই মরব। হিঁদুরা বলে, দু-চারটে অক্ষর হজম হলেও ভাইসায়েবরা এমন হতো না। তবে অনুপাতটা একটু বেশি হলেও অক্ষর হজম তাদেরও তেমন হয়নি। মুসলমানরা বাহাদুরি করে বলে অক্ষর লিয়ে করব কী, হাঁদু-মোচলমান সব শালাই করছে তো চাষবাস। অক্ষর ধুয়ে কি পানি খাব—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কারণে আমার মনে হতো বামশোর, ভূমশোর, কাফশোরে যাওয়া যাবে না।

এতক্ষণ যা বললাম তার মোটামুটি ছবিটা এরকম হলেও আমার ধারণাটা যে কত ভুল, পরে তা টের পেয়েছি। বামশোর, ভূমশোর, শিমূলে, কেশেরার মতো মুসলমান প্রধান গ্রামে কত শিক্ষিত, প্রতিভাবান, রত্নের মতো মানুষ জন্মেছে আমার সময়ের আগে, সঙ্গে ও পরে তার অন্ত নেই।

যাই হোক জহরভাই বা ঐ দম্পতিকে কদিন আমাদের বাড়িতে দেখেও আমার মনে হয়েছিল ওঁদের ভোঁতা গ্রামটা দিনেও আঁধার। ক-দিনের জন্যে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে যাওয়া হবে, এটা ভেবেই খুব উত্তেজনা হলো। মার্টিন কোম্পানির ছোটলাইনের ট্রেনে চেপে ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের মধ্যে বর্ধমান শহরে পৌঁছনো গেল। ওখান থেকে বড়ো লাইনের ট্রেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠতে হবে। বড়ো লাইনের ট্রেনে বোধহয় এই আমি প্রথম চড়লাম। এটা আবার কী অদ্ভুত জন্তু রে বাবা। ধাই-ধপর, ধাই-ধপর শব্দে এটা দেখছি চিতাবাঘের মতো দৌড়ুচ্ছে। তিন চারটে স্টেশনের পর জামালপুর এসে গেল। এখানেই আমাদের নামতে হবে। দুটো গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছে। নামেই গরুর গাড়ি। আমাদের এদিকে মোষের গাড়ি বলাই ভালো। এমন মাটি এখানকার যে চাষবাস করার জন্যে গরু তেমন কেউ কেনে না। মোষই ভালো। যে গাড়িদুটো আমাদের জন্যে পাঠানো হয়েছিল, সে দুটো মোষের গাড়ি। হাতির মতো প্রকাণ্ড একটা একটা মোষ। কিন্তু জহরভাইদের গ্রামে যেতে এই মোষগুলিও খাবি খেতে লাগল। সে যে কী বিচ্ছিরি রাস্তা! বর্ষা কবে চলে গিয়েছে, সারা রাস্তা এখনো কাদায় ডোবা, হাঁটার কোনো কথাই ওঠে না। দূরে দূরে এক একটা গাঁ, কোনো কোনো গাঁয়ের ভিতর দিয়েই রাস্তা। একই রকম, কাদায় ভরা। কোনো ভাঙায় গাড়ি নামছে, গাড়োয়ানরা নানান উৎসাহ দিয়ে কথা বলে হৈ হৈ করে চেঁচাচ্ছে আর মাঝে মাঝে খুব খারাপ কথা বলছে। মোষগুলোর বাবা-মাদের সঙ্গে কীসব নাকি করবে? তা কি সম্ভব? সব মিলে গোটা ছয়েক গ্রাম পেরুতে হলো আর কাদাভর্তি শরৎকালের বড়ো বড়ো মাঠ। মনে হচ্ছে আমরা সবাই হারিয়ে গিয়েছি, ভোঁতা গ্রামটা এ গ্রহেই নাই। একবার দেখলাম আমাদের গাড়ির মোষদুটি হঠাৎ হারিয়ে গেল। চেয়ে দেখি হারিয়ে যাওয়াই বটে—মোষদুটো গাড়িসুদ্ধু কাদায় নেমেছে—সেই কাদায় মোটামুটি ডুবে গিয়েছে তারা, কোনোরকমে তাদের পিঠ আর শিরদাঁড়া দেখা যাচ্ছে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে গাড়িটাকে কাদা থেকে তুলেও ফেলল। এ কি গরুর কর্ম। মোষদুটো কি পোষমানা বুনো মোষ?

ভোঁতায় দুদিন ছিলাম। মোটামুটি মুসলমানদের গ্রাম। রাস্তা পথ-ঘাট যাচ্ছেতাই নোংরা। একটা বড়ো পাকুড়গাছে হাজারখানেক শাদা বক বসে আছে। ওদের বিষ্ঠার আঁসটে গন্ধ সারা গাঁয়ের বাতাসজুড়ে পাক দেয়। বেশ বড়োসড়ো উঠনওয়ালা বাড়ি জহরভাইদের। দু-তিন ভাইয়ের আলাদা আলাদা ঘর উঠোনের পুবে আর পশ্চিমে। প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোঠাটার নিচে দুটি ঘর, উপরেও তাই। মাঝখানে সিঁড়ি। উপরের একটি ঘরে আমাদের জায়গা হলো। দিনের বেলাতেও ঘরটা অন্ধকার। মাটির ঘর ঠাণ্ডা হবেই। শরৎকালের বাতাসটা আবার একটু ঠাণ্ডা। এই ঘর থেকে তেমন আর কোথাও যাইনি। নিজের মনে লুকিয়ে থাকা যায়। জহরভাই কোথা থেকে একটা গ্রমোফোন আনলেন—সঙ্গে পাঁচ-সাতটা রেকর্ড। এই কটা মাত্র রেকর্ড দুদিনে বার বার শুনেছিলাম। 'কি পাইনি তার হিশাব মেলাতে মন মোর নহে রাজি'। পঙ্কজ মল্লিকের ভারী ভরাট গলার এই গান কতবার যে শুনেছিলাম তার শেষ নেই। আর ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দু-তিনটে গান—'শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়', 'প্রিয়ার প্রেমের লিপি লেখনী তরে, সুদূর দিগন্ত থেকে ফেলে দাও একখানি ঝরা শাদা পাখা, হে বলাকা।' নিঝুম আঁধার ঘরে লম্বা লম্বা দুপুরগুলি পার করে ফেলি। গানগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তো বটেই, আজ এতকাল পরেও একই রকম মনে আছে : 'সে শুধু নখরাঘাত হৃদয় কমলে, বেদনায় নীল হয়ে থাকা'।

এক বিকেলে সিঁড়ি বেয়ে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে মিহি গলায় বলল, নিচে জহরচাচা আপনাকে ডাকছে। জানু ঘরে ছিল, জিজ্ঞেস করল 'আমাকে?' সেই সরু গলায় জবাব এল, 'না'। তবে কাকে? কোনো জবাব নেই—তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম 'আমাকে?' জবাব নেই। আমি ফের জিজ্ঞেস করলাম 'আমাকে?' শোনা যায় কী যায় না এমন গলায় মেয়েটি কোনোমতে বলল, 'হুঁ'। আমি নিচে নেমে এলাম, দুলাভাই আর জহরভাই একটা নতুন বই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন। দুলাভাই বলছেন, আমাকে দে, আমি পড়ব। জহরভাই বলছেন, আগামী দু-তিন দিন এই বইয়ে হাত দিতে পারবি না। আমার পড়া হলে তখন নিস। অবিশ্যি আমার পাশে বসে থাকতে পারিস। আমি চেঁচিয়ে পড়ে তোকে শোনাই। দুলাভাই আর জেদাজেদি না করে শীতলপাটির ওপর বসে পড়লেন। পড়। দেখলাম জহরভাইয়ের হাতে একটা নতুন মোটা বই—নাম 'দেশে বিদেশে', লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী। মহা উৎসাহ নিয়ে জহরভাই পড়তে লাগলেন, চাঁদনি থেকে একটা শর্টস কিনে নিয়েছিলুম। কামড়ায় উঠে দেখি এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বসে রয়েছেন আমার মুখোমুখি। আমি গাঁক গাঁক করে জিজ্ঞেস করলুম, গোয়িং ফার? পড়তে গিয়ে আনন্দ আর উৎসাহে ফেটে পড়ছেন যেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম তখনো জানি না। গদ্যও এরকম হয়? এত প্রসন্ন-হাসিভরা গদ্যভাষা তো জীবনে শুনিনি। আমি ভেবে দেখলাম, আজকাল আমি লিখি, কবিতাই বেশি। সেই ক্লাস ফোর থেকেই তো লিখি আমি। আমার এই কবিতাগুলো জহরভাইকে শোনালে কেমন হয়? তখন আমার সব কবিতাই মৃত্যু, দুশ্চিন্তা, দুঃখ আর কষ্ট বিষয়ে লেখা। মৃত্যু, ওরে মৃত্যু আমার কই রে—দুরন্ত ঝড়ে ঘর যে আমার ভেঙে হলো ছারখার। মৃত্যুর দুঃখ, বিষাদ আর কষ্টে আমার তখন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। এর কিছুদিন পরেই 'পথের পাঁচালী' পড়ে ফেলেছিলাম। তখন ঠিক করলাম নাঃ, আর কবিতা নয়, গদ্যই লিখব। যাই-ই লিখতে যাই, 'পথের পাঁচালী'-র নকল হয়ে যায়। গাঁয়ের কুট বদমাশ কর্মহীন বুড়োরা শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' কিংবা 'পল্লীসমাজের' কূট চাল-চালা বুড়োদের মতো হয়ে যায়। তবে দুটো এক্সারসাইজ বড়ো খাতায় তোড়ে লিখে যাই আর শোনার লোক না থাকলে নিজের লেখা নিজেই পড়ি চিৎকার করে। নিচে রাস্তা দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছে তারা শুনতে পাচ্ছে ঠিক! এই সব খাতা আমার সঙ্গেই থাকত। দুদিন পরে বিকেল বেলায় জহরভাই 'দেশে বিদেশে' পড়ছেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমিও লিখি। সেই সব লেখা দু-একটি শুনবেন? বলে খাতা খুলে পড়তে যাচ্ছি, জহরভাই বললেন, আরে রাখো তোমার লেখা। মুজতবা আলী পড়ছি এখন। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে থাকলেন। বড়ো মনমরা হয়ে আমি উঠে গেলাম।

কবিতার কথা তো একটু আগেই বললাম। যখন মৃত্যুচিন্তা ধারেকাছেও নেই—জীবনই তো একটানা চলবে—আশেপাশে মৃত্যুর কোনো ছায়া নেই, বোধহয় তখুনি পেয়ে বসেছিল মৃত্যু নিয়ে বিলাস। লেখার মজায় মহা আনন্দে কাটানোর জন্যেই হয়তো এই মৃত্যু নিয়ে হাহাকার। একই সঙ্গে গদ্য লেখাও চলছে। সে হচ্ছে 'পথের পাঁচালী' আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মিশেল। দু-একটি বাক্য লিখি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিকল শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রাম্য কুচুটে বুড়ো চরিত্রের মতোই হচ্ছে বুঝে কী যে আনন্দ পাই!

আমার বন্ধু সমরেশ বিকেল দুপুর সন্ধের সময় গলা জড়াজড়ি করে বসেই বলত, গল্প বল। তাকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প বলে যাই। হেমেন্দ্র কুমার রায়, খগেন মিত্তির ইত্যাদির গোয়েন্দা আর শিকার কাহিনী, 'ঝিলে জঙ্গলে', নীহাররঞ্জন রায়ের 'কালো-ভ্রমর' পড়া চলছে, সমরেশ দিনরাত গল্প শুনতে চাইলে আমার আর অসুবিধে কি। গল্পে ঠাসা আমার মাথা। এর আগে শ্রীকুমারদা আর আমি মিলে একটা বই লিখব ঠিক করি। ঠিক দুপুরবেলায় ধুলো ময়লায় ভরা একটা তক্তপোশে দরজা বন্ধ করে লিখতে বসি। খানিকটা লেখার পরেই শ্রীকুমারদা বলতেন, এইবার তুই লেখ আমি বরং তোর পিঠে একটু তবলা প্রাকটিস করি—ব্যস, শুরু হয়ে গেল তেরে কেটে ধা, তেরে কেটে ধা। এদিকে আমি তখন দিগন্ত বিস্তৃত এক কলাবাগানের গল্প ফেঁদে বসেছি। আহা, কূলকিনারা মেলে না এই জঙ্গলের। আমি উপুড় হয়ে বসে লিখছি, তবলা প্রাকটিস শেষ করে শ্রীকুমারদা তখন আমার পিঠে বসে ঘোড়া চালাচ্ছে—আমি বলছি, শ্রীকুমারদা, এমন করে কি লেখা যায়? শ্রীকুমারদা বেশ হচ্ছে বেশ হচ্ছে, বেড়ে লিখছিস, এখন একটু অলংকার যোগ করে দিচ্ছি দাঁড়া। তোর নায়কের অবস্থা সঙ্গীন—কোন দিকে যাবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না। এইখানে একটা সংস্কৃত শ্লোক ঝেড়ে দিই : চিতাচিন্তার্দ্বয়ো মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী—চিতা দহিতং নির্জীবং, চিন্তা দহিতং সজীবং। মানে বুঝতে পারলি—চিন্তা নির্জীব কাঠ দহন করে আর চিন্তা জীবিত মানুষকে দহন করে।

যাই হোক, এরকম করে কি বই লেখা যায়! ভাবলাম সমরেশকে বানিয়ে বানিয়ে যে গল্প বলি, সেগুলি নিয়েই একটা বড়ো বই লিখে ফেলি। এতদিনে ঠিক জায়গাটা পেয়ে গেলাম। যত চেল্লাচিল্লি হৈচৈ করি সবার সঙ্গে, লিখতে বসতে হয় একা। আমি ঠিক তাই শুরু করলাম। বিকেলে যে গল্পটা সমরেশকে শুনিয়েছিলাম, রাতে সেটিই আবার লিখে ফেলি। কষ্টে-সৃষ্টে ক-আনা পয়সা জোগাড় করে ঘোঁতাদার দোকান থেকে দুটি চমৎকার এক্সারসাইজ খাতা কিনে ফেললাম। উপন্যাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম দেওয়া গেল 'কি হলো না?' বাস্তবিক সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীতে কোনো ঘটনাই বাদ পড়েনি। এই বইটা কিন্তু শেষ হয়েছিল, সম্ভবত আজও আমার বন্ধু সমরেশের কাছে রয়েছে। কবেই ঝরে গিয়েছে সে লেখাটা কিন্তু সেই মৃত লেখাটা আজও সমরেশের কাছে রয়েছে জেনে আমার ভালোই লাগে!

জহরভাইকে কোনো লেখাই শোনানো গেল না। আমি আধো অন্ধকার কোঠাঘরে বসে থাকি। খাঁ খাঁ করে চারিদিক। বাইরে দুপুরবেলা ঠায় দাঁড়িয়ে, গাছপালাগুলো একটা শ্বাসও ফেলে না। কী ভয়ংকর নিঃশ্বাস রোধ করে রাখা সময় এই দুপুর, কোনোদিন কি একবার নিঃশ্বাসও নেবে না? এ কি অদ্ভুত গ্রাম, শুধু নিঝুম তা নয়, মনে হয় একটা মরা গ্রাম। রাস্তায় পথে ঘাটে যে দু-চারজন মানুষ চলাচল করছে, তারা যেন সব মরা, মরা বাড়িঘর, বৈঠকখানা, গাছপালা; কোথাও জীবনের কোনো সাড়া নেই। এ বাড়ির মেয়েদেরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। যে মেয়েটির গলা আমি শুনেছিলাম, একটিমাত্র দুর্বল মিহি শব্দ 'হুঁ', ঐটুকুই ছিল জীবনের চিহ্ন। রাতে খাবার সময় আমরা সবাই নেমে এসেছিলাম, চওড়া বারান্দার একপাশে বসে আমরা চার-পাঁচজন খাচ্ছিলাম, পাশে একটা কাঁথা বিছানো বিছানা, সেখানে জহরভাইয়ের বড়োভাই আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিজের হাতে চাষবাস করলে যে রকম হাড়কাঠামো ক্রমেই জংধরা লোহার মতো হয়ে ওঠে, শুয়ে থাকা মানুষটিকেও আমার তেমনি পোড়া ইস্পাতের খাঁচা মনে হয়েছিল। হঠাৎ তিনি বাজখাঁই গলায় বললেন, ওরে, মার, মাথার তালুতে মার, মেরে ফ্যাল শালাকে, না হলে এখুনিই আমাকে মারবে। বলে আবার একদম চুপ হয়ে গেলেন। জহরভাই একবার একটু বলবার চেষ্টা করলেন, দক্ষিণের মাঠে বিঘে দুই জমি নিয়ে খাঁদের সঙ্গে ঝামেলা চলছে।

ভোঁতা গ্রামের সমস্ত স্মৃতিই আমার কাছে তেতো আর বিস্বাদ। এর মধ্যে মাত্র একটি সন্ধ্যায় অন্য পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিমন্ত্রণে যেতে হয়েছিল। হাতে হারিকেন নিয়ে পানি-কাদা বাঁচিয়ে কোনোমতে বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়ির ভিতরের উঠোনটা বিরাট, বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খামারবাড়িটাও বেশ বড়ো। কয়েকটা ভারি কাঠের চেয়ার আনা হয়েছিল, মাঝখানে একটা টেবিল, তার ওপর একটা হ্যাজাক লাইট। চারিদিকটা উজ্জ্বল আলোয় ভরা—গ্রামোফোনে শানাই বাজছিল। মনে যা ছিল, তা ঐটুকুই, আর কিছু নয়। পরের দিন ফিরে আসার সময় কয়েকটি ফটো তোলা হয়েছিল মনে পড়ে। কয়েকটি কিশোরী, দু-একজন ভাবী আর আমরা মিলে ছবি তোলা হলো। ক্যামেরা ছিল জহরভাইয়ের ভগ্নিপতির। ছবি-টবি তুলে তিনি বললেন, আর একটি ফিল্মই রইল। কিশোরীদের মধ্যে সেই মেয়েটিও ছিল যার নাম আজও জানি না। একটু বেঁটে আর মোটাসোটা, মুখটা সুশ্রী। আমার স্মৃতিতে কোনো একটা জলময় জায়গায় ছোট্ট একটা লাল শালুকের মতো সে ফুটে আছে।

ভোঁতা গ্রাম থেকে যাওয়া হয়েছিল জানুর শ্বশুরবাড়ি জগদল গাঁয়ে। মনে হতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অতিকায় নিরেট পাথর। গাঁয়ে ঢোকার পরেই সেই পাথর বুকের উপর চেপে বসে। সেখানে চার-পাঁচ দিন কোনোরকমে কাটিয়ে ফিরে আসা গেল গাঁয়ে। জহরভাই এখন আর সঙ্গে নেই—তবে তাঁর ভগ্নিপতি আর বোন আমাদের সঙ্গেই থাকলেন। দু-একদিন পরে যখন তাঁদের নিজের গ্রামে ফেরা হলো, কী কারণে জানি না, আমিও ওঁদের সঙ্গে বর্ধমান পর্যন্ত গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরেই তাঁদের ট্রেন। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়ে স্ত্রীকে একটা বেশ আরামের চেয়ারে বসিয়ে তিনি বললেন ক্যামেরার ফিল্মগুলোকে ফটোগ্রাফির দোকানে দিয়ে আসতে হবে প্রিন্ট করার জন্যে। চলো আজিজুল, তুমি আর আমি গিয়ে কাজটা করে আসি। স্ত্রীকে বললেন, তুমি চুপচাপ বসে থাকো। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা রিকশা নিয়ে আমরা গ্রান্ড ট্র্যাংক রোড ধরে কার্জন গেট পেরিয়ে তেঁতুলতলা বাজার পিছনে রেখে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। প্রায় রাজবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। সেখানে একটা ছোট ফটোগ্রাফির দোকানের সামনে রিকশা থামিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। ক্যামেরাটা আনলোড করতে গিয়েই ভদ্রলোক বললেন, আর একটা ফিল্ম বাকি আছে। আজিজুল, তুমি আমার দিকে মুখ করে এই চেয়ারটায় বসো। তোমার একটা ছবি তুলে দিই। আমি বসলাম তাঁর মুখোমুখি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানের মালিক খুটখাট করে নানা কাজ করছেন। আমি দোকানটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। জীর্ণ দশা, তিন দিকের দেয়ালে ছোট ছোট ফ্রেমে নানান ফটোগ্রাফ টাঙানো। আমার পিছন দিকে দেওয়ালে একটা বছর তিনেকের শিশুর ছবি বাঁধানো রয়েছে দেখছি। ফটো তোলা হলো একটা। ক্যামেরাটা 'আনলোড' করে ফিল্ম দেওয়া হলো মালিকের কাছে। আমরা চলে এলাম।

দিন পনেরো পরে আমার কাছে একটা খাম এলো। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে দেখি আমার ছবির দুটো প্রিন্ট। এই আমার জীবনের প্রথম ছবি। নিজেকে দেখছি বাইরে থেকে। এটা আয়নায় দেখা নয়। এটা একেবারে অন্য। বোবা একটি ছেলে, হাফপ্যান্ট আর ফুলশার্ট পরনে। জামার হাতাদুটো একটু গোটানো। তখনকার স্কুলছাত্রদের স্টাইল। আমার চুল ভালো করে আঁচড়ানো নেই। চোখদুটি একটু বিস্ফারিত। গাঁইয়া ছেলেরা যেমন করে তাকায় আর কী! এই অপর, অজানা, অচেনা এখনো আমার কাছে আছে। বারো-তেরো বছরের এই ছেলেটা একদিন ছিল। কাল তাকে ক্ষয় করতে পারেনি। তার বয়েস বাড়েনি, বাড়বেও না কোনোদিন। মাথার উপর সেই তিন বছরের শিশু একটুও বাড়েনি। কাল এখানে থমকে আছে। দোকানটার দশা কী হয়েছে জানি না— নিশ্চয়ই তার আর চিহ্নমাত্র নেই কিন্তু আমার কাছে রয়ে গেছে অনড় সেই বাস্তবটা।

কোথাও বেড়াতে গিয়ে এত একঘেয়ে আমার কখনো লাগেনি। সম্বল বলতে গোটা তিন-চার পঙ্কজ, হেমন্তের গান আর একটামাত্র ঘাসফুলের মৃদু কণ্ঠ। বাড়ি ফিরে এসেই শুনি বনমালী ব্যানার্জি স্কুল ছেড়ে গেছেন। এবার আর গাঁয়ের মানুষদের কূটচাল নয়, তিনি নিজেই রেজিগনেশন দিয়ে স্কুল ছেড়ে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ভাইপো আনন্দদা ছাড়াও তিনি আরো দু-চারজন যে ভালো ছাত্র এনেছিলেন তারাও স্কুল ছেড়েছে। গাঁয়ের ভদ্রলোকদের ডেকে স্কুলের হিশাব-নিকাশ পাই পয়সা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। এই প্রথম আমাদের স্কুলের একজন হেডমাস্টার সম্মানের সঙ্গে বিদায় নিলেন। গড়িয়ে-পড়া, সোনার চশমা, সোনার চেন পরা সেই যে বয়স্ক ছাত্রটি—আমাদের থাকহরিদাসহ যে চারজন ছাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল-বিকেল বেলার কোচিংয়ে বনমালীবাবুর কাছে বসে পড়ত, তাদের চারজনই এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে। একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট পাস। লাথি-খাওয়া, হুড়মুড়িয়ে পড়া থাকহরিদাও এজন্যে মহাখুশি। আর একটি কথা—বনমালীবাবু যাবার পর কিন্তু স্কুল হেডমাস্টারহীন হয়নি—দুই কি তিন দিনের মধ্যে ছোট একটা চামড়ার স্যুটকেস ঝুলিয়ে খাটো ধুতি মোটা পাঞ্জাবি পরনে হাজির হলেন নতুন হেডমাস্টারমশাই অজিত চক্রবর্তী। কালো ছোটোখাটো চেহারার ইস্পাতের মতো কঠিন মানুষটি—আবেগ নিয়ে কথা বলতে গেলেই যাঁর দু-তিন দিন না-কাটা দাড়ি কাঁটা দিয়ে উঠত, চমৎকার বাংলাভাষায় বক্তৃতা না দিয়ে তিনি থাকতে পারতেন না, তিনি এলেন কাণ্ডারী হয়ে। বাড়ি এসেই শুনলাম, তিনি ক্লাস নাইনের ছেলেদের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিয়েছেন। আমার খবরও নিয়েছেন। কে এই ছেলেটা, মুসলিম, ওর বাবা কি করেন, ক্লাসে উঠতে না উঠতেই পেখম মেলে উড়ে বেড়াতে শিখেছে—হবে না, হবে না, ওদের কিস্‌সু হবে না। গভমেন্ট ওদের জন্য যতই করুন, ওরা সেই চাষবাসেই থাকবে। ছোঁড়াটার একটু খবর নিন তো, এসেই যেন আমার সাথে দেখা করে। শুনে আমি আর একটুও দেরি না করে, স্নান-ট্যান সেরে প্যান্ট আর শার্ট পরে তৈরি। আজ মাথায় একটু বেশি তেল দিয়েছি, চুল বেয়ে তেল ঝুঁঝিয়ে পড়ছে। তারপর লম্বা টেরি কেটে স্কুলে গেলাম। অফিসে হেডমাস্টার নেই, মাস্টারমশাইরা কেউ নেই। শুনলাম স্কুলের উত্তর দিকের জায়গাটায় যেখানে প্রচুর গাছ আর ছায়া আছে—সেখানে সবাইকে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী যে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল—যার ফলে রবীন্দ্রনাথ স্যার উপাধি ত্যাগ করেছিলেন সেই ঘটনা আলোচনার জন্য। গুটি গুটি পায়ে আমিও সেদিকে এগিয়ে গেলাম। সতরঞ্চি-টতরঞ্চি পেতে ছাত্র-শিক্ষক সব এক জায়গায় বসেছেন। রোগা-পটকা কালো হেডমাস্টার মশাই—কিন্তু কী প্রকাণ্ড তাঁর গলার আওয়াজ—খুব তীব্র আর উঁচু তারে বাঁধা—তিনি কিছু বলতে শুরু করেছিলেন, আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কথা থামিয়ে তিনি আমার দিকে চাইলেন, তুমি আজিজুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছিলে কোথায় এ কদিন? মামার বাড়ির আবদার পেয়েছো! ক্লাস নাইন-টেনের কোনো ছেলেকে আমি এক দণ্ড ছাড়ব না। কী করে এত ছাত্র ম্যাট্রিক ফেল করে? খুব কড়া গলায় কথা বলছেন তিনি—কিন্তু আমি দেখলাম তাঁর দু চোখে মায়া। ওঁকে দেখেই আমার মন ভালো হয়ে গেল। মনে হলো এই মানুষটা আমাকে খুব ভালোবাসবেন। যাই হোক, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা নিয়ে তিনি কথা বলতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ যে কারো কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে নিজেই বড়লাটকে চিঠিটি লিখেছিলেন সেই ঐতিহাসিক চিঠিটিকে অজিতবাবু নিজের মনের রঙে রাঙিয়ে আমাদের মধ্যে আবেগের চোটে কাঁপতে থাকা, দাড়ি কাঁটা দিয়ে ওঠা গলায় নিজেই বক্তৃতা তৈরি করে বলতে শুরু করলেন, রবীন্দ্রনাথ বড়োলাটকে জানালেন, ওহে ইংরেজ, তুমি এ দেশে যা খুশি করবে আর আমরা চুপ করে সহ্য করব? কিছুতেই ভারতবাসী তা করবে না। তুমি এই দেশকে চিনতে পারোনি। এখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে, এখানে মুনি-ঋষিরা বলে গিয়েছেন শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থু। আমরা সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখেছি। এ তোমার বন্দুক-কামানের ব্যাপার নয়। ইংরেজ, তোমাকে সুড় সুড় করে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কোথায় রবীন্দ্রনাথের চিঠি আর কোথায় এই বক্তৃতা। কিন্তু হেডমাস্টারের বক্তৃতায় আমাদের বুক ফুলে উঠল। এইখানে আর কিছু নিয়ে কেউ কোনো কথা বলল না।

আমাদের স্কুলে হেডমাস্টারের কোনো কোয়ার্টার নেই। সেজন্যে আমরা একমাত্র শৈলজাবাবু ছাড়া আর কাউকে পরিবার-পরিজন নিয়ে গ্রামে বাস করতে দেখিনি। শিবতলায় মহারানীর ভিটেতে এখনো থাকেন বটে সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই। কাজেই অজিত চক্রবর্তী মশাইও তাঁর পরিবার নিয়ে এখানে বাস করতে পারেননি। রবিবারে রবিবারে বাড়িতে যেতেন। স্কুলের লাইব্রেরি ঘরটিকে ফাঁকা করে দেওয়া হলো, সেখানে বড়ো একটা খাট পেতে অজিতবাবু থাকতে শুরু করলেন। সে ঘরটা খুব মজার হয়ে গেল। আমরা যখন তখন তাঁর ঘরে যেতাম। তিনি গম্ভীর রাশভারি মানুষ ছিলেন না, সকলের সঙ্গেই কথা বলতেন। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কথা, তিনিই আমাদের স্কুলের প্রথম এম.এ. পাস হেডমাস্টার। তিনি বাংলা নিয়ে এম.এ. পাস করেছিলেন। সেজন্যে বেশ একটা অহংকার ছিল তাঁর। আমি বাংলায় ভালো বলে তিনি আমার সঙ্গে খুব কথা বলতেন। অনেক লেখকের নাম করতেন, যাঁদের নাম জীবনে শুনিনি। একালের বড়ো লেখকদের নাম জানতে হবে। সাহিত্য না পড়লে কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকবি। প্রেমাংকুর আতর্থী মহাস্থবিরের নাম শুনেছিস, তারাশঙ্কর বলে কোনো লেখকের নাম জানিস? জীবনে প্রথম এইসব নাম শুনলাম। ওঁর ঘরে গেলেই কেমন একটা খোলা হাওয়া। বাইরের দুনিয়ার নানা খবর জানতে পারতাম। রুশ বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, স্বদেশী আন্দোলন, কত কী নিয়ে যে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেসবই জীবনে প্রথম শোনা। আয়ারল্যান্ডের ডি. ভ্যালেরার কথা বলতে বলতে তাঁর গলার রগ ফুলে উঠত, তিন-চার দিনের না-কাটা দাড়ি কাঁটা দিয়ে উঠত।

একবার একটা বড়ো এক্সারসাইজ খাতার কথা বলেছিলেন। সেটা কেউ জোগাড় করে দিলে একটা উপন্যাস লিখবেন। তাঁকে কোনোদিনই লিখতে দেখিনি। মাঝে মাঝে উপুড় হয়ে শুয়ে বলতেন, পা দুটো একটু টিপে দে তো। একটা কটকটে ব্যথা হচ্ছে। আমার শরীরে তখন অনেক শক্তি, তবে শক্তি যতটা বা আছে, বিশ্বাস আছে আরো অনেক বেশি। তখন আমি কুস্তি শিখছিলাম, পাঞ্জা লড়তাম। পাঞ্জা লড়ায় আমার তখন খুব খাতির—একবার আমি একজনের সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে পাঞ্জা লড়েছিলাম। মাঝে মাঝে একটু থামি—সে-ও জোর দেয় না, আমিও না। একটু হাঁফ ছেড়ে নেওয়া আর কী। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হারটা আমাকেই স্বীকার করতে হলো। আস্তে আস্তে নুইয়ে এল আমার হাত। সেই সময় শেখা একটা কুস্তির প্যাঁচ যার তার ওপর খাটাতাম। আমার চেয়ে অনেক বেশি বলবান কাউকে বলতাম, পেছন থেকে আমাকে ভালুকের মতো জড়িয়ে ধরতে। সে যখন আমাকে পিষে ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে—সেই সময় হঠাৎ সামনের দিকে হেঁট হয়ে আমার পা দুটোর মধ্যে যেখানে তার পা দুটো রয়েছে তার সেই পা দুটো দুই হাতে ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিতাম, যত বলবান হোক, সে আচমকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে চিত হয়ে পড়ে যেত। এই প্যাঁচটা আমি কাউকেই শেখাতাম না। পেয়েছিলাম আমার ছোটমামুর কাছ থেকে।

অজিতবাবু আমাকে পা টিপে দিতে বললেই আমি একেবারে তৈরি। তাঁর কালো সরু সরু ঠ্যাং দুটো দেখলেই মনে হতো এখুনি মট করে ভেঙে দিতে পারি। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ সহজ হয়ে এলে খোলা খামারে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে তাঁর পা টিপে দিতে বলতেন। তাঁরও সরু সরু বাঁশের মতো পা দুটি। গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো পা টিপতাম, তারাভরা কালো আকাশের দিকে চেয়ে কী যে ভাবতাম জানি না। অন্ধকারটা তরল, মনে কি হতো যে বেঁচে থাকাটা বড়ো ভালো? আমি মানুষ, মানুষ ছাড়া অন্য কেউ আর কি ভাবতে পারে যে বেঁচে-থাকাটা খুব ভালো? আকাশের দিকে চেয়ে মনে হতো যে আকাশের মতোই অনন্ত জীবন আমার। কত কী ঘটবে এই জীবনে? শেষ আর হবে না।

অজিত মাস্টারমশাইয়ের একটা পা ধরে মোচড় দিতেই তিনি আরামের সঙ্গে বলতেন, আঃ, প্রতিভা যা স্পর্শ করে তাই সোনা হয়ে যায়। এই কথাটা শুনলেই খুব আনন্দ হতো আমার।

শরৎ হেমন্তের দিকে গড়াচ্ছে তখন, মাঠে গেলে পাকা আউশ ধানের গন্ধ পাওয়া যায়। কী একটা সাদা ফুল ঠিক সন্ধেবেলায় ফুটে অন্ধকার ভরে দিয়ে সুগন্ধ ছড়ায়। ঠিক এরকম সময়েই দুলাভাই এলেন বাড়িতে। আমি তখন তাঁকে নতুন হেডমাস্টারের কাহিনী শোনাই সাতকাহন করে। তিনি বললেন, একদিন আলাপ করতে হবে ভদ্রলোকের সঙ্গে। সন্ধের মুখে একদিন আমি আর দুলাভাই স্কুলের দিকে যাচ্ছি, গাবাকাটাদের ঘাটটা পার হচ্ছি, দেখি অজিত মাস্টারমশাই আসছেন বোর্ডিংয়ের দিকে। সঙ্গে আসছে তিন-চারটে ছেলে। দুজনে মুখোমুখি হতেই দুলাভাই কষ্ট করে একটু হেসে লম্বা একটা ইংরেজি বাক্য বলতে শুরু করলেন। সে ইংরেজিটা আমি বুঝিনি, মনে হলো কথাটা বোধ হয় এই যে, আপনার মতো একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করার জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছি। উত্তরে প্রায় একই রকম একটা বাক্য উচ্চারণ করলেন হেডমাস্টারমশাই। শুধু 'আই' বলার পরে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অলসো' ব্যবহার করে গড় গড় করে বিরাট একটা বাক্য আউড়িয়ে গেলেন। তারপর দুজনই বললেন, 'সি ইউ'। ওঁরা পেরিয়ে যেতেই দুলাভাই বললেন, ইংরেজিটা ভালোই বললেন, মুখস্থ করাই আছে, শুধু একটা গ্রামাটিক্যাল ভুল করে ফেলেছেন।

এর পরে গাঁয়ের লোকজন দুই ভাগ হয়ে গেল। কে বেশি জানে? হেডমাস্টার না জামাইবাবু। তিনি ইংরেজিতে এম.এ. পাস, হেডমাস্টারমশাই হাজার হলেও বাংলায় এম.এ.। দেখা যাচ্ছে দুলাভাইয়ের দিকেই দল ভারি। স্কুলের ছেলেরা তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমাদের বাড়িতে সকালে, বিকেলে, সন্ধেয়। এমনকি দু-একজন হিন্দু চাষিও এসে পড়ে সন্ধ্যার দিকে। বাবার সব নিষেধ উঠে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত, মীরকাশিম প্লে দুটোই বাজাই ওরা শুনতে চাইলে। কত কী মন্তব্যই যে তারা করে! ঐ তো মীরজাফর, ঐ তো দায়ী সব সর্বনাশের জন্যে! ইংরেজ এসে দেশের সবকিছু নিয়ে গেল গো। বাংলার মাটি শেষ। এদিকে তেলার ভাই হেলা খুব ঝুঁকে পড়েছে দুলাভাইয়ের দিকে। দেখা যাচ্ছে শোবার ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে দুলাভাই পড়ছেন ঢাউস একটা উপন্যাস। সেই উপন্যাসের নাম লা মিজারেবল, ইংরেজি অনুবাদে মূল গোটা একটা সংস্করণ। বালিশের পাশে বইটা খুলে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। বইয়ের দিকে চোখদুটো নামানো, দুলাভাইকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুমন্ত। বড়ো বড়ো চোখ নামানো তো, দেখা যাচ্ছে তাঁর জোড়াভুরু—বড়ো বড়ো চোখের পাপড়িগুলো বাঁকা আর লম্বা। ঠিক যেন ধ্যান করছেন। জানালা দিয়ে আমরা দেখছি। তাদের তো সম্ভ্রমের অবধি নেই। তবে বাইরে গেলেই নেশাটা একটু কেটে যায়— শ্রীকুমারদা গান বাঁধেন—মাজেম আলী খাঁ, হেলা ধোয় পা। মাজেম আলীর মাথা—হেলা ধরে ছাতা। উত্ত্যক্ত হেলা নানারকমে আপত্তি করে কিন্তু সবাই তাকে খেপিয়ে মারে। ছেলেটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। আচ্ছা, অত বড়ো উপন্যাস—শেষ করতে লাগবে কতদিন? দুলাভাই বলেছিলেন এই উপন্যাসে পৃথিবীর সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে বৃহত্তম একটি বাক্য আছে। একদিন তিনি আমাকে দেখিয়েও ছিলেন। বোধহয় আড়াই পৃষ্ঠা জুড়ে সেই বাক্যটা। একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজসভার বর্ণনা বা ঐরকম কিছু। অত বড়ো বাক্য বুঝতে তো পারিনি।

একদিন দুলাভাইয়ের সামনেই বাবা আমাকে বললেন, তোদের হেডমাস্টারকে বলিস একদিন সন্ধেয় আমাদের বাড়িতে চা খেতে। ওরে বাবা, একে তো চক্কোবর্তী বামুন, তারপরে আবার মুসলমানদের বাড়িতে চা খেতে আসা! সারা গাঁয়ে তো ঢি ঢি পড়ে যাবে। এসব বাছাবাছি তখন খুব চলত। ছোঁয়াছুঁয়ি একদম মানা। বাড়ি এসে খাবার তো কথাই ওঠে না। আমাদের বাড়িতে কোনো হিন্দু অতিথি এলে তার খাবারের ব্যবস্থা হতো কোনো হিন্দুর বাড়িতে—নন্দীদের বাড়ি বা ননু কাকার বাড়ি। তেমনি ওদের কোনো মুসলমান হাকিম বা পুলিশ-টুলিশ এলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো আমাদের বাড়িতে। দুলাভাই কিন্তু সহজ গলাতেই বললেন, তা বলে দ্যাখো না, চাই-ই খাবে, অন্নগ্রহণ করতে তো হচ্ছে না। হেডমাস্টারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার ভয় হতো না। একদিন মরিয়া হয়েই বলে ফেললাম চা খেতে আমাদের বাড়িতে আসতে। কথাটা শুনেই একটু থমকে গেলেন হেডমাস্টারমশাই। একে তো গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার, তার উপর চক্কোবর্তী বামুন, এই গাঁ-টিও তাঁর নিজের গাঁ নয়—কে যে কীভাবে নেবে কথাটা তিনি আন্দাজ করতে পারছেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যাব আমি তোমাদের বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলায়।

দু-তিন দিন পরে একদিন সন্ধেবেলায় তাঁকে নিয়ে এলাম আমাদের বাড়িতে। কাচা ধুতি আর ফুলশার্ট পরেছেন তিনি। মুখ-আঁধারি রাত হতে তিনি আমার সঙ্গে বাড়িতে এলেন। বাবা নিগণ থেকে সেদিন আনিয়েছিলেন খুব ভালো সন্দেশ আর বড়ো বড়ো রাজভোগ। মাকে বলা হলো কয়েকটা লুচি বানাতে। বাড়িতে বরাবরই ভালো দার্জিলিং চা খাওয়া হয়। সেদিন লিপটন চায়ের একটা নতুন প্যাকেট খোলা হলো। বেশ সন্তর্পণেই বাড়িতে ঢুকলেন মাস্টারমশাই। বাড়িতে আমাদের বিরাট উঠোন—কোথাও একটি শুকনো খড় বা পাতা পড়ে নেই। পেয়ারা আর লেবুর গাছ আছে বাড়ির দুই কোণে। দক্ষিণমুখো চওড়া বড়ো বারান্দাটা বাঁধানো। সূর্যের আলো তো আসতই, সে তেমন খেয়াল করতাম না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে চাঁদের আলোয় পুরো বারান্দাটা চকচক করত—অন্তত আকাশে চাঁদ থাকত যতক্ষণ ততক্ষণই ঐ ভরা জ্যোৎস্না। আমি ঘুমোতে যেতে পারতাম না।

বসার ব্যবস্থাটা বারান্দায় করলেই বোধহয় ভালো হতো। তা করা হয়নি, যে কেউ যখন তখন এসে পড়তে পারে এই ভয়ে। ব্যবস্থা করা হয়েছিল ঘরের মধ্যে একটা টেবিল পেতে, ধবধবে শাদা টেবিল ক্লথে ঢেকে। দু-তিনটে চেয়ার ছিল, পেতে দেওয়া হলো। জানু বাড়িতেই ছিল, পরিবেশনের ভার তার ওপরেই। দামি পুরনো চীনা মাটির থালা বাসন সবই ছিল বাড়িতে। একটা বাটি ছিল, সরু সরু চিড় পড়ে গিয়েছিল সারা বাটিটাতে। ওটার বয়স নাকি একশ বছর হবে। এরকম খাওয়ার আয়োজন হলে কাঁসার পাত্র একদমই ব্যবহার হতো না। গ্লাসগুলো ঝকঝকে বিদেশী কাচের। মোট কথা, আমাদের বাড়ির মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এক ননু কাকা আর হেরম্ব বাবুর বাড়ি ছাড়া গাঁয়ের কারো ছিল না। অজিতবাবু একটা চেয়ারে বসলেন, মুখোমুখি বসলেন দুলাভাই। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, কোনো অস্বস্তি বোধ করছেন না তো? একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। অজিতবাবু বললেন, যেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আছে সেখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন। আপনারা আমাকে যা খেতে দেবেন তা আমি অমৃতজ্ঞানে খাব।

ঘরে আলো একটু কম দেওয়া হয়েছে, হারিকেন জ্বালানো হয়নি। বাবার একটা পিতলের ভারি সুন্দর টেবিল ল্যাম্প ছিল। তার আলোটা মোমের মতো নরম। জানু চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকল। আমাদের একটি গোল বড়ো ঘন নীল রঙের ট্রে ছিল। আসলে ট্রে নয়, বিশাল একটা নীল রঙের থালার মতো। আমরা খাঞ্চা বলতাম। তার উপরে গোটাকতক খালি হাফ প্লেট গুছিয়ে রাখা, পাশে বড়ো একটা প্লেটে চার পাঁচখানা ফুলকো লুচি, গরম গরম দেবার জন্যে বেশি আনা হয়নি। মা আরো ভাজছে। পরে দরকারমতো আনা হবে। সঙ্গে পাতলা করে আলু ভাজা—সেটাও মনে হয় ঘিয়ে ছাঁকা। আর একপাশে নিগণ থেকে আনানো সন্দেশ। পাঁচ সাতটা বড়ো রাজভোগ। চা পরে আনা হবে। মাস্টারমশাই বসে গেলেন। তিনি অন্তত দুলাভাইকে না নিয়ে বসবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন মাস্টারমশাই। মনে হয় রাতের খাবার তাঁর হয়ে গেল। চা এল আলাদা করে। চা-টা কাপে কাপে নিজে ঢাললেন বাবা। দার্জিলিং চায়ের সুগন্ধে ঘরটা ভরে গেল। তিনি চিনি একটু নিলেন, কিন্তু দুধ দিতে বারণ করলেন।

ঘণ্টাদুয়েক ছিলেন মাস্টারমশাই। আমাদের বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা গাঁয়ের লোকে জানলেও এমন একজন চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ এই বাড়িতে মিষ্টিমুখ করেছেন শুধু নয়, রাতের খাওয়াটাও সেরে নিয়েছেন, সেই উনিশশো পঞ্চাশের দশকে এটা কম সাহসের ব্যাপার ছিল না। ছুঁৎমার্গ কম ছিল না তখন। হাড়ে-মজ্জায় শক্ত গেরো। অন্ধকার একটা জায়গায় কোনো আলো ঢোকার উপায় ছিল না। কোনো হিন্দু নারীকেই ছোঁয়া যেত না, তাঁরা বাড়িতে যেসব শাড়ি কাপড় শুকুতে দিতেন সেগুলোও ছুঁয়ে ফেলা যেত না। হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপার নয়—সারা গাঁয়েই এরকম। অশিক্ষিত, গণ্ডমূর্খ, নোংরা বামুনদেরও ছুঁতে পারত না হাড়ি ডোম মুচি। এমনকি শূদ্রবাড়ির বৈঠকখানায় নানা জাতের মানুষের জন্যে সারে সারে হুঁকো রাখা হতো। হুঁকোর অভাব হলে কল্কে খুলে হাতে দেওয়া হতো নিচু শ্রেণীর মানুষকে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কেউ কিছুই মনে করত না। যেন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বাবা এত মান্যগণ্য মানুষ কিন্তু তিনিও এর বাইরে নন।

জানু একটা কালোপাড় শাদা তাঁতের শাড়ি পরে এসেছিল। হেডমাস্টারমশাই তাকে দেখেই বলেছিলেন, তোমাকে তো দিদি বলা যাবে না, মিসেস মাজেমও না। তোমাকে নাম ধরেই ডাকব। তুমিও তো একসময় আমার স্কুলের ছাত্রী ছিলে! হ্যাঁ, তা ছিলাম, তবে গাঁয়ের আর কোনো মেয়ে ছিল না। তোমাদের গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে কারো সঙ্গে তোমাদের কোনো তুলনা চলে না। আমরা বাংলার ইতিহাস জানি না। বেদ উপনিষদ আর্য অনার্য এইসব অনর্থক তর্ক! তোমরা মুসলমানরা যে আটশ বছর ভারত শাসন করেছিলে সে কি এমনি এমনি? আজ এই গাঁয়ের মুসলমানদের দিকে তাকানো যায় না। ইংরেজ আসার সঙ্গে সঙ্গে সহজেই বশ-মানা হিন্দুরা ইংরেজি-টিংরেজি কিছু শিখে নিয়েছিল—এখন করে খাচ্ছে। নিচু চোখে মুসলমানকে দেখার দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা তো জানি তোমাদের সভ্যতা কত বড়ো, ঐতিহ্য কত বড়ো—ইতিহাসে কোথায় তোমাদের জায়গা! মুসলমানরা এখন সেসব ভুলে গিয়ে অশিক্ষা আর মূর্খতার গর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে।

অজিতবাবুর যে একটু বক্তৃতা দেবার ঝোঁক, তা আমি জানি। আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁর গলার রগ ফুলে আসছে, দু-গালের দাড়ি কাঁটা দিয়ে উঠছে।

বাবা বললেন, আবার একবার আসবেন।

যখুনি ডাকবেন তখুনি আসব। মি. মাজেম এখন আমি উঠব।

পরের দিন দারুণ উৎসাহ নিয়ে বারান্দার মিহি মোলায়েম রোদে বসে বোর্ডের বইগুলি দেখছি। আমি এখন একা এই বইগুলোর মালিক। শহীদুল ক্লাস এইটে ফেল করে স্কুলে আসছে না। এক ধরনের চাম-কাগজ জোগাড় করে বইগুলোর মলাট দিয়েছি। কিন্তু এখন যে বইগুলো মলাট খুলে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। মলাট খোলা বইগুলোর ওপর হাত বোলাচ্ছি ঠিক যেন কাশ্মিরী চাঁদর আলতো করে স্পর্শ করছি। এখানে ইংরেজি টেক্সট রয়েছে, বাংলা টেক্সট রয়েছে। সংস্কৃতের একটা টেক্সটও রয়েছে, র‍্যাপিড রিডার 'পালামৌ' রয়েছে—নোট এখনো বেশি কেনা হয়নি, আমি ঠিক করেছি এস. ব্যানার্জির নোটই নেব, এম. সেন নয়।

এই সময় দুলাভাই এসে বসলেন শীতল পাটির ওপর, দেখি, এবারের বইগুলি। আমি তখন ইংরেজি বইটা খুলেছি। প্রথমেই প্যারাবল অব দি গুড সামারিটান, তারপরেই প্যারাবল অব দি গুড শোয়ার। প্যারাবল শব্দটা নিয়ে গোলমাল বাধল। এ শব্দটা তো আগে শুনিনি। তারপর পড়ে দেখছি, মোটামুটি বোঝা যায়। ইংরেজি ভাষার মূল চাবিকাঠিটি আমি পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমার শব্দের ভাণ্ডার একদম খালি। ইংরেজি ভাষা তো পড়িইনি এতদিন—শব্দের ঘাটতির জন্যে ইংরেজি এক একটা বাক্য বুঝি আবার বুঝি না। বাক্যের গঠনটা বুঝতে পারি, খোঁজো খোঁজো, সমাপিকা ক্রিয়াটা খোঁজো, বাক্যের অংশে হুম হুইচ হু যাই থাকুক না কেন, তার মধ্যে সমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে যায় না, খুঁজতে হবে মূল সমাপিকা ক্রিয়াটা। অ্যাকটিভ প্যাসিভ একরকম বোঝা যাবে। প্রিপজিশনের পাশে প্রিপজিশন দিয়ে তার মানে টানে বদলালেও, সাঁটে একরকম বুঝে নেওয়া চলে।

আমি জিজ্ঞেস করার আগেই দুলাভাই জিজ্ঞেস করলেন 'প্যারাবল' মানে কী? স্বীকার করতে হলো জানি না। 'প্যারাবল' মানে হচ্ছে ছোট্ট একটা উপদেশের গল্প। বাইবেলের গল্প, এত সহজ ইংরেজিতে আর কিছুই লেখা নেই। ভবিষ্যতে এই রকম ভাষাই লেখার চেষ্টা করবে। ভাষাকে কঠিন করলেই সব মাটি। গল্পটা এখন মনোযোগ দিয়ে পড়ো তো দেখি। দু-একটা শব্দের মানে না বুঝতে পারলেও ক্ষতি নেই। পড়লাম, গল্প হচ্ছে মোটামুটি এই : পথের পাশে এক মরণাপন্ন রোগী কাতরাচ্ছিল যন্ত্রণায়। একজন গেল তার পাশ দিয়ে, সে চেয়েও দেখল না তার দিকে। তারপর আরো একজন এলো, একবার রোগীটির দিকে তাকালও কিন্তু সে থামল না, চলে গেল। তারপর এল একজন সমরিয়াবাসী—সামারিটান। সে রোগীটির কাছে এসে দাঁড়াল, তার সঙ্গে দু-একটা কথাও বলল, তারপর সে নিজে কাঁধে করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়ি গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে শেষ পর্যন্ত সারিয়ে তুলল। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে তার নিজের বাড়ি যাবার আগে বিদায় জানাল। এই হলো গুড সামারিটান। এর মূল উপদেশটি হলো : মানুষের বিপদ উপস্থিত হলে তার পাশে দাঁড়াও, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। অন্য প্যারাবলটাও খুব ভালো। এক কৃষক পাথরের উপর বীজ ছড়াল, একটা চারাও বেরুল না সেখান থেকে। তারপর সেই কৃষক কাঁটাবনে বীজ ছড়াল, সেখানে গাছ বেরুল বটে—কিন্তু কাঁটাজঙ্গলে তারা বাড়তে পারল না, শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে ভালো ফসল পাওয়া গেল না। তৃতীয়বারে কৃষকটা বীজ ছড়িয়ে দিল একটা চাষ করে তৈরি করা জমিতে। এবার ঠিকমতো চারা গজাল—শেষ পর্যন্ত কৃষক সেখান থেকে ভালো ফসল পেল। মোটামুটি এই রকম গল্পটা। লেখার তলায় লেখা আছে, অ্যাজ ইউ সো, সো ইউ রিপ। 'রিপ' কথাটার মানেটা দেখে নিলাম। উপদেশটাও ভালো করে বুঝতে পারলাম। দুলাভাই একটু সাহায্য করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয়, ভাষা বোঝার একটা ক্ষমতা ছিল আমার। বাংলায় আমি সেই পাঠশালা থেকে ফার্স্ট হই। দুর্গাশঙ্করবাবু এইজন্যে আমাকে খুব ভালোবাসতেন। একবার সরস্বতী পুজোয় কী কী লাগবে তার তালিকা প্রত্যেকবারের মতো এবারও দুর্গাশঙ্করবাবু লিখেছেন। খুঁটিনাটি প্রায় সব লিখেছেন, শুধু বাসক ফুলের ভালো নাম 'দ্রোণ' লিখতে ভুলে গিয়েছেন। আমি পাশেই ছিলাম। মনে করিয়ে দিলাম, মাস্টারমশাই 'দ্রোণ' পুষ্প যে বাদ পড়ল। তাই তো রে—তিনি তালিকার সব শেষে লিখলেন 'দ্রোণ', আর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই আগের জন্মে ঠিক 'বামুন' ছিলি, শাপভ্রষ্ট হয়ে এবার মুসলমান হয়ে জন্মেছিস। আমি অবাক হয়ে বললাম, তা কি খুব খারাপ হয়েছে মাস্টারমশাই? তিনি এই কথায় সামান্য একটু লজ্জা পেলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

আপনাআপনি বাংলা ভালো শিখতে পেরেছিলাম বলেই ইংরেজিটা এত তাড়াতাড়ি সড়োগড়ো হয়ে গেল। আমাদের সিলেকশনে প্যারাবল দুটোর পরেই চার্লস কিংলেকের মরুভূমিতে রাত সংক্রান্ত একটা লেখা ছিল। তাঁর ইংরেজিটা অনেক কঠিন, প্রচুর শব্দের মানে জানি না, দু-একটা বাক্য এমন জটিল যে সেগুলিকে কিছুতেই সিধে করতে পারি না। তবে রাতের মরুভূমির এমন একটা বর্ণনা ছিল যে মনে হয়েছিল জীবনে অন্তত একটা রাত মরুভূমিতে কাটাতে হবে। অন্য একটা গদ্য ছিল—সেই অ্যারিএডনি মিনোটারের গল্পটা। পারসিউসের হাতে একটা সুতোর বান্ডিল দিয়েছিল অ্যারিএডনি। গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে মিনোটারের সঙ্গে লড়াই করে তাকে হত্যা করার পর সুতোর খেই ধরে পারসিউস ফিরে এসে অ্যারিএডনিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে পালিয়ে এল।

রবার্ট লিন্ড-এর গদ্যের নাম 'অন ফরগেটিং'। কী কী বিষয় মানুষ প্রায়ই ভুলে যায় তাই নিয়ে ভারি সুন্দর একটা লেখা। একটা হলো চিঠি লেটার বাক্সে ফেলতে ভুলে যাওয়া। চিঠিটা পোস্ট করার জন্যেই কোটের পকেটে চিঠিটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো—তারপর প্রথম লেটার বাকসোটা পেরিয়ে যাওয়ার পরেই চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক আছে, এর পরের লেটার বাক্সে নিশ্চয়ই ফেলব। আবার একই ঘটনা ঘটল। লেটার বাকসো দেখার পরেই ভুলে যাওয়া আর মাঝপথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেই মনে পড়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত চিঠিটা পকেটে নিয়েই বাড়ি ফিরে আসা। কিংবা ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া। লিন্ড আশ্চর্য মানছেন যে, ওষুধ খেতে ভুল হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। বেশির ভাগ ওষুধ খেতে হয় খাওয়ার আগে কিংবা পরে—এটুকু মনে না পড়ার তো কোনো কারণই নেই। অথচ এই ভুলটা সবার বেলাই ঘটে। এই প্রবন্ধের শেষে আছে একটা চমৎকার কল্পকাহিনী। এই কল্পকাহিনীর ফাঁদে পড়ে অনেকে—বিশেষ করে যারা বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরে। সারা দিন কোনো একটা গাছের আড়ালে ছিপ ফেলে একাগ্র হয়ে বসে আছে একটা মানুষ। প্রতি মুহূর্তে ভাবছে, এইবার ফাতনাটা নড়ে উঠবে। বঁড়শির কাঁপন থেকেই বোঝা যাবে কী মাছ এসেছে টোপ গিলতে, সেটা পাঁচ সের, না দশ সের। কল্পনায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে ছিপওয়ালা মানুষটা। ফাতনাটা আধা ডুবতেই ব্যস, দারুণ একটা টান—এই প্রথম টানটা সামাল দেওয়া কঠিন। কর কর শব্দে সুতো বেরিয়ে যাচ্ছে—যাক যতদূর যেতে পারে, আটকানোর দরকার নেই। হয়তো মাঝপুকুরে চলে গেল, এটাই তার মরণ টান। উল্টোদিকে হুইল ঘুরছেই। মাঝামাঝি গিয়ে সে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন শুরু হয়ে গেল ইঁদুর-বেড়ালের খেলা। মাছ দৌড়ায়, ক্লান্ত হয়, একবার থামে, তারপর আবার টান— বঁড়শিটা যেন মুখ থেকে ফস্কে না যায়। শেষ পর্যন্ত, ঘণ্টাখানেক ধরে এই খেলার শেষে হয়তো দেখা গেল সে এসেছে, মরার মতো ক্লান্ত, তখন একটা গোল-জাল দিয়ে তাকে পুকুর থেকে তুলে নেওয়া—উঃ, তারপর সে কী তার পুচ্ছতাড়না!

যে লোকটির ছিপের ফাতনায় সারাদিন একটি কাঁপন ওঠেনি—নিশ্চল হয়ে আছে পৃথিবী, গাছের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না, দুপুরের রোদ ম্লান হয়ে এসেছে, তারপর শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা নেমে এল। আর বসে থেকে লাভ নেই—লোকটা শান্ত মনে, আগামীকাল আবার আসবে ভেবে ছিপ বঁড়শি, হুইল গুছিয়ে মাছের সুগন্ধী চারগুলিকে নিয়ে উঠেছে বাড়ি ফিরবে বলে। ট্রেনটা নির্বিকার দৌড়ুচ্ছে আর লোকটিকে দিবাস্বপ্নে পেয়ে বসেছে। সে ভাবছে পুকুরের সবচেয়ে বড়ো মাছটা বঁড়শি গিলেছে, লড়াই শেষ করে সে কাছে এসে পড়ছে—এইবার পাড়ে উঠল বলে। দিবাস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে নিজের স্টেশনে নামল, ট্রেনেই রয়ে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিপ, সুতো, হুইল, মাছ ধরার সব সাজ সরঞ্জাম। এরাই হলো জাত-ভুলিয়ে মানুষ। লিন্ড-এর এই প্রবন্ধ আমি ভুলতে পারি না। হিলেআরি বেলকের ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন থেকে মেরি আঁতোয়ানেৎ নামে একটা প্রবন্ধ ছিল। তার ভাষা কঠিন, বজ্র আঁটুনিতে বাঁধা—কিন্তু কী যে সুন্দর সেই ভাষা। সপ্তদশ লুই আর মেরি আঁতোয়ানেৎ দুজনেরই গিলোটিন হবে। প্রজাদের রুটি কেনারও সঙ্গতি নেই শুনে রানী নাকি বলেছিলেন রুটি মেলে না তো কেক খেলেই পারে ওরা। এই লেখার শেষ হচ্ছে রাজা-রানী দুজনকেই গিলোটিনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে—তারপর শেষ লাইন, 'নাউ দি ব্লেড ফলস'।

নাইন-টেনের নেহাৎ পাঠ্যবই থেকে এই সব আমি পেয়েছিলাম। বিখ্যাত শিকারি জিম করবেটের কাহিনীর একটা অংশ, 'দি ম্যান ইটার অব কুমায়ুন'। একই গুহার মধ্যে ঘুমন্ত চিতাবাঘের সামনে দাঁড়িয়ে রাইফেলটাকে এক যুগ ধরে ঘোরাচ্ছেন করবেট—রাইফেলটাকে বাঘের দিকে তাক করতে তাঁকে প্রায় পূর্ণ বৃত্ত ঘোরাতে হবে। কতক্ষণ লাগল এই কাজটা করতে—অনন্তকাল—পড়তে পড়তেই অনন্তের অনুভব ঘটে যায়। বাঘিনী মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে—প্রায় দেড়শ মানুষ মেরেছে। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত কুমায়ুনের এই মানুষখেকো করবেটের হাতেই মারা পড়ে। জিম করবেটের লেখা আমি আজও পড়ি—'মাই ইন্ডিয়া' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল 'জাঙ্গল লোর' বইটা। কবিতার মতোই স্নিগ্ধ সুন্দর।

সিলেকশনের কবিতাগুলি কী ছিল একটু বলি। রবার্ট হেরিকের কবিতা ছিল 'টু এ ড্যাফোডিল', জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে একটা আশ্চর্য দার্শনিক পর্যবেক্ষণ। তারপরেই ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'দি ড্যাফোডিল' আর 'সলিটারি রিপার'। পৃথিবী রুক্ষ ধূসর আর রসকষহীন হয়ে যাওয়ার ফলে এই কবিতাগুলো আজকের পৃথিবীতে কি ভালো লাগবে না? 'উই আর সেভেন'-এর মতো কবিতা? বা 'ওড টু অ্যান অটামন ' বা 'টু এ স্কাইলার্ক' বা 'হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়র ডেড'?

ঐদিন সকালবেলায় দুলাভাইয়ের সামনে বসেই কি আমি এসব দেখে নিয়েছিলাম? মোটেই না। কালোগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম, শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখছি আলো আসছে, ছোট্ট একটা রন্ধ্র দিয়ে। মোটকথা, পৃথিবীটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। বাস করার জগৎ আর বইয়ের জগৎ। সেই বোধহয় শুরু হয়ে গেল দুই জগতের মধ্যে লুকোচুরি খেলা। তাতে অনেক আঘাত আছে, রক্তক্ষরণ আছে, প্রবল ভয়ানক আনন্দও আছে। কেবলই আপস করতে হয়। দুই জগৎকেই এক জায়গায় আনতে হয়।

গাঁয়ের ছেলেরা আমার এত তাড়াতাড়ি ইংরেজিটা মোটামুটি শিখে ফেলায় ভীষণ অবাক হয়ে গেল। তখনকার দিনে ইংরেজিটা ছেলেদের কাছে বিভীষিকা। অঙ্ক অতটা নয়। আইজুল যে ইংরেজি আর অঙ্কে এত কাঁচা ছিল সে অত তাড়াতাড়ি শিখে ফেলল! এ কি ম্যাজিক নাকি? কোথা থেকে তার জামাইবাবু এলেন, মন্ত্রগুপ্তির মতো আইজুলের কানে কানে কিছু জানিয়ে দিলেন আর অমনি সে গড়গড় করে ইংরেজি বলতে লিখতে শিখে গেল? প্রত্যেকের ইচ্ছে হতো দুলাভাইয়ের কাছে গিয়ে একটু তাকতুক শিখে আসুক। কিন্তু সে হবে কী করে? তিনি তো আর ছেলেদের নিয়ে পড়াতে বসতে পারেন না। সেজন্যে তাঁকে মাথার মণি করে রেখে আমাকে ধরে বসল, তাহলে তুই আমাদের শেখা। আমরা মাসে দশটা করে টাকা তোকে দেব। পড়া না রে! ব্যস্ আমি হয়ে গেলাম আমার সমবয়েসী বন্ধুদের শিক্ষক। এমন কি ক্লাস টেনের একটা ছেলেও আমার কাছে ধর্না দিয়ে পড়ল। পড়া না বাবা! এমন করছিস কেন? দেখা গেল এককড়ি, গোপেশ্বর, মানিক মোদক, আশুড়িদের ছেলে সত্যনারায়ণ, হেলা আমার ছাত্র হয়ে গেল। ওদের কাছ থেকে কি টাকা নেওয়া যায়? এককড়ি গোপেশ্বরকে একরকম বোঝানো গেল— টাকা ফাকা দিতে যাস না কিন্তু। তবে দুই ক্লাসের নিচের ছাত্র সত্যনারায়ণ আর খোঁড়া মানিককে কিছুতেই বোঝানো গেল না। সমরেশ আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে আমার ছাত্র হবে না তো হবে কে? তার বাবা ধনঞ্জয় নন্দী ভীষণ গম্ভীর মানুষ। তিনি পর্যন্ত আমাকে বললেন একদিন, আমার হাবলটাকে একটু-আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। আশ্চর্য, গাঁয়ের লোকও আমাকে মাস্টার মনে করতে লাগল। সন্ধেরাতে ওদের নিয়ে বসতাম—নটার সময় ওদের ছেড়ে দিয়ে আমার নিজের পড়াশোনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁটারির সেই গোপাল নামের ছেলেটা একদিন আমার কাছে হাজির। সে এতদিন ক্লাস সেভেনে গগাচ্ছিল। আমার সঙ্গে লং জাম্পে যে মাঝে মাঝেই ফার্স্ট হতো, এ দু-বছর ক্লাস সেভেনে থাকতে থাকতে সে শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে। শুকনো মুখে সে একদিন আমার কাছে এসে বলল, আইজুলদা, তুমি আমাকে পড়াও। ফি-বছর ইংরেজিতে ফেল করছি। বাবা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবে বলেছে। দোহাই, আইজুলদা তুমি আমাকে পড়াও। এই দ্যাখো, তোমার প্রথম মাইনে পর্যন্ত সঙ্গে এনেছি। এই বলে সে দশ টাকার একটা নোট আমার দিকে এগিয়ে ধরল। আগে টাকা নিজের পকেটে রাখ গোপাল। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আইজুলদা কী রে? আমি আবার কবে তোর আইজুলদা হলাম? আইজুল বলেই তো ডাকতিস!

কাঁটারি গাঁ-টা ছোট। এই গাঁয়ে শুধু প্রান্তবাসী কোটালরা থাকে। নিজেদের এরা নিজেরাই ছোট করে রেখেছে। কখনো কারো সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলে না। এই গোপালও দেখছি তাই। কখনো গলা চড়িয়ে কথা বলতে শুনিনি তাকে। এখন থেকে তুমি আমাকে পড়াবে, আমার মাস্টারমশাই হবে। তোমাকে কেমন করে নাম ধরে ডাকি? গরিব গোপালের টাকাটা নিতেই হলো। কত কষ্ট করে জোগাড় করেছে। না নিলে তার খুব ছোট লাগবে নিজের কাছে। তাই নিলাম টাকাটা। কিন্তু আর কোনোদিন আমাকে টাকা দেবার চেষ্টা করবি না কিন্তু গোপাল।

ব্যস, ছাত্র পড়ানোর জন্য পুরোদস্তুর আমার একটা ব্যাচ তৈরি হয়ে গেল। দোতলায় আমার ঘরটা বেশ বড়ো। একপাশে আমার বিছানা, প্রস্রাবের গন্ধে ভরা। তার পাশে একটা বড়ো শীতলপাটি বিছিয়ে দিই। ঐখানেই সব পড়ে, হৈ-হুল্লোড় করে। এই হেলা, আমার পিঠটা একটু দলাই-মলাই করে দে তো! আমি উপুড় হয়ে শুই। হেলা খালি পায়ে আমার পিঠের উপর হেঁটে বেড়ায়। সে দলাই-মলাইয়ের বাবা। খানিকটা পরেই বলি, থাক হেলা, আর দরকার নেই। পা-দুখানা বটে তোমার!

আমি ওদের ট্রানস্লেশন করতে দিই। ছোট-বড়ো বাক্য কেমন করে তৈরি হয় বলে দেবার চেষ্টা করি। দেখি, ওরা টেনস-এর ব্যাপারটা বেশ তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে ফেলল। কোনো কোনো ভার্বের আবার দুটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে পাস্ট পার্টিসিপল হয়। দুটোই ঠিক। শুধু খেয়াল রাখবে, কোন টেনসের কোন রূপটা হচ্ছে—ফিউচার কনটিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট কনটিনিউয়াস? আমি নিজে কিন্তু পুরো বুঝতে পারি না। আগে ঠিক করবি এখন, আগে, না পরে। এইটা ঠিক হয়ে গেলে কোন ফর্মটা বেছে নিতে হবে সেটা ঠিক করবি। এই কাজটা করতে গিয়ে আমি মানেসহ অনেক ভার্ব মুখস্থ করাই। ক্লজ আর ফ্রেজ-এর তফাত বলে দিই—কতরকমের সেনটেনস হতে পারে—সিম্পল, কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড নিজে যতটা বুঝি ওদেরকে সেটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি। এতে শুধু ওরা শেখে, তা নয়—আমি নিজেও শিখি, অ্যাকটিভ প্যাসিভ সেনটেনস আয়ত্ত হয়ে যায়—কিন্তু ছাপানো বইয়ের গদ্য বা কবিতা বুঝতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। শেখা বিদ্যের সঙ্গে ঠিক ঠিক মেলে না। কাঁটা সব জায়গাতেই আছে। দলের মধ্যে এককড়ি আর গোপেশ্বর বেশ এগিয়ে, মানিক মোদক চালাক বেশি, বোঝেও ভালো। সত্যনারায়ণটা কিছুতেই এগোতে পারছে না। এই দলের মধ্যে সমরেশকে ডাকি না। তার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। সে হঠাৎ হঠাৎ আমার গলা ধরে বসবে, অড়হরের জঙ্গলের আড়ালে গলা ধরাধরি করে বসব—এক আনার বাদাম কিনে দুজনে খাব।

মাসখানেক পেরিয়ে গেলে সমরেশকে ডাকি। কাঁটারির গোপালের একমাস পড়া হলো। যেদিন এক মাস পূর্ণ হলো, সেদিনই সমরেশকে ডাকলাম। হেলাটা বয়সে একটু ছোট, গোপালের কাছ থেকে প্রথম দিনে পাওয়া সেই দশ টাকার নোটটা বার করে হেলার হাতে দিয়ে বলি, যা ঘোঁতাদার দোকানে। বিকেলে মণ্ডা সন্দেশ তৈরি হচ্ছিল দেখে এসেছি। ক টাকা করে যেন সের রে? দুই আড়াই টাকা হবে বোধহয়। যা, তিন কিলো নিয়ে আয়। আজ সবাই পেটভরে মিষ্টি খাব। হেলা টাকা নিয়ে দৌড়ুল। গোপাল তখনো আছে। সে হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। হুল্লোড় লেগে গেল বাড়িতে। বাবা এখন আমাকে কোনো কিছুতেই বারণ করেন না। আমরা হৈ-হুল্লোড় করছি, তিনি একবারও বিরক্ত হন না। আমার মনে হয়, বাবা এসব বিষয়ে আমাকে সমর্থনই করেন। আমি ওদের কাছে টাকা নিই কি নিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, কোনোদিন জিজ্ঞেসও করেননি। এই সময়টাতেই সিগারেট খেতে শিখে গেলাম কি? ঠিক মনে পড়ছে না।

সাপের মতো শুকনো গাছে গা ঘষাঘষি করে খোলসটা কি বদলে নিলাম? মনে হয় তাই, আমি অন্য একটা জগতে ঢুকছি। আছি এই জগৎটাতেই কিন্তু এর মধ্যেই তৈরি হচ্ছে অন্য একটা জগৎ। বোঝানো কঠিন। অন্য কোথাও যাচ্ছি। তার পথ সকাল সন্ধ্যা জুড়ে। কখনো সে দূরে যায়, কখনো সে কাছে আসে। কুণ্ডলী পাকিয়ে তখন আমি তার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি, নেশুড়ে চোখে জেগে যাই, বাইরে এসে ঠিকমতো পথ ঠাহর করতে পারি না। শরীরে কখনো কখনো তীব্র উত্তেজনা টের পাই, কখনো অস্থির অতিষ্ঠ হয়ে এক একটা খারাপ কাজ করে ফেলি, লাল আলোর পৃথিবী থেকে বের হয়ে আসার জন্যে। ভীষণ অবসাদ হয়। এখন একেবারে নিয়ম করে স্কুলের লাইব্রেরিতে যাই। মণীন্দ্রবাবু বারণ তো করেনই না, আলমারির তালা খুলে দিয়ে বলেন, দ্যাখ, কী কী বই নিবি। আমি প্রথমেই হাতে পেলাম এরিখ মারিয়া রেমার্কের বইটা—'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'—অবন ঠাকুরের নাতি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদ। খুব ভালো অনুবাদ। পরে আমি ওর ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। কোথায় কোন এক যবগ্রামে পড়ে আছি কুয়োর মধ্যে ব্যাঙের মতো। পৃথিবীটা বড়ো, সেটা আন্দাজ করতে পারতাম—কিন্তু কত বড়ো? এই বড়ো পৃথিবীটা আসলে নিস্তব্ধ ছিল এতদিন—সন্ধের আকাশের মতো বা তারাজ্বলা অন্ধকার আকাশের মতো। এখন ধারণা হচ্ছে, মহা কলরোলের মধ্যে এই জগৎটা সব সময়েই টগবগ করে ফুটছে। আমারই মতো কোটি কোটি মানুষ এই পৃথিবীতে, তারা খেলছে, আনন্দ করছে, চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করছে, প্রতিনিয়ত মরছে মারছে, রক্তের বন্যা বয়ে দিচ্ছে। জেগে ওঠার পর থেকে একবারও কি তার নিশ্চিন্ত ঘুম নেই! বই পড়তে পড়তেই এক একটা দেশ জেগে উঠেছে, এখানে-ওখানে-সেখানে, হাজার হাজার, কোটি কোটি, মানুষে পশুতে জন্তুতে কানায় কানায় ভরা সব দেশ—তার কাছে কত তুচ্ছ আমাদের যবগ্রাম। তবু বুঝতে পারি, আমারও একটা ঠাঁই আছে এখানে। আমি আজও ঠাঁই হারাইনি। সেখানে থেকেই আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারি, পৃথিবী লাটাইয়ের মতো ঘুরছে। আমার চারপাশেই ঘুরছে ভাবলে দোষ কি?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপরে লেখা এই বই 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। যুদ্ধের সাহিত্য হিসেবে মহৎ এই উপন্যাস। বোঝা যায়, লেখক নিজেই এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ একরকম শেষ, পশ্চিম রণাঙ্গন শান্ত—আঠারো বছরের কিশোরটি ট্রেঞ্চে নিরাপদেই ছিল। সে কি পত্রশূন্য একটি গাছে যে ছোট্ট পাখিটা ডাকছিল তাকে দেখতে গিয়ে একটু মাথা উঁচু করেছিল? টুকটাক এখানে-ওখানে গুলি হচ্ছিল, আচমকা তাদের একটি এসে লাগল কিশোরটির শরীরে। মৃত্যু হলো তার। নিজস্ব গোটা একটা পৃথিবী নিয়ে ছেলেটি মারা গেল। ফ্রন্টের ক্যাম্পের জীবনের যে ছবি এখানে এনেছেন রেমার্ক, তার তুলনা হয় না। যুদ্ধ শত্রুতা বন্ধুত্ব হিংসা নিষ্ঠুরতার এক আশ্চর্য ক্ষমাহীন জগৎ। যে দুজন বিছানা ভিজিয়ে ফেলে রাতে তাদের শাস্তি হচ্ছে একদিন একজন ওপরের বাংকে শোবে, পরের দিন অন্যজন ওপরে শোবে। দ্যাখো, কেমন লাগে। দুষ্টু ছেলেরা ফিস্টি করে খাবে একবাড়ির একটি হাঁস—সেটা চুরি করে আনা—কিংবা ভ্যানে চরে ফ্রন্টে যাচ্ছে কিংবা ফিরছে। মাথার ওপরে তার—তার এলেই যারা ভ্যানে দাঁড়িয়ে আছে, তারা সাবধান করে দেওয়ার জন্যে চেঁচাচ্ছে, সাবধান তার। সাবধান তার—সাবধান তার—সাবধান তার। তখনো যুদ্ধে সাধারণ রাইফেল ঘোড়া ইত্যাদির ব্যবহার হতো—ঘোড়াদের মৃতদেহের স্তূপ, পাশেই মানুষের লাশের স্তূপ। এই যুদ্ধের উপন্যাসটিকে জীবনে ভুলতে পারা গেল না। তৃষ্ণা জেগে উঠল, এই একখানা বই পড়তে গিয়েই মনে হলো, হাজারটা বই একবার পড়ে জেনে নিতে হবে এই উপন্যাসে যা যা আছে, তা বোঝার জন্যে। আয়ত্ত করে নিতে হবে গোটা বিশ্ব।

অবাক কাণ্ড দু নম্বর বইটা পেয়ে গেলাম ঐ রেমার্কেরই, 'থ্রি কমরেডস', অশোক গুহের অনুবাদ। অশোক গুহের অনুবাদ খুব ভালো হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এই উপন্যাস। দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে আর তাদের বাহন লক্কর-ঝক্কর মার্কা একটা জিপগাড়ি। সে গাড়ি দেখলেই হাসি পায়—এ গাড়ি চলে কী করে, দেখলেই মনে হয় চালু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেই তো এ গাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। তিন বন্ধুর একজন মোটর মেকানিক—সে গাড়িটার ইঞ্জিন-টিঞ্জিন সব বদলে এমন করে রেখেছিল কোনো গাড়িই তাকে পিছনে ফেলতে পারত না। প্রেমের গল্পই বটে, এমন আশ্চর্য গল্প আমি যেন কখনই পড়িনি। দুই বন্ধুই ভালোবাসত মেয়েটিকে—কিন্তু কখনো তাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ থাকত না। কারো ভাগে কিছু কম পড়ত না। পোড়খাওয়া মানুষ জীবন এমন করেই কাটায়। 'থ্রি কমরেডস'—'তিন সঙ্গী' এই বইটার নাম। শুনেছি রেমার্ক সংসার করেননি। ইউরোপের হোটেলে হোটেলে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর 'দি ব্লাক ওবেলিস্ক' নামের তৃতীয় বইটা আমি কখনো পাইনি।

স্কুল লাইব্রেরির বইগুলি প্রায় সবই বাংলায় অনুবাদ। ইংরেজি বই ছিল না। কিন্তু কে কিনেছিলেন এই বইগুলি। তার মধ্যে এত আলো ছিল? এখানেই পেয়ে গিয়েছিলাম দস্তোয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'দি ব্রাদার্স কারামাজভ'—আমার বয়েসে ঐসব পড়া উচিত ছিল কিনা জানি না। স্কুল থেকে নিয়ে গোর্কির 'মা' (অনুবাদ পুষ্পময়ী বসু) আমি অন্তত তিনবার পড়েছি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই সময়েই আমি পড়ে ফেলেছিলাম তলস্তোয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' উপন্যাসটা। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য পাঁচ খণ্ডে এর অনুবাদ করেছিলেন—এই বই অন্তত মূল থেকে অনেক দূরে ছিল সন্দেহ নেই, সে কথা এখন বুঝি, কিন্তু পাঁচ খণ্ডে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' আমি পড়ে শূন্য হাতে ফিরিনি। পিটার চরিত্রটি আমি আজও ভুলিনি। আমি বুঝতে পারি 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' ঐ বয়েসে পড়াটা আমার উচিত না। কিন্তু যে ছেলেটি দেনা করে শোধ দিতে না পারার অপরাধবোধ থেকে বুড়িটাকে কুড়ুল দিয়ে মেরে ফেলল, চলেই তো আসত সে—তখুনি অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল বুড়িটার ছোট বোন। এই অনাবশ্যক খুনটা করার তার প্রস্তুতি বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না—নিজে বাঁচার জন্য করতে সে বাধ্য হলো। জোড়া খুন করে ফেলল এক ছাত্র। বাকি উপন্যাসটা তো নিষ্করুণ অবিরাম দহন—আর কিছু নেই। পাপবোধ আত্মদহন তখনো বোঝবার বয়স আমার হয়নি। কিন্তু মনে তো রয়েছে যে, আমার পরিচয় ঘটেছে মানুষের জীবনের এত অসহ্য কষ্ট আর যন্ত্রণার সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের স্কুল লাইব্রেরিতে শিশু-কিশোরদের জন্যে কিছু বাংলা বই ছিল। সেসব আমি সিক্স-সেভেনেই পড়েছিলাম। 'ঝিলে জঙ্গলে', 'ভোম্বল সর্দার', 'কাজললতা', হেমেন্দ্রকুমার রায় আর দস্যু মোহন সিরিজের বই, নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'কালো ভ্রমর'। এর মধ্যে দু-চারটে অদ্ভুত বই—'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ছোট্ট পমির অভিযান', 'হিমালয়ের তুষার মানব', 'রিপ ভ্যান উইঙ্কেল', আশ্চর্য কথা, এত অনুবাদের বিদেশী বিখ্যাত বই থাকলেও, বাংলা বই কেন এত কম ছিল তা জানি না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিশ্চয়ই ছিল, ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি', দু-একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর উপন্যাস, কিশোর রবীন্দ্রজীবনী। আর ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় সব উপন্যাস। তারপর একদম স্টপ—বাংলা বই আর নেই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা জানতে পেরেছিলাম 'ডাইনি' বলে একটা গল্প পড়তে গিয়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম কোনোদিন শুনিনি। জীবনানন্দ দাশের নামও না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর প্রবোধ সান্যালের নামদুটো জানা গিয়েছিল পাঠ্যবই থেকে। আগে 'গল্পগুচ্ছ' প্রথম খণ্ড পাঠ্য ছিল, আমাদের সময়ে আর ছিল না। অথচ এই স্কুলের লাইব্রেরিতেই অনুবাদে পড়তে পড়েছিলাম ডিকেন্সের 'এ টেল অফ টু সিটিজ', 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'নিকল্‌স্ নিকলবি', 'অলিভার টুইস্ট' আর বোধহয় আলেকজান্ডার ডুমার, 'দি ব্লাক টিউলিপ'।

বেছে বেছে এই বইগুলির নাম লিখলাম, তার একটাই কারণ—দীর্ঘ জীবন পার করে এসেও ভুলতে পারলাম না বইগুলো। পাথরে খোদাই হয়ে থাকার মতো—যেন জীবনের চিরপ্রাপ্তি তখনই ঘটে গিয়েছে। তা না হলে বইয়ের তালিকা তৈরি করতে গেলে যেসব বইয়ের কথা এখন মনে পড়ছে, তার তালিকা এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার কথা নয়। প্রতিদিন একটা বা দুটো বই দেখা তো হতোই। এসব বইয়ের কথা এখন উল্লেখ না করাই ভালো। তবে এটুকু বলা যায় তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় সব উপন্যাসেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া হয়েছিল, গল্পও কিছু পড়েছিলাম—কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস নয়। আর রাজ্যের আজেবাজে বই, দু-একটা সামাজিক উপন্যাস, ডিটেকটিভ গল্প, অভিযান কাহিনী। বলতে ভুলে যাচ্ছি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দু-একটি উপন্যাস—'মানে না মানা', 'অভিনয় নয়'। সেসব সিনেমার গল্প। প্রথম সিনেমা দেখেছিলাম 'মানে না মানা'—কাঁচা কাহিনী তবু খুব ভালো লেগেছিল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটা বড়ো গল্প সংকলন বেরিয়েছিল—বোধহয় তাতে ভালো গল্প অনেক ছিল। ঐ সময়টা গ্রামে গ্রামে তাঁবু খাটিয়ে সিনেমা দেখানো হতো। চার আনা টিকিট—তখন কিন্তু বিখ্যাত ছবি অনেক দেখেছি। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, সন্ধ্যারানী, কানন দেবী, মলিনা—এঁরা সব প্রধান চরিত্রে। উত্তম-সুচিত্রা তখনো এই সব দূর গাঁয়ে পৌঁছুতে পারেননি। কেন যে ভালো লাগত তা ঠিক বুঝতে পারি না। ঐ কাঁচা বয়েসটা মানুষ কী করে পার করে? উপন্যাসগুলো গল্পে ঠাসা। গল্পই নেই তবে উপন্যাস কিসের? এই সময় মহা নামকরা ঔপন্যাসিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়— তাঁর 'চিতা বহ্নিমান' পড়তে শুরু করেছিলাম একদিন সকালে—বেশ মনে পড়ছে মুগ্ধমনে যখন উপন্যাসটার শেষটা পড়ছি, তখন বিকেলের সূর্যের আলো ঝিকিমিকি করছে। এইভাবেই শেষ করেছিলাম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'অভিনয় নয়' উপন্যাস। তবে এরকম সারাদিন ধরে পড়েছিলাম আর একটি উপন্যাস—সে এক আলাদা অভিজ্ঞতা, খুব ভালো কিছু পড়ার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বইটা ছিল 'দি ব্লাক টিউলিপ'—এক দুর্লভ ফুল, কালো টিউলিপ। এই ফুল অপার্থিব কোন সাধনায় ফুটবে? কে ফোটাবে তাকে? সন্ধেবেলায় ফুটেছিল সেই ফুল—তখন অন্ধকার নেমে এসেছে।

একটা কথা আজকাল খুব মনে হয়, গোগ্রাসে গাদা গাদা বই পড়া কতটা ভালো? বুক ফুলিয়ে এই কথাটা বলা কি উচিত—আমি প্রত্যেক দিন একটি করে বই শেষ করি? একটা লাইব্রেরি শেষ হতে না হতে আর একটা লাইব্রেরি ধরি। আমার এমন ধারণা হয়েছে, নিজের অভিজ্ঞতাই আমাকে শিখেয়েছে, মোটেই ওরকম করে বই পড়া ঠিক নয়, হাতির মতো দিনে আড়াই মণ ঘাস খাওয়ার চেয়ে সিংহের মতো কয়েক কিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাংস খাওয়াই ভালো। বই পড়ার একটা খারাপ দিক হলো, যে কোনো নেশার মতো এটাও নেশা। নেশায় যারা পড়ে তারা অকর্মার ধাড়ি হয়ে যায়। সর্বকর্মে অনিচ্ছা, সকাল দুপুর রাতে চরম অলস মানুষরাই এরকম বই পড়ে। তাতে মানও থাকে আবার বলার সুখের জন্যে বুক ফুলিয়ে বলাও যায় যে জীবনে আমি দশ পনেরো হাজার বই পড়েছি। তাতে হয়েছে কী? যে লোকটা পড়েছে তার কি চারটে হাত-পা গজিয়েছে, নাকি চুলের তলায় শিং গজিয়েছে?

জীবন যখন দুভাগ করে ফেলেছিলাম, চোদ্দ বছর বয়সে—জীবন কাটানোর জন্যে প্রতিদিনের বাইরের জগৎ আর বই পড়ার ভিতরের জগৎ। প্রতিদিনের জগৎ আর কতটুকু বদলাত? খুব সামান্য আর এত ধীরেসুস্থে যে ধরাই পড়ে না নিজের কাছে। কিন্তু 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' পড়ে আমি যেমন ছিলাম তার থেকে একটু ভিন্ন অবশ্যই হয়েছিলাম। যেন ছোটোখাটো একটা ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে, সব জিনিশ আগের জায়গায় নেই। কিন্তু খুঁজছি পাগলের মতো? খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না। এরকম বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু বদলে গিয়েছি, বিরক্ত বিব্রত বোধ করেছি। নিশ্চিন্ত মনে ধরতে পারি এমন একটা কিছু পাবার ইচ্ছা অস্থির উল্টোপাল্টা ভিতরের জগতের উপরে একটা ঠাণ্ডা প্রলেপের মতো। দু-দুটো মানুষখুনি রাশকলনিকভকে পাপ অপরাধের জন্য সারা জীবনের চরম শাস্তি পার করিয়ে তাকে পৃথিবীর মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে তুলে দিলে তার প্রেমিকার হাত ধরে, হাজারবার পোড়া নিখাদ ইস্পাতের মতো, সেই বয়েসে অতটা না বুঝলেও কিছু তো নিশ্চয়ই বুঝেছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণী কি শান্তি পেয়েছিল তার নির্মম মৃত্যুর পরেও! নাকি সে অতৃপ্ত আত্মা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে? জীবন যেমন দেখায় তেমন নয়, যেভাবে কাটে বলে মনে হয় সেরকমও নয়। কোনো ভালো বই পড়লে একটু অন্য মানুষ হয়ে ওঠে কি সে?

আমি ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে এখন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~